চিরন্তন সীমানা

যুক্তরাষ্ট্রের ফলিত অর্থনীতির
॥ সচিত্র ইতিহাস ॥

নিউ ইয়র্ক ইউনিভারসিটির ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক
অ্যাফেয়ার্সের কর্মীবৃন্দ কর্তৃক রচিত

পরিচালক
হেগ বাবিয়ান

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৭২

অনুবাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন ; কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় যতটুকু স্বীকৃতি দান করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের সীমানার উত্তরাধিকার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বুঝতে শেখে যে, আমেরিকানরা স্বাধীনতা-প্রেমিক, স্বতন্ত্র মনোভঙ্গীর মূল্যে বিশ্বাসী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্ম-তৎপরতায় আস্থাশীল এবং সাধারণ ভাবে মানুষের স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশেব জন্য একটা উন্মুক্ত ও সচল সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টিত। এই সব কিছুরই কারণ এই যে, আমাদের গড়ে ওঠার প্রারম্ভিক কালের প্রথম ৪০০ বছর একটা সীমান্ত পরিবেশের মধ্যেই কেটেছে। এই সবই সত্য; তবু এই কথায় মাত্র এক ধরনের সীমানার কথাই যেন অত্যন্ত বেশী করে ব্যক্ত হয় এবং অন্যান্য সব সীমানাব কথা যথেষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় না।

কারণ, ভৌগোলিক সীমানার সম্প্রসারণই যদি আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের একমাত্র প্রেরণা হয়, তা'হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে মুহূর্তে ভৌগোলিক সম্প্রসারণ রুদ্ধ হয়ে গেল সেই মুহূর্ত থেকে নিশ্চয় আমাদের অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু এই সীমান্ত মনোভঙ্গী, তার ভৌগোলিক পুষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সীমানায় প্রচুর খাদ্যবস্তু পেয়েছে। আমরা যে চিরন্তন সীমানার কথা উল্লেখ করছি, তা' আমাদের অপূর্ণ কর্তব্য নিয়ে গড়া,

বংশপরম্পরায় তার মোকাবিলা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র মহৎ হয়ে ওঠেনি, এবং সেই ভাবে থাকবেও না, শুধু তার মূল্যবান ঐতিহ্য তার প্রথম যুগের পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে বলেই। এই কালের ভূমিতে অতীতের ফসলের বীজ বপন করার সহনশীল দক্ষতা যুক্তরাষ্ট্রকে তার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার উপযোগী অপ্রতিহত সম্পদ দান করেছে।

আমাদের পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ভঙ্গী যেমন অভিব্যক্ত, তেমনই আমাদের লালিত আদর্শসমূহের প্রয়োগের মধ্যে তা' প্রকাশিত। এর পিছনে আছে ধারাবাহিকত্ব ও উত্তরাধিকার, আর সেই সঙ্গে প্রগতিকামী মনোভঙ্গী। নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই ধারাবাহিকত্বের মধ্যে বৈপ্লবিক কিছুই নেই, কিন্তু এমনও কিছু নেই যা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটায় বা পিছনে টেনে রাখে।

কুঠারের কোনো বৈপ্লবিক স্পর্শ, প্রথম অভিযাত্রী দল যে গভীর অরণ্যানীতে পদক্ষেপ করেছিলেন তাকে রাতারাতি অসংখ্য গৃহশ্রেণী, কর্ষিত ভূমি ও বিশাল শিল্পাঞ্চলে পরিণত করেনি। এই রূপান্তর ঘটেছে ধীরে ধীরে, এবং ভালোভাবেই ঘটেছে, কারণ সীমানা যেখানে আত্মপ্রকাশ করেছে বা যেখানেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটুক, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তাকে জয় করার জন্য চিরদিনই এগিয়ে এসেছে।

যিনিই আমেরিকান রাজনৈতিক বা আর্থনীতিক ইতিহাস পাঠ করুন, তাঁকেই লক্ষ্য করতে হবে যে, সংকট-মুহূর্তে যখনই কোনো নতুন সীমানা চোখে পড়েছে তার জন্য তখনই সাড়া মিলেছে। দুঃখের বিষয়, জাতির জীবনের পরিবর্তনের মুহূর্তগুলিতে দেশের সাধারণ মানুষ যা অনুভব করেছেন বা যা বলেছেন, আমরা তার বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু যে-সব মানুষ সেই

কালে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জানি। কারণ, তাঁরা যা বলেছেন এবং করেছেন, তার মধ্যে আমাদের সেই বিবর্তন-পদ্ধতি যা ঐতিহ্যকে পরিবর্তনের ধারাবাহী করে তুলেছে, তার খতিয়ান আছে।

টমাস পেইনের উদারনীতিবাদ; স্যামুয়েল এডামসের জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা; জর্জ ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যের মহত্ব; বেন ফ্রাঙ্কলিনের 'ইয়াঙ্কি' উদ্ভাবনী শক্তি; টমাস জেফারসনের অভিজাতসুলভ সাংসারিক ভাব; আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের গঠনমূলক বাস্তবতা; এনড্রু জ্যাকসনের ব্যাপক লোকমনোরঞ্জন নীতি, এব্রাহাম লিঙ্কনের স্বকীয় সুদৃঢ় প্রজ্ঞা; থিওডোর রুজভেল্টের বীর্যবান সংবেদনশীলতা; উড্রো উইলসনের প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী; ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সাহসিক নিরীক্ষা; ডিউইট আইজেনহাওয়ারের মানসিক ভারসাম্য এবং দায়িত্ববোধ—এই সব ব্যক্তি এবং আর্থনীতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এঁদের সমসাময়িক অন্যান্য অনেক ব্যক্তি তাঁদের কালের সীমানার রূপান্তর সাধনে যে যার কর্তব্য করে গেছেন। ষাট-এর দশকের সূচনায় প্রেসিডেন্ট কেনেডীর নতুন সীমানার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য এই উদাত্ত আহ্বান সেই সুশৃঙ্খল প্রগতিরই উত্তম ঐতিহ্যানুসারী।

সুতরাং, এই সীমানা একটি স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ। ভৌগোলিক কিংবা অন্য প্রকার যে-সব সীমানা আমাদের সমাজকে অতিক্রম করতে হয়েছে, তাদেরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক উন্নয়নের সচিত্র ইতিহাসের মাধ্যমে, বাধা কিভাবে সুযোগে রূপান্তরিত হয়েছে তার পরিচয় দেওয়াই আমাদের বাসনা।

'চিরন্তন সীমানা' প্রথম ইন্‌ষ্টিট্যুট অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের মাসিক আর্থনীতিক পত্রিকা "চ্যালেঞ্জ"-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে মূল গ্রন্থের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক পরিপূরক বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। ছবি, মানচিত্র এবং রেখাচিত্র বিশেষ ভাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংযোজিত করা হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপির প্রণয়নের কৃতিত্ব ইন্‌ষ্টিট্যুটের সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে বণ্টন করে নিতে হবে, আর যে-সব মারাত্মক ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে তার দায়িত্ব একান্ত ভাবেই আমার।

এইচ. বি.

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম ভাগ ● আবিষ্কারের কাল থেকে লোকায়ত গণতন্ত্র

দ্বিতীয় ভাগ ● পূর্ণতার পরীক্ষা

তৃতীয় ভাগ ● শক্তি ও দায়িত্ব

প্রথম ভাগ

আবিষ্কারের
কাল থেকে
লোকায়ত
গণতন্ত্র

আবিষ্কার থেকে লোকায়ত গণতন্ত্র



॥ আবিষ্কারের কাল ॥

নৃতত্ত্ববিদদের মতে প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ হাজার বছর আগে আমেরিকা মহাদেশে জনবসতির সূত্রপাত হয়। তাঁদের বিশ্বাস প্রথমতম বাসিন্দারা মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির বুক থেকে বেরিং প্রণালী পার হয়ে আলাসকায় আসে। পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে এই সব জাতি সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে এঁরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয় আর সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে বহু বিচিত্র ধরনের সংস্কৃতি। তুলা পিঁজে এঁরা কাপড় বুনতে শেখে, ভুট্টা চাষ করে, ডিঙ্গি নৌকা তৈরী করে আর শিকার-করা জন্তু-জানোয়ারের চামড়া সংরক্ষণ পদ্ধতিও আয়ত্ত করে।

এই জাতিদের মধ্যে অনেকেরই রাজনৈতিক সংগঠন-ব্যবস্থা ছিল রীতিমত জটিল। য়ুরোপীয়রা যেটুকু সভ্যতা তাদের সঙ্গে নিয়ে এই দেশে পদার্পণ করেছিলেন তার চেয়ে অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে উচ্চস্তরের ছিল 'মায়া', 'আজটেক' ও 'ইন্‌কা' জাতীয় স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের সভ্যতা।

আমাদের পাঠ্যপুস্তক অনুসারে নতুন যুগের সূচনা হল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাল—অর্থাৎ ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ; এই উক্তিও কিন্তু মোটামুটিভাবে নির্ভুল। কারণ, সেই আবিষ্কারের পর থেকে যা কিছু ঘটেছে তা আদিম বাসিন্দাদের সংস্কৃতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত নয়। অবশ্য এই কথা সত্য ইউরোপীয়রা ধূমপান করতে, (যার সুফল অবশ্য সংশয়মুক্ত নয়), যবাদি শস্য চাষ করতে এবং আলু খেতে শিখেছেন তাদেরই কাছ থেকে, অন্যদিক থেকে ইউরোপীয় 'হানাদার'গণ কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস এবং রাজনীতি দ্বারা আশ্চর্যরকম স্বল্প পরিমাণেই প্রভাবিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিজেতাদের সংস্কৃতির দ্বারা জেতাদের এত কম প্রভাবিত হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

সুতরাং সমকালীন আমেরিকান সমাজ গঠনের মূলে যে সব আদর্শ কার্যকরী হয়েছে তা বিচার করার প্রয়োজনে আমাদের য়ুরোপীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ফিরে আসতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান কালে, যে সব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থনীতিক রীতিনীতিকে আমরা বিশেষভাবে 'আমেরিকান' বলে মনে করি তার অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল হল ইউরোপ।

ইউরোপীয়দের মধ্যে নতুন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পদার্পণ করে নর্সম্যানরা (প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতি)। একাদশ শতাব্দীতে এরা পশ্চিমদিকে গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পরে ক্যানাডীয় উপকূল আবিষ্কার করে দক্ষিণ প্রান্তে সেণ্ট লরেন্স উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু এই সব রত্নসন্ধানী অভিযানের কোনও স্থায়ী গুরুত্ব নেই। নর্সম্যানরা স্বদেশে ফিরে যায় এবং তাঁদের সেই আবিষ্কারের কথা অতি দ্রুত ভুলে যায়।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল না কেন? কেন তখন অভিযাত্রা এবং আবিষ্কারে এমন প্রচণ্ড উৎসাহ সঞ্চারিত হল? স্পষ্টতঃ এই প্রশ্নাবলীর কোনও সহজ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বহু ঐতিহাসিকের কাছে যে কারণটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমরাও তারই পুনরুল্লেখ করতে

পারি। বলা যায়, ইউরোপে মানসিকতা ও ধর্মপ্রেরণার এক নবীন সীমান্তের দ্বারোদ্ঘাটনের ফলেই এই সব সম্ভব হয়েছিল।

এই যে নতুন সীমানার পথ উন্মুক্ত হল, একেই ঐতিহাসিকরা একটা রেনেসাঁস বা পুনরুজ্জীবন বলে অভিহিত করেছেন। আসলে, কিন্তু লুপ্ত পাণ্ডিত্যের পুনরুজ্জীবনের চেয়েও অনেক বেশী কিছু তখন ঘটেছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ইউরোপে যা ঘটেছে তা একাধারে ইউরোপীয় জীবনযাত্রাকে যেমন রূপান্তরিত করেছে তেমনই ইউরোপের ভাবাদর্শ এবং অভীপ্সারও বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। এই যুগে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি তার স্বয়ংসম্পূর্ণ পত্তনী-ব্যবস্থা আর সুকঠোর ক্রমোচ্চ সামাজিক কাঠামো, মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির কাছে পরাভব মানলো। এই আর্থনীতিক ব্যবস্থায় কুটিরশিল্পী এবং মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এক ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল।

এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে একটা মৌলিক নবীন দৃষ্টিভংগী ছিল। জীবন তাঁদের কাছে ছিল এক চরম দুঃসাহসের সম্পদ। সেখানে উদ্যোগ, উদ্যম ও প্রেরণার পুরস্কার হল জীবনের পরম সঞ্চয়। আর এই 'পরম সঞ্চয়' বলতে তাঁরা বুঝতেন অর্থের বিনিময়ে যা কিনতে পারা যায়। মৃত্যুর পরে চিরন্তন শান্তির লোভে মধ্যযুগীয় আত্মত্যাগ ও পার্থিব সুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মবঞ্চিত থাকা তাঁদের কাম্য ছিল না।

নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত মাটি-ঘেঁষা মানুষ। এই সংসারে স্বল্পকালিক স্থিতিকালে যতটুকু ভোগ করে নিতে পারা যায় তার জন্যই তাঁরা উন্মুখ ছিল।

রেনেসাঁসের পরেই কেন বাণিজ্য ও আবিষ্কারের যুগ সুরু হল এবং কেন তারপরই ঔপনিবেশিকতা ও পত্তনী গঠনের যুগ এল, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে প্রধানতঃ এই মানসিকতার মধ্যে।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার স্থলে যখন রাজন্যবর্গশাসিত এবং প্রভাবশালী নয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমর্থিত জাতি-রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় ঘটল, তখন রাষ্ট্রের আকার এবং প্রভাব দুই-ই বৃদ্ধি পেল। এই সব নতুন রাষ্ট্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে, নিজেদের স্বার্থকে জনস্বার্থের সামিল করে তোলার সুযোগ দিল।

প্রচলিত 'মার্কেণ্টাইল' (Mercantilist) তত্ত্ব মতে ব্যবসার প্রধানতম ভূমিকা হল রাষ্ট্রের শক্তি বর্ধন করা এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের পুষ্টিসাধন—বিশেষত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের। এইভাবে মার্কেণ্টাইল তত্ত্বে বিশ্বাসীগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যকে অনুকূল রাখার অর্থাৎ রপ্তানিকে আমদানীর চেয়ে বেশী করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, দেশে সোনার আমদানীর পরিমাণ চালানের চেয়ে বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পথ এইভাবে সঙ্কুচিত হলেও এই নীতিই শেষ পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছে।

এই নীতি অনুসারে, লাভের জন্য আগ্রহী ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন সাগরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করতে। সেখানে কুমারী ভূমি, অহল্যা জমি তখনও অনাবিষ্কৃত, হয়ত সেখানে সোনার সন্ধান মিলবে। এই সোনা সেইকালে প্রকৃতপক্ষে বণিকগোষ্ঠী, রাজন্যবর্গ এবং রাষ্ট্রনেতাদের দিবাস্বপ্নের আকাশ অনেকখানি ছেয়ে ছিল। এল্ ডোরাডোর উপকথা, গোল্ডেন ম্যান বা স্বর্ণ-মানবের রূপকথার দেশ এক শ্রেণীর অভিযাত্রীদের পুরুষানুক্রমে হাতছানি দিয়েছে, যার ফলে তাঁরা জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ধনসম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে ছুটেছেন স্বর্ণ-সন্ধানে।

এ সব যতই কেন গুরুত্বপূর্ণ হোক, রাজন্যবর্গ এবং ব্যবসায়ীদের টাকা-গণনার কেন্দ্র 'কাউন্টিং হাউস'-গুলির স্বর্ণ-সন্ধানের মধ্যে, ইউরোপের রেনেসাঁস আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমতম সীমান্ত রচনায় যে ভূমিকা নিয়েছিল তার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কল্পলোকে যে নবীন স্বপ্ন দোলা দিচ্ছিল, স্বর্ণ ছিল তার একটা প্রতীক মাত্র। এইসব অভিযাত্রীবৃন্দ এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবৃন্দ সেদিন প্রকৃতপক্ষে বিজয় করে নেওয়ার জন্য নব নব সীমান্তের উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ যে পরিমাণে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল তার প্রয়োজনে নতুন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিজস্ব সীমানার বাইরে গিয়ে সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে হয়েছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সংগঠনীর প্রয়োজন ছিল—আর রেনেসাঁসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সেই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়েছিল—সেদিন প্রয়োজন ছিল উন্মাদ, স্বপ্নবিলাসী, সাধু-সন্ত, দুর্বৃত্ত প্রভৃতির স্বপ্নকে সফল

করার। প্রাচীন পৃথিবীর অবিচার আর জ্বালার হাত থেকে মুক্ত এক সর্বাঙ্গসুন্দর নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন।

আমেরিকা আবিষ্কারের পরবর্তী শতাব্দীকালের মধ্যে স্যার টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬), স্যার ফ্রান্সিস্ বেকনের 'দি নিউ এটলান্টিস্' (১৬২৭), টমাসো ক্যামপানেলার 'দি সিটি অব দি সান' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী যে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ গঠনের দাবী জানিয়েছিল তা নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। আমেরিকার আবিষ্কার প্রাকৃতিক সম্পদের অতুল বৈভবে পরিপূর্ণ এক বিরাট মহাদেশের আবিষ্কার। এই সম্পদের সঙ্গে তখন পযন্ত সভ্যতার স্পর্শ লাগেনি। তাই আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এক সীমাহীন সুযোগের স্বপ্ন সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হল। অনেক ইউরোপীয়ের কাছে আমেরিকা ছিল ঠিক সেই দেশ, যেখানে এক সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ রচনা করা সম্ভব। এক হিসাবে, আমেরিকা এক নতুন সমাজ যেখানে সব কিছু করা সম্ভব, এই স্বপ্নসাধ আজো অক্ষুণ্ণ।

উদ্দাম সমুদ্র, বিদ্রোহী নাবিক, শত্রুভাবাপন্ন স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতা এবং নিরন্তর অজানার আতঙ্ক উপেক্ষা করে কারা সেদিন স্বর্ণ, গৌরব এবং স্বপ্ন সফল করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন? তাঁদের নাম প্রাথমিক শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রের কাছে পরিচিত।

জেনোয়াবাসী নাবিক কলম্বাস, অতলান্তিক সমুদ্রপথ বেয়ে ভারতবর্ষে যাত্রার উদগ্র বাসনা তার মনে। দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, অবশেষে স্পেনের ফার্ডিনাণ্ড আর ইসাবেলার সমর্থন লাভ করেছেন। অবশেষে, সমুদ্র-যাত্রার সংখ্যাতীত বিপর্যয় ভোগ করে বাহামা উপকূলে এসে পৌছেন। পরবর্তী সমুদ্রযাত্রায় তিনি মধ্য আমেরিকা আবিষ্কারে ব্রতী হন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁর ভৌগলিক ভ্রান্তি—ভারতবর্ষের পথ সন্ধানের বাসনা ত্যাগ করেননি। তিনি শত্রুদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছেন—হিস্পানিওলার গভর্ণর তাঁকে একবার শৃঙ্খলিত অবস্থায় স্পেনে পাঠিয়েছেন, সমকালীনদের কাছে বিস্মৃত, অবহেলিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

স্পেনীয় আবিষ্কারক কল্পনাবিলাসী পন্‌সে ত্থ লিওন নাকি 'তারুণ্যের ফোয়ারা'র সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, ঐতিহাসিকরা অবশ্যই এই ধারণা সমর্থন

করেন না। তিনি কিন্তু ক্যারীবীয়ান অঞ্চল আবিষ্কার করে উপনিবেশ গঠনে আশ্চর্য কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কবি, পণ্ডিত এবং আবিষ্কারক স্যার ওয়ালটার র‍্যালে, তিনি ভার্জিনিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনায় উপনিবেশ গঠনে উদ্যোগী হন। আলু এবং তামাকের সঙ্গে ইউরোপের তিনিই পরিচয় ঘটিয়েছেন।

স্পেনীয় আবিষ্কারক ফ্রান্সিস্কো পিজারো ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ। শূকরপালক হিসাবে জীবন শুরু করে তিনি শেষ পর্যন্ত পেরুর বিজেতা হয়েছিলেন এবং এই বিজয়সূত্রে অনুষ্ঠিত তাঁর নৃশংসতা এবং নির্যাতন তাঁর নামটাকেই নৃশংসতার প্রতিশব্দে পরিণত করেছে।

এই সব মানুষ এবং যে সব ঔপনিবেশিক তাঁদের অনুগমন করেছিলেন তাঁরা সবাই ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মনোভঙ্গীর দিক থেকে বিভিন্ন ছিলেন, তবে এক জায়গায় তাঁদের মিল ছিল। পুরাতন পৃথিবীর সীমান্ত অতিক্রম করার, নিজেদের অদৃষ্টের উন্নয়ন করার, এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বাইরে আসার বাসনা তাঁদের সকলের সমান উদগ্র ছিল।

ইউরোপীয়েরা কি কলাকৌশল, বিশেষ জ্ঞান বা মনোভংগী সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন? অনেক দিক থেকেই আমেরিকার এই আগন্তুক বাসিন্দা ছিল অভিনব মানুষ। ব্রিটেনে কিংবা গলে (ফ্রান্সে) রোমানদের মত এই সব ঔপনিবেশিক কোন সৈন্যবাহিনীর অংশবিশেষ ছিলেন না, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন না।

একেবারে প্রথম দিকে যে সব ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় এসেছিলেন তাঁরা ছাড়া, স্বদেশে ফিরে যাওয়ার বাসনাও কারো ছিল না। স্বদেশ তাঁদের কাছে সাধারণতঃ ছিল এই নতুন মহাদেশ। এক মহাসমুদ্রের ব্যবধান তাদের সেই একদা-পরিচিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এই অবস্থায় তাঁরা যে বিশেষ অসুখী ছিলেন তা নয়। বরং তাঁদের অনেকেই পুরাতন পৃথিবীর অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় স্বদেশ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

অনেকে আবার, যেমন ইংরাজ শুচিবাগীশদের দল (পিউরিটান), তাঁদের মনোমত প্রথায় ভজন-পূজনের স্বাধীনতা ভোগ করার উদ্দেশ্যে চলে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁরাই আবার যে মুহূর্তে বেশ গুছিয়ে নিয়ে নিজেদের

গোষ্ঠী তৈরী করে বসেছেন, তখন অপর মতের ভিন্ন দলকে অনুরূপ স্বাধীনতা দানে অস্বীকার করেছেন।

কোনো ভাবে কলঙ্কবিজড়িত হয়ে পড়ার পর প্রতিবেশী, বন্ধু প্রভৃতিদের ভৎর্সনাকে এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যেও অনেকে এসেছিলেন। প্রথম দিকের অভিযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিলেন স্বর্ণ-সন্ধানে; তাঁরাই শুধু স্বদেশে ফিরে বাকী জীবনটা বৈভব ও বিলাসে কাটাবেন আশা করতেন।

কিন্তু অধিকাংশই এসেছিলেন জমির আশায়। তাঁরা এই বিরাট মহাদেশের মধ্যে এমন এক সচ্ছল এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন, যা স্বদেশে বাস করে উপভোগ করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে যাঁরা ঘর ছেড়ে এসেছেন তাঁদের যুক্তির সঙ্গে এঁদের যুক্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

কর্ম, সম্পদ এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে এই সব মানুষের যে মানসিকতা ছিল তার ফলেই তাঁরা আশ্চর্যরকম অল্পকালের মধ্যে মোটামুটি উন্নত ধরনের আর্থনীতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এই দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া দেখা যাবে যে, যে সব ক্ষেত্রে তাঁদের স্বদেশস্থ সরকার তাঁদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন সেখানেই তাঁরা বিশেষ ভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন। এই স্বাধীনতার ফলে ইউরোপীয় উদ্ভাবনী শক্তির বশে তাঁরা সাফল্যজনক ভাবে এই কঙ্করকঠিন সীমান্তের কুমারী মহাদেশে অতি সহজেই আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন।

সুতরাং, ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টা ও উদ্যম ঔপনিবেশিক জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং প্রথম সীমান্তের মোকাবিলা করে উত্তরোত্তর পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এই ব্যক্তিগত উদ্যম যে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

উত্তর আমেরিকার মুখ্য আবিষ্কারকগণ ঃ ১৪৯২-১৬০৯

আবিষ্কারক	জাতি	সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক	তারিখ	আবিষ্কৃত অঞ্চল	উদ্দেশ্য
ক্রিস্টোফার কলম্বাস	ইতালীয়	স্পেন	১৪৯২-১৪৯৩ ১৪৯৮-১৫০০	ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	দূর প্রাচ্যের পথ সন্ধান
জন ক্যাবট	ইতালীয়	ইংলণ্ড	১৪৯৭-৯৮	ল্যাবরাডোর	উত্তর আমেরিকার উপকূল সন্ধান
জুয়ান পনসে দ্য লিওন	স্পেনীয়	স্পেন	১৫১৩	ফ্লোরিডা	বিজয় এবং লাভ অর্জন
জিওভানি দা ভেরাজোনো	ইতালীয়	ফ্রান্স	১৫২৪	অতলান্তিক উপকূল, নিউ ইয়র্ক বন্দর	দূর প্রাচ্যের পথ সন্ধান
জ্যাকোস কারতিয়ে	ফরাসী	ফ্রান্স	১৫৩৪	সেণ্ট লরেন্স নদী	বাণিজ্য, উত্তর-পশ্চিম পথের সন্ধান
হারনান্দো ডি সটো	স্পেনীয়	স্পেন	১৫৩৯-৪১	মিসিসিপি	স্বর্ণ সন্ধান
ফ্রানসিস্কো ডি কোরোনাডো	স্পেনীয়	স্পেন	১৫৪০	দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র	স্বর্ণ সন্ধান
ফ্রান্সিস ড্রেক	ইংরাজ	ইংলণ্ড	১৫৭৭-৮০	ক্যালিফোর্ণিয়া উপকূল	বিজয় এবং লাভ অর্জন
স্যামুয়েল দ্য চ্যামপ্লেন	ফরাসী	ফ্রান্স	১৬০৭-০৯	কুইবেক, উত্তর নিউ ইয়র্ক	পশম ব্যবসা ও উপনিবেশ গঠন
হেনরী হাডসন	ইংরাজ	নেদারল্যাণ্ডস্	১৬০৯	হাডসন নদী	দূর প্রাচ্যের পথ সন্ধান

নতুন জগতের পত্তনী

পশ্চিম গোলার্ধের এই আবিষ্কারের ফলে পুরাতন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাদির ওপর একটা বিশাল প্রভাব বিস্তারিত হল। এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা আবার উত্তর আমেরিকায় ইংরাজদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দান করল।

ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনাকালে কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক, ইউরোপের রাজপরিবার-সমূহের মধ্যে বংশগত যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই কালটিতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অপর দল ভূমধ্যসাগর-নিয়ন্ত্রণ অধিকারই সে-যুগের ইউরোপের রাষ্ট্রগত শক্তিপরীক্ষার একমাত্র পরশমণি এ-কথা বলেছেন। অপর একদল ঐতিহাসিক আবার এই সব সংঘাতের ধর্মীয়, আর্থনীতিক অথবা রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সব-রকমের ব্যাখ্যারই পিছনে একটা ধারাবাহিক বিষয়বস্তু আছে যা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ইংরাজরা যদিও প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন তবু সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিল পরোক্ষ, সেখানে প্রধান ভূমিকায় ছিল স্পেনীয়, ফরাসী, অস্ট্রিয়ার হাপসবুর্গ বংশ এবং ওটোমান তুর্কীরা। মহাদেশীয় ইউরোপের সঙ্গে ইংলিশ প্রণালীর এবং ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে আরও দুস্তর ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সিংহাসনের অধিকার পেয়েছে এমন এক রাজবংশের শাসন, মহামান্য পোপ কর্তৃক ইংরাজদের ধর্মের অস্বীকৃতি, ইত্যাদির ফলে ইংরাজরা রুক্ষ স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠে। আবার ইংরাজরা স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠে ঠিক সেই সময়টিতে যখন চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সমুদ্রপারের অভিযানে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী হয়ে ওঠে।

ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজের সেকালের মহাদেশীয় ইউরোপের ক্ষমতার রাজনীতিতে সবিশেষ যোগ ছিল না। ঐ রাজনীতির সঙ্গে তার স্বার্থও বিশেষভাবে জড়িত ছিল না। তার এই আপেক্ষিক নিস্পৃহতায় একটা বিশেষ শুভ ফল লাভ হয়েছিল; কনটিনেন্টের বাইরে যে-সব সুযোগ-সুবিধা ঘটতে পারে সেই বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ সজাগ।

নতুন জগতের দ্বার খুলে যাওয়ার ফলে এই জাতীয় এক সুযোগ পাওয়া গেল। ইংলণ্ডের পক্ষে এ এক নতুন রঙ্গভূমি যেখানে সে অবাধে সমকক্ষ হিসাবে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। কারণ, কলম্বাসের একশত বছর পরেও কি স্পেনীয় কিংবা আরো পরে ফরাসীরাও, নতুন জগতের সবটাতে বসতি স্থাপন ত' দূরের কথা, তার সবটা আবিষ্কারও করে উঠতে পারেনি।

মহাদেশীয় ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর কাছে নতুন জগৎ ছিল একটি পার্শ্ব দৃশ্যমাত্র। মূল নাটক অভিনীত হচ্ছিল অন্যত্র। কিন্তু সমুদ্রচারী ইংরাজের কাছে পশ্চিমাভিমুখে অচিরে পাল তুলে পাড়ি দেওয়া প্রধানতম আকর্ষণ হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত জোতদার সম্প্রদায়, দুঃসাহসী অভিযাত্রী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সকলেই ব্যক্তিগত লাভের সুযোগ সম্ভাবনা অবিলম্বে উপলব্ধি করল। আবার রাজা মনে করলেন, যা কিছু ইংরাজের পক্ষে লাভজনক হবে তাই রাজকীয় কোষাগার পূর্ণ করবে। নতুন ভূমিতে প্রাধান্যলাভের এই প্রতিযোগিতায় স্পেনীয় **বিজয়ী-গোষ্ঠী** বা ফরাসী মিশনারী বা শিকারী দলের চেয়ে একটু বিশেষভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়।

ইংলণ্ডের সমুদ্রচরগণ এলিজাবেথ টিউডরের চেয়ে উৎসাহী এবং সাহসী পৃষ্ঠপোষক আশা করতে পারতেন না, ইনি ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ পর্যায়ে, সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ যে ইউরোপের অন্যান্য বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর সামর্থের বাইরে—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারত না। এই সরল ঘটনাটুকু যেমন ৩৫০ বৎসরকাল ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি প্রভাবিত করেছে নতুন জগতের সেই অংশকে যে অংশকে আজ আমরা যুক্তরাষ্ট্র বলি।

ইংরাজের ঔপনিবেশিকতার প্রকৃত সূত্রপাত এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী প্রথম জেমসের কাল থেকে। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে এই ষ্টুয়ার্ট সম্রাট লণ্ডন কোম্পানী নামক প্রতিষ্ঠানকে সনদ দান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিগত মালিকানায় সংগঠিত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল নতুন জগতে লাভজনক উপনিবেশ গড়ে তোলা। আট মাস পরে কোম্পানীর অংশীদারদের একটা বৃহৎ অংশ জাহাজঘাটায় গিয়ে যে ১৪৪ জন সমুদ্রযাত্রা করলেন তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন, আর তাঁরা সেদিন যে অঞ্চলের উদ্দেশ্যে

যাত্রা করেছিলেন সেইটি হয়ে ওঠে উত্তর আমেরিকায় প্রথমতম স্থায়ী ইংরেজ উপনিবেশ—ভার্জিনিয়া রাজ্যের জেমস্‌টাউন।

এর পূর্বে ইংরাজের উপনিবেশ গঠনের চেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত স্যার ওয়ালটার র‍্যালের রাওনোক দ্বীপের উপনিবেশের অদৃষ্ট আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। র‍্যালের অর্ধ-ভ্রাতা স্যার হামফ্রে গিলবার্ট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে উপনিবেশ গঠন প্রচেষ্টায় দেউলিয়া হয়ে পড়েন। ১৬০৭-এর মে মাসে জেমস্‌টাউন গঠনের পূর্ব পর্যন্ত নতুন জগতে শুধুমাত্র স্পেনীয় ও ফরাসীদের পক্ষে উপনিবেশ পত্তন করা সম্ভব হয়।



স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে (১৫৫২?—১৬১৮)
—ছিলেন একজন প্রকৃত দুঃসাহসী অভিযাত্রী এবং আর্থনীতিক লাভের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন জগতে তিনি উপনিবেশসমূহ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন।

স্পেনীয়রা মেকসিকো এবং পেরুর খনিজ সম্পদ উদ্ধারে ব্রতী হয়। ইংরাজদের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের অগ্রগামী ছিলেন ফরাসীরা, তাঁরা উত্তর-পূর্ব কানাডা এবং সমগ্র ওহায়ো এবং মিসিসিপি নদীর উপত্যকায় মূল্যবান ফারপশমের ব্যবসা গঠন প্রচেষ্টায় সমগ্র শক্তি সংহত করেন। এই সব অ-ইংরাজ উপনিবেশের আকার দানে ভৌগলিক এবং আবহাওয়াগত কারণসমূহের উল্লেখনীয় ভূমিকা বর্তমান। স্পেনীয়রা উষ্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে খনির কাজ করা ছাড়াও, বিস্তারিতভাবে কৃষিকর্ম চালিয়েছে। এই সব জমি শক্তিশালী এবং ধনী জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ফরাসী-অধিকৃত উত্তর অঞ্চল কিন্তু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, শিকারী এবং মিশনারীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ফরাসী সীমান্তে ইতঃস্তত বিচ্ছিন্ন বহু বাণিজ্য-ঘাঁটি এবং দুর্গ দেখা যেত।

স্পেনীয় এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি ছিল স্বেচ্ছাতান্ত্রিক এবং অতিমাত্রায় রক্ষণপ্রয়াসী। কোনো প্রকার ব্যক্তিগত ব্যবসা-প্রচেষ্টা বা

ব্যক্তিবিশেষের একক প্রয়াসকে তারা সর্বতোভাবে নিরাশ করেছে, আবার সেই সঙ্গে পুরাতন পৃথিবীর বহুবিধ শ্রেণীবৈষম্যও তারা নতুন পৃথিবীতে কায়েম করেছে। দরিদ্র ঔপনিবেশিকের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমিদাসদের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূসম্পত্তির মালিকানা সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরাজদের মত ফরাসী বা স্পেনীয় জমির মালিকরা কদাচিৎ সাধারণ মানুষকে সুবিধা দরে বা বিনামূল্যে ভূমি দান করতেন। অনুরূপভাবে জেমসটাউনের কয়েক বছর পরে যে-সব ওলন্দাজ এবং সুইডিস উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল সেখানে সকল প্রকার ব্যবসা-প্রচেষ্টার উপর যৌথ মূলধনী ব্যবসায় কোম্পানীসমূহের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই সব দেশের নতুন জগতের উপনিবেশগুলি তখন আকারে ক্ষুদ্র ছিল, কারণ ইউরোপ থেকে আগত মানুষদের তারা সুযোগ-সুবিধা দিত অতি অল্পই। ফরাসী পত্তনীর স্বল্পতার ফলে সমগ্র পশ্চিমা জগতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ভূমিকা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। অনুরূপভাবে, নিউ আমষ্টার-ডামের ক্ষুদ্র ওলন্দাজ উপনিবেশ ইংরাজদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতেই পারেনি, ফলে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক রকম বিনা বাধায় ইংরাজরা তা অধিকার করে নিয়েছিল।

ক্যারীবিয়ান অঞ্চলে পত্তনীর আয়তনটাই, স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের প্রধান সমস্যা ছিল না। ঔপনিবেশিকদের বাণিজ্যের উপর স্পেনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ তাদের ব্যবসা-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে এবং স্পেনের এই নীতি ইংরাজ ও ফরাসী চোরাচালান ও বোম্বেটেগিরিকে এক রকম আমন্ত্রণ করে এনেছে।

অতলান্তিক উপকূলে যে-সব ইংরাজ উপনিবেশ একের পর এক জেমস-টাউন পত্তনীর পর গড়ে উঠেছিল সেখানেও এই জাতীয় উৎপাত ছিল। ইংলণ্ডের পক্ষে অবশ্য তার স্বার্থপর উদ্দেশ্যকে কিঞ্চিৎ হ্রাস করে অনুরূপ স্বার্থপর উদারতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসা-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফরাসী বা স্পেনীয়দের নীতির বিপরীত ছিল ইংরাজের মার্কিন উপনিবেশ গঠন পদ্ধতি। জনসাধারণের কাছে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করে ইংরাজদের উপনিবেশ গঠনের মূলধন সংগ্রহ করতে হয়েছে। ইংরাজ রাজতন্ত্র কোনো-কালেই স্বচ্ছল ছিল না। রাজা উপনিবেশ গড়ে তোলেননি, কিংবা কোন

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তাও করেননি। পরিবর্তে, রাজা সনদ দিয়েছেন সেই সব ব্যক্তিকে যাঁরা এই প্রচেষ্টায় নিজেদের ধনসম্পত্তি পণ করে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের অবস্থা সাম্রাজ্যগঠনের ঠিক উপযোগী হয়ে উঠেছিল। টিউডররা চার্চের সম্পত্তি অধিকার করে নেওয়ার ফলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের হাতে অনভ্যস্ত ধনসম্পত্তি এসে পড়েছে। বাণিজ্য এবং শিল্প তখন বিশেষ তেজী এবং শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং মহাজনবৃন্দ ইংলণ্ডের কারখানাগুলিকে চালু রাথার উপযোগী কাঁচা মাল এবং নতুন বাজারের সন্ধান করতে আরম্ভ করেন।

এ ছাড়া, পশমের কলগুলির প্রতিষ্ঠা, মেষপালনের জন্য সাম্প্রদায়িক খামার জমিকে ঘেরাও করা এবং ধর্মীয় মঠগুলির বিলুপ্তিসাধন হাজার হাজার মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। এই রকম বহু বেকার, দেনদার এবং অন্যান্য বাউণ্ডুলে ব্যক্তি তাদের সমস্যার সমাধান মিলবে উপনিবেশে, এই আশা করেছিল। এই যাত্রার খরচ যোগানোর জন্য অনেকে কোন কোম্পানীর কাজে আত্মনিয়োগ করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। আবার অনেকে মুক্ত মানুষ হিসাবে আসার জন্য তার শেষ সম্বল দিয়ে যাত্রার খরচ যুগিয়েছে। কিন্তু প্রতি ইংরাজ ঔপনিবেশিক দেখলেন, জীবনকে নতুন ভাবে সুরু করার এ এক সুযোগ উপস্থিত, জন্মভূমিতে যে শ্রেণীবৈষম্য তার বিকাশের পথ সীমিত রেখেছিল এখানে সে বাধা দূর করা যাবে।

লগ্নীকাররাই প্রধানতঃ উপনিবেশ গঠনের প্রকল্পকে অগ্রসর করেছে। গিলবার্ট, র‍্যালে এবং অন্যান্যদের অসাফল্য থেকে ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন লগ্নীকারকের উপলব্ধি হয়েছিল যে, উপনিবেশ গঠন করার মত প্রভূত সম্পদ কোন ব্যক্তিরই একার থাকা সম্ভব নয়। এই ভাবে যৌথ কারবারগুলি সংগঠিত হয়েছে এবং তারা রাজকীয় সনদ লাভ করেছে উপনিবেশ গঠন প্রকল্পে বা লাভের উদ্দেশ্যে জোতজমি গঠনে। এই সব সনদ অধিকারীকে কোনো একটি অঞ্চল দান করে সেই সঙ্গে সেই অঞ্চলস্থ ভবিষ্যৎ পত্তনীদারের উপর সার্বভৌম অধিকারও দান করা হয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, যথা নিউ প্লাইমাউথ, ইংরাজ উপনিবেশগুলি প্রথম দিকে ছিল মালিকানা ব্যবস্থাভূত।

ব্যক্তিবিশেষ, যথা লর্ড বালটিমোর, উইলিয়ম পেন, জন কার্টারেট, দি ডিউক অব ইয়র্ক (পরে দ্বিতীয় জেমস), কিংবা কোন মালিকানা

প্রতিষ্ঠান, উভয় ক্ষেত্রেই মালিক সেখানে ভূস্বামী, তিনিই ভূমির পত্তনীদারদের শাসক।

একেবারে গোড়ার দিকে, পত্তনীদারদের অধিকার-বিধিতে ভোটাধিকার বা চাকুরী পাওয়ার কোনো বিধি ছিল না, কারণ স্বদেশেও সকল ইংরাজের এই অধিকার ছিল না। কিন্তু ইংরাজদের রাষ্ট্রীয় অধিকার যেমন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, ঔপনিবেশিকদের ক্ষেত্রেও অধিকার সেইভাবে প্রসারিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড চ্যানিং মন্তব্য করেছেন—

"অপর জাতিভুক্ত পত্তনীদারদের, তাদের নরনারীদের বেলায় প্রযোজ্য আইন ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। এই ছিল তাদের অদৃষ্ট। ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা কিন্তু অন্যদিকে, ইংলণ্ডের সাধারণ আইনের সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতেন (অর্থাৎ তখনকার মান অনুসারে জুরির বিচার, হেবিয়াস কর্পাস বা আসামীকে সশরীরে হাজির করার অধিকার, এবং বাক্-স্বাধীনতা)। এই নীতি উপনিবেশবাদে এক নূতন যুগ সূচনা করেছে।" এই নীতি কিন্তু অজ্ঞাতসারে পরিণামে মূল জন্মভূমি থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার পথ রচনা করেছে।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাধারার আলোকে, জন্মভূমির মানুষের মত উপনিবেশের মানুষের সমানাধিকার দাবী ছিল সহ্যাতীত। এই দাবী বে-আইনী। উপনিবেশ গঠনে ইংরাজদের অভিপ্রায়ের মূলে ছিল রাজনৈতিক-আর্থনীতিক নীতি যার নাম বাণিজ্যবাদ বা মার্কেণ্টাইলিজম।

এই নীতি অনুসারে কোনো জাতি তখনই শক্তিমান এবং অর্থবান হতে পারে যদি সে আর্থনীতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়। অনুকূল বাণিজ্যকে ভারসাম্য বা 'ব্যালান্স অব ট্রেড' দ্বারা, অর্থাৎ আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর পরিমাণ বেশী করে এই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। এই সূত্রে 'অনুকূল' কথাটির অর্থ অতিশয় স্বার্থপর এবং সীমিত, কারণ এই নীতি ধরেই নিয়েছিল যে একটি জাতির যেখানে লাভ হবে সেখানে অপর একটি জাতি নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আভ্যন্তরীণ কৃষি ও বাণিজ্যকে সংরক্ষণ ও সহায়তা করে, যে পরিমাণ আমদানী করা হয় তার অনুপাতে অধিক পরিমাণে রপ্তানি করে, আর নিজের দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা মজুত রেখে বাণিজ্যবাদীরা আশা করেছিলেন, বেশ শক্তিশালী এবং উন্নতিশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা যাবে।

মূল জন্মভূমির অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনেই উপনিবেশ, এই ধারণা ছিল বাণিজ্যবাদীদের। উপনিবেশ কাঁচা মালের প্রাপ্তিস্থান এবং তৈরী মালের বিক্রয়কেন্দ্র। ইংরাজী ঔপনিবেশিক আইনও এই প্রেরণা বশেই বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

এই নাটকে তাই ব্যবসায়ীর চরিত্রটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। কারণ, বাণিজ্যিক নীতিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব ছিল তারই। কিন্তু ব্যবসায়ীর স্বার্থ পূরণ করাও মার্কেণ্টাইল মতবাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। রাজার স্বার্থ পূরণ করাটাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। আর সেই স্বার্থের দাবী ছিল রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নীতিকে সুসংহত করা এবং রাজ-কোষাগারে স্বর্ণের আগমন অব্যাহত রাখা।

স্বার্থপর হলেও এই নীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উন্নয়নের পক্ষে কোন মতেই সর্বনাশকর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সময় উপনিবেশের স্বার্থের সঙ্গে ইংলণ্ডের স্বার্থের কোন সংঘাত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে, ইংলণ্ডের স্বাচ্ছল্য স্থানীয় আর্থনীতিক উন্নয়নকে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া, ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক বাজার যখন ঔপনিবেশিক দ্রব্যাদির পক্ষে রুদ্ধ হয়েছে তখন সাধারণতঃ অন্যত্র বাজারের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে, বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা দক্ষিণ ইউরোপে। কারণ, সত্যের খাতিরে বলা যায় যে ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা ছিল তাঁদের মূল জন্মভূমির আত্মীয়-স্বজনদের মতই সব দিক দিয়ে সমান অগ্রণী এবং উদ্ভাবনীশক্তি-সম্পন্ন।

পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রকূলের পত্তনী কিভাবে হল

উপনিবেশ	প্রতিষ্ঠার তারিখ	নেতার নাম	জাতীয়তা	ধর্ম	উদ্দেশ্য
জেমসটাউন	১৬০৭	জন স্মিথ	ইংরাজ	এ্যাংলিক্যান	বাণিজ্যিক
প্লাইমাউথ	১৬২০	উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড	ইংরাজ	যাজক	ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে পলায়ন
নিউ আমষ্টারডাম	১৬২৬	পিটার মিনউইট	ওলন্দাজ	প্রোটেষ্ট্যাণ্ট	বাণিজ্যিক
মাসাচুসেটস্ বে	১৬২৯	জন উইনথ্রপ	ইংরাজ	পিউরিটান	ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে পলায়ন
মেরীল্যাণ্ড	১৬৩২	লর্ড বালটিমোর	ইংরাজ	ক্যাথলিক	ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে পলায়ন
কনেটিকট	১৬৩৫	টমাস হুকার	ইংরাজ	পিউরিট্যান	ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে পলায়ন
রোড আইল্যাণ্ড	১৬৩৬	রোজার উইলিয়ামস	ইংরাজ	পিউরিট্যান	ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে পলায়ন
নিউ সুইডেন	১৬৩৭	পিটার মিনউইট	সুইডিস	প্রোটেষ্ট্যাণ্ট	বাণিজ্যিক
নিউ জারজী	১৬৬৫	বার্কলে ও কার্টারেট	ইংরাজ	এ্যাংলিক্যান	বাণিজ্যিক
দি ক্যারোলাইনাস	১৬৭০	লর্ড সাফটসবেরী	ইংরাজ	এ্যাংলিক্যান	বাণিজ্যিক
পেনসিলভানিয়া	১৬৮১	উইলিয়াম পেন	ইংরাজ	কোয়েকার	ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক
জর্জিয়া	১৭৩২	জেমস ওগেলথর্প	ইংরাজ	এ্যাংলিক্যান	দেনাদারদের আশ্রয় স্থাপন

ঐক্যের পথে উপনিবেশ

ভার্জিনিয়, পেনসিলভেনিয়, নিউ ইয়র্কার এবং নিউ ইংলণ্ডাদের পার্থক্য আর নেই। আমি আর ভার্জিনিয় নই, আমি একজন আমেরিকান।

—প্যাট্রিক হেনরী, ১৭৭৪

তেরটি ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে তুলতে ১২৬ বছর লেগেছিল, জেমসটাউন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৬০৭-এ আর জর্জিয়া উপনিবেশ ১৭৩৩-এ ইংরাজ দেউলিয়া এবং দুর্বৃত্তের আশ্রয়স্থান হিসাবে গড়ে উঠেছে। ১৬৩০-১৬৪২-এর মধ্যের কালই শরণাগতের আগমনের উচ্চতম কাল; এই কালে মাত্র ১৬,০০০ নবাগত মাসাচুসেটস্ বে কলোনীতে প্রবেশ করেছেন। এই মাসাচুসেটস বে কলোনী ইংরাজ উপনিবেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনবসতিপূর্ণ স্থান। উপনিবেশগুলিতে লোকসংখ্যা এত অল্প এবং জীবন এত কঠিন ছিল যে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দেই নিশ্চিত ভাবে বলা যেত না যে, যে আটটি ইংরাজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তারা টিঁকে থাকবে কিনা।

ভয়ঙ্কর এক সমুদ্রের অপর পারে তিন হাজার মাইল দূরে ছিল তাদের মূল মাতৃভূমি। উৎপীড়িত ইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে বিপদ ছাড়াও উপনিবেশের বাসিন্দাদের মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজড়িত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, এই সব যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ইউরোপে হলেও উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ-গুলিতে তার প্রতিক্রিয়া সমভাবেই দেখা দিতে পারত। অধিকন্তু, উপনিবেশের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি তখনও ভাল ভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পিটার ষ্টাইভেসেন্টের নেতৃত্বে ওলন্দাজরা নিউ সুইডেন অধিকার করলেন। নয় বছর পরে তারাই আবার নিউ আমষ্টারডামকে ইংরাজদের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১৬৫০ থেকে ১৭৫০-এর মধ্যে উপনিবেশগুলি ভ্রূণ অবস্থা থেকে বিকশিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থার আকৃতি লাভ করল। তথাপি, এই উন্নয়নের মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায়নি যার ফলে ভবিষ্যৎ সংযুক্তিকরণ ও স্বাধীনতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাবাদর্শের দিক থেকে উপনিবেশগুলির মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনীতিক মতাদর্শের বিভিন্নতা ছিল দুস্তর, আর মন্থর এবং অকেজো যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপনিবেশগুলির মধ্যে বিরাট ভৌগোলিক দূরত্ব রচনা করেছিল। আর্থনীতিক ব্যবস্থাদিতে তাদের মধ্যে আরও ব্যাপক

অনৈক্য প্রকটিত হয়েছিল। তিনটি বিশেষ অঞ্চল গড়ে উঠল—নিউ ইংলণ্ড, মধ্য অতলান্তিক ও দক্ষিণ—এদের বিত্তসম্পদ এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হত।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিউ ইংলণ্ড ছিল কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের বসতি। এখানকার উগ্র আবহাওয়া, অনুর্বর ভূমি এবং ভূমি আইনের ব্যবস্থা, (এই ব্যবস্থানুসারে জমি বিভিন্ন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা যেত) ইত্যাদির জন্য কোন বিরাট খামার গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। খামারগুলি ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। দশ থেকে একশত একরের বেশী জমি কোন খামারে থাকত না। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছির আগে এই সম্ভাবনাহীন, কঙ্করকঠিন মৃত্তিকায় অতি অল্প পরিমাণ ফসলও ফলানো সম্ভব হয়নি।

কালক্রমে নিউ-ইংলণ্ডবাসীরা তাঁদের অভাবনীয় উদ্ভাবনীশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার লাভজনক শিল্প গড়ে তুলেছিল। নূতন বাসিন্দারা যখন ইণ্ডিয়ান শিকারীদের 'ফার' বা পশমের সঙ্গে 'রাম' জাতীয় মদের বিনিময় করার মূল্য বুঝতে পারল, তখন এই ব্যবসা বেশ গুরুত্ব অর্জন করল। জাহাজ নির্মাণ, মৎস্য শিকার, তিমি মাছ ধরা প্রভৃতি কাজও নিউ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল।

উর্বর কনেটিকটের উপত্যকায় শস্য-পেষাই শিল্প বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত হত না। তাই নিউ ইংলণ্ডকে শিল্পজাত দ্রব্যাদির একটা মোটা অংশ মূল জন্মভূমি থেকে আমদানি করতে হত। কিন্তু যে বিশেষ শিল্প এই অঞ্চলে পরিণামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে, এই ভাবে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মধ্য-অতলান্তিক উপনিবেশসমূহে—যথা, নিউ ইয়র্ক, নিউ জারজি এবং পেনসিলভেনিয়ায়—অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশীসংখ্যক অ-ইংরাজ নরনারী বাস করত। এই সব উপনিবেশের ওলন্দাজ, সুইডিস, জার্মান, আইরিশ এবং স্কচ-আইরিশ বাসিন্দারা এই অঞ্চলের সভ্যতার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে। নগর হিসাবে ভূমিদান না করে জমির মালিকরা ব্যক্তিগত ভাবে বাসিন্দাদের জমি বণ্টন করেছেন। অবশ্য এর বাবদ একটা সামান্য নির্দিষ্ট খাজনা ধার্য করা ছিলই। এই কর অবশ্য জনপ্রিয় ছিল না এবং তা আদায় করা কঠিন ছিল।

এখানকার মাটি কিন্তু নিউ ইংলণ্ডের চেয়েও অনেক উর্বর ছিল এবং তার ফলে এই অঞ্চলে এক বৈচিত্র্যময় কৃষি অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। মূল শস্য ছিল গম, সেই সঙ্গে গবাদি পশু উন্নয়নের ব্যবস্থাও ছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ব্রাণ্ডি, সিরাপ, চিনি এবং লবণের জন্য অবশ্য এই সব কৃষিপণ্য বিনিময় করা হত। অন্যান্য সব কয়টি উপনিবেশের মত এখানেও 'ফার' বা পশম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য ছিল।

নিউ ইংলণ্ডের চেয়ে এই সব মধ্যবর্তী উপনিবেশে নগদা-ফসল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উভয় অঞ্চলেই সাধারণ কৃষিকর্মটাই ছিল বড়, তা ছাড়া আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঘরে তৈরী হত। কারখানা তখনও গড়ে ওঠেনি।

পেনসিলভেনিয়ার লোহার কারখানায় কারখানা-সংগঠন প্রকল্পের সূচনার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে পাওয়া যায় মধ্য-অতলান্তিক অঞ্চলের প্রধানতম শিল্পপ্রচেষ্টার পরিচয়। এই শিল্পটি মূলতঃ গৃহস্থালীর উপযোগী বাসনপত্র প্রস্তুত করত আর শাবল, কুড়ুল, কোদাল প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযুক্ত লৌহফলকও তৈরী হত।

লোহার কারখানা শহরাঞ্চলে স্থাপিত হত না, খামার অঞ্চলের মধ্যে এই সব কারখানা গড়া হত। কয়েক সহস্র একর পরিমাণ জমির চারপাশে ছড়িয়ে থাকত লোহার খনি, শ্রমিকদের বসতি, পেষাই কল, কাঠ-চেরাই কল, লৌহচুল্লি, হাপর প্রভৃতি। লোহা ব্যবসায়ীরা তাঁদের কর্মীদের প্রধানতঃ আহার্য এবং বাসস্থান দিতেন বেতনের বিনিময়ে। এর অর্থ এই যে কৃষিকর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম (খাদ্য এবং শ্রমিকদের পরিধানযোগ্য কাপড়ের বুননযোগ্য আঁশ উৎপাদন) লোহার কাজের সঙ্গে সমতালে চালিয়ে যেতে হত। শ্রমিকদের অবস্থার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও অবাধ বাণিজ্য-প্রথার বৈশিষ্ট্যের এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হত।

অন্য দু'টি অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ উপনিবেশের অবস্থায় তীব্র পার্থক্য বর্তমান ছিল। এখানে বাণিজ্যিক কৃষিকর্ম এবং নগদা-ফসল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌছে। মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ায় তামাক এবং সাউথ ক্যারোলাইনায় ধানের চাষে সবচেয়ে বেশী জমি ব্যবহৃত হত। সুতরাং, দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত-খামার হাজার হাজার একরের নিরিখে পরিমাপ করা হত, শতকের হিসাবে নয়। এই সব ক্ষেত-খামারের জন্য প্রচণ্ড রৌদ্রে কর্মক্ষম অসংখ্য মজুরের

প্রয়োজন। মজুরের নিদারুণ অভাব এবং শ্বেতাঙ্গ মজুরদের এই জাতীয় প্রায়-বিষুবাঞ্চলীয় পরিবেশে কাজ করতে অনিচ্ছার ফলে দক্ষিণাঞ্চলকে দাস-শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। মধ্যবর্তী উপনিবেশসমূহে যদিও অনেক বড় বড় জোত-জমা ছিল এবং নিউ ইংলণ্ডে অনেক ধনী ব্যবসায়ীর বাস ছিল তবু শুধুমাত্র দক্ষিণাঞ্চলেই বৃহৎ খামার এবং দাস-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত একটা অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।

সস্তার জমি, সহজ ভূমি আইন, তার সঙ্গে নগদা-ফসলের চাষ (সাধারণতঃ তামাক, চাল, নীল) ইত্যাদির ফলে সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে আবার একটামাত্র ফসল, খামার-জাতীয় অর্থনীতি, যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নকে নিরুৎসাহিত করেছে। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জনসংখ্যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটখাটো পেটভাতার চাষীর সংখ্যা বৃহৎ ক্ষেত-মালিকের সংখ্যার চেয়ে ছিল অনেক বেশী। তবে প্রতিটি খামার মজুরীর কাজে আমদানিকৃত বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং ক্রীতদাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি স্বয়ম্ভর না হলেও তা বেশ লাভজনক ছিল।

দক্ষিণের খামার-অভিজাত, নিউ ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায় এবং মধ্য এবং উত্তরাঞ্চলের স্বাধীন কৃষিজীবিদের মধ্যে একটা কোনো সাধারণ মিলনসূত্র ছিল না বলা যায়। দক্ষিণের উদ্বৃত্ত ফসলের স্বাভাবিক বাজার ছিল ইউরোপ। কারণ অন্য উপনিবেশগুলির তা ভোগ করার ক্ষমতা ছিল না কিংবা বিনিময়ে দক্ষিণের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য দেওয়ার সামর্থ্যও তাদের ছিল না।

সামাজিক রীতিনীতি এবং আর্থনীতিক স্বার্থ বিভিন্ন অঞ্চলকে পৃথক করে রাখার কারণ হয়ে উঠল। দক্ষিণের এ্যাংলিক্যানরা উত্তরাঞ্চলের স্বভাব-গম্ভীর পিউরিট্যানদের মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু অতি অল্পই পেয়েছে। এদিকে পিউরিট্যানরাও আবার দক্ষিণী অভিজাতদের ছ্যাবলামি এবং ভগবদ্‌ভক্তিহীনতাকে তিরস্কৃত করেছে।

জীবনধারার পার্থক্য, আর্থনীতিক স্বার্থ, আবহাওয়া ও রাজনৈতিক সংগঠন এই সব উপনিবেশগুলিকে একতাবদ্ধ না করে বরং বিশেষ ভাবে বিভক্ত করেছে। তথাপি, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের সামান্য কিছু কাল পরে তেরটি উপনিবেশ মোটামুটিভাবে একতাবদ্ধ হয়েছে এবং সকলের যে শত্রু তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ করেছে। কি সেই বস্তু যা তাদের একতাবদ্ধ

হয়ে কাজ করার প্রেরণা দিয়েছে? কি সেই বস্তু যার জন্য ইংলণ্ডকে তারা সকলের সমান শত্রু বলে মনে করেছে?

এর উত্তর অংশত আর্থনীতিক। ইংরাজের নীতি সম্পর্কে প্রতিবাদ করার যথেষ্ট হেতু ছিল দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের। দক্ষিণী উৎপাদকদের বাজার যদিও ইউরোপ, ইংলণ্ড দাবী জানালো যে এই সব উৎপন্ন দ্রব্য মাতৃভূমিতেই বিক্রী করতে হবে। ইংলণ্ডের এই দাবীর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের লাভের মাত্রা বেশ কমে যেত। এ:ছাড়া ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য ছিল অনেক চড়া। দক্ষিণাঞ্চলের খামার মালিকগণ আতিথেয়তার জন্যই খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। বাণিজ্যিক ব্যাপারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার অবশ্য তেমন খ্যাতি ছিল না, ফলে তারা ইংরাজ উত্তমর্ণের কাছে বিরক্তিকর ঋণে জড়িয়ে পড়ত।

উত্তরাঞ্চলের ক্ষোভের পরিমাণ ছিল আরো বেশী। বৃটিশ ব্যবসায়বাদ বা মার্কেণ্টাইলিজমের মধ্যেই বৃটেনের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের ক্ষোভের কারণ নিহিত ছিল। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের কাছে ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎস ছিল উপনিবেশগুলি আর ইংলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারও এই উপনিবেশ, এই নীতিকে কেন্দ্র করেই অসন্তোষ প্রবল হয়ে উঠছিল। ঔপনিবেশিক যুগের আগাগোড়াই পালিয়ামেণ্ট তার বাণিজ্যিক নীতি দ্বারা ঔপনিবেশিক উৎপাদকদের উৎপাদন এবং রপ্তানি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। একদিক থেকে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, একদিকে ইংরাজরা চেষ্টা করেছে জোর করে তাদের বাণিজ্যিক নীতি উপনিবেশের উপর প্রয়োগ করার আর আমেরিকানরা চেষ্টা করেছে তা এড়িয়ে যাওয়ার।

সৌভাগ্য, মার্কিন উৎপাদনের ক্রমবিকাশে এই সব নীতির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ঘটেছে মাঝে মাঝে, হঠাৎ, অবিরাম বা বাঁধাধরা গতিতে নয়। ১৬৫১ থেকে ১৬৭৪ পর্যন্ত যে কালটি সেই কালে দেখা যায়, প্রায় দু'টি দশকেরও বেশী সময় ধরে এই বাধ্যতামূলক প্রচেষ্টা চলেছে। এই যুগে যে সব আইন রচিত হয়েছে তাতে কি পরিমাণ ঔপনিবেশিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করা যাবে তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, এই আইনানুসারে রপ্তানী দ্রব্য ইংরাজের জাহাজে করে ইংলণ্ডে পাঠাতে হবে এবং উপনিবেশের প্রয়োজনীয় যে সব চালান ইউরোপ থেকে যাবে তা ইংলণ্ড থেকে জাহাজে তুলতে হবে। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের

আইন উপনিবেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের ওপর বাধা সৃষ্টি করল, এক উপনিবেশ থেকে অন্য উপনিবেশে জাহাজ মারফৎ যে চিনি, তামাক এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য চালান যাবে তার ওপর কর ধার্য করা হল। উপনিবেশসমূহের বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটা বন্ধন গড়ে ওঠার প্রতিরোধে বাধ্যতামূলক ভাবে ঔপনিবেশিক শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টির এ এক স্পষ্ট প্রচেষ্টা।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের ঝোলাগুড় আইন নিউ ইংলণ্ডের কর্মকাণ্ডের গতি খর্ব করার এক পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী এবং ওলন্দাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সব উপনিবেশে চিনির দাম অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেল। নিউ ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীবৃন্দের পক্ষে তাদের নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়ে এই সব বিদেশী অঞ্চল থেকে চিনি, ঝোলাগুড়, রস প্রভৃতি ক্রয় করাই অনেকাংশে স্বাভাবিক। এই জাতীয় বাণিজ্য ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চিনিচাষীদের পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। তারা তাদের স্বদেশস্থ সরকারের কাছে অভিযোগ জানাল। পার্লিয়ামেণ্ট একমাত্র ব্রিটিশ সূত্র ছাড়া অন্য অঞ্চল থেকে চিনি, ঝোলাগুড় প্রভৃতি আমদানী করার ওপর গুরুতর কর নির্ধারণ করলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-ইণ্ডিয়ান যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই ধরনের ঔপনিবেশিক সংঘাত যে একেবারে চরমে ওঠেনি তার কারণ, এই যুদ্ধের পরেই মাত্র ইংরাজরা তাদের বাণিজ্যিক আইন বিধিবদ্ধ করবার এক সর্বগ্রাসী প্রচেষ্টা সুরু করে। এই বাধ্যতামূলক আইন চালানোর একটি হেতু ছিল সাম্প্রতিক যুদ্ধের কিছু পরিমাণ ব্যয়ভার উসুল করে নেওয়া। ব্রিটিশের ধারণা ছিল যে তারা

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ—১৬৮৯-১৭৬৩

তারিখ	আমেরিকায় যুদ্ধ	ইউরোপে যুদ্ধ	সন্ধি
১৬৮৯-৯৭	কিং উইলিয়ামের যুদ্ধ	লীগ্ অব অগস্বার্গের যুদ্ধ	রিজউইক
১৭০১-১৪	কুইন অ্যানের যুদ্ধ	স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ	উৎরেখৎ
১৭৪০-৪৮	কিং জর্জের যুদ্ধ	অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকারের যুদ্ধ	অ্যাচেন
১৭৫৬-৬৩	ফরাসী এবং ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধ	সাত বছরের যুদ্ধ	প্যারিস

ফরাসীদের হাত থেকে ঔপনিবেশিকদের রক্ষা করেছে; তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বাবদ যা ব্যয় হয়েছে সেটা তারাই বহন করুক।

পৌনঃপৌনিক ইণ্ডিয়ান সংগ্রামের জন্য সব কয়টি উপনিবেশেরই ইংরাজদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিক্ষোভ ছিল। ঔপনিবেশিকরা নিজেরাই যেমন ইণ্ডিয়ানদের উত্তপ্ত করার জন্য অনেক কিছু করেছে, তেমনই আবার ইণ্ডিয়ানরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের উপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে ফরাসীদের উত্তেজনায়, তা অস্বীকার করা যায় না। কিং উইলিয়ামের যুদ্ধে (১৬৮৯-১৬৯৭) ফরাসীরা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে জড়িত হয়ে একযোগে সেনেকটাডি, সালমা প্রপাত, এবং কাসকো উপনিবেশে ঔপনিবেশিকদেব নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে সংগঠিত ফরাসী-ইণ্ডিয়ান যুদ্ধসমূহে অনুরূপ ঘটনা বহুবার ঘটেছে। ইউরোপের ভূমিতে নানা প্রশ্নসংক্রান্ত সংঘাতের ফল হল এই সব যুদ্ধ। ঔপনিবেশিক অভীপ্সায় সেই সংঘাতই ফুটে উঠেছে। ঔপনিবেশিকদের কাছে কিন্তু এটা একটা সন্তোষকর পরিস্থিতি নয় যে, ব্রিটিশের পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনানুসাবে ব্রিটিশ সৈন্য তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করবে।

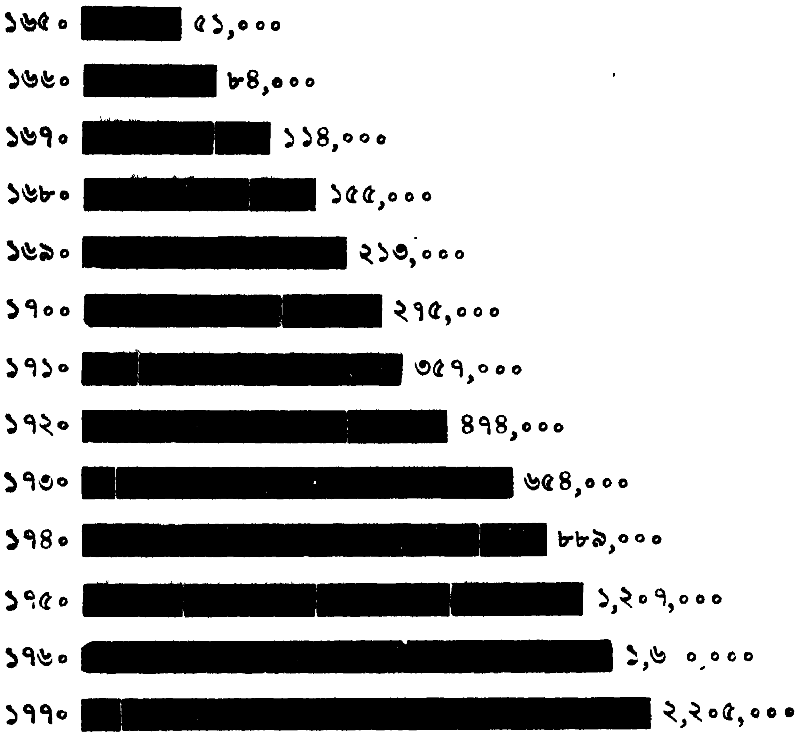
এই সব ঔপনিবেশিক যুদ্ধ মার্কিনী রাজনৈতিক চেতনার নিরন্তর স্বাতন্ত্র্য-বিলাসের হেতু এবং এই দিকটা জর্জ ওয়াশিংটনের বিদায়ী ভাষণে ধ্রুপদী অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই সব যুদ্ধ আবার উপনিবেশগুলিকে বহির্শক্রদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে এবং ব্রিটেনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে পারস্পরিক বিরক্তি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তেরটি উপনিবেশ একতাবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তারা বোঝাপড়ার সীমানাকে আরও পশ্চিম প্রান্তে হটিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার অংশভাগী হয়েছে। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে ওদের সকলের সমান অভিযোগ ছিল। নিউ ইংলণ্ডের অর্থনীতি যখন দক্ষিণী কাঁচা মাল কিনতে সুরু করল এবং তার শিল্পসংস্থা বিনিময়ে দক্ষিণের জন্য শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে সুরু করল তখন তাদের আর্থনীতিক স্বার্থও আর পরস্পরবিরোধী রইল না।

পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যে কুশাসন ব্যবস্থার আরও কয়েকটি চূড়ান্ত ঘটনায় এবং অত্যাচারের ফলে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেল এবং ব্রিটিশ আইনকে ফাঁকি দিয়ে চলার প্রচেষ্টা ক্রমে বিদ্রোহের আকার গ্রহণ করল।

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, ১৬৫০-১৭৫০

(আনুমানিক)



"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি যে, সকল মানুষই জন্মলাভ করে সমান অধিকার নিয়ে এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে তারা কতকগুলো অবিচ্ছেদ্য অধিকার নিয়ে আসে, আর তাদের মধ্যে আছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভের অধিকার।"

বিপ্লব এবং স্বাধীনতা

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে উপনিবেশ সম্পর্কে ব্রিটেনের "হিতকর অবহেলা"র নীতির অবসান ঘটল। নতুন উদ্যমে ব্রিটিশ বা মার্কেণ্টাইল বাণিজ্যিক নীতির প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক ভাবেই উপনিবেশসমূহের অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সূচিত হল। কঠোর রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের ফলে সকল উপনিবেশের কাছে এযাবৎ যা প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর মাত্র ছিল তা বিঘ্নিত হল। ১৭৬৩র ঘোষণা বলে আপ্যালাচিয়ান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে ভূমি দান এবং বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করা হল। এর ফলে ঐ অঞ্চলে নূতন স্বত্তাধিকারমূলক উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভব হয়ে উঠল। ফাটকাবাজ কিংবা ক্ষুদে চাষীরাও ঐ অঞ্চলে প্রবেশ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হল।

এর ওপর আবার ব্রিটিশরা দ্বিগুণ ভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে বাণিজ্যিক নীতির প্রয়োগ এবং উপনিবেশ থেকে খাজনা আদায় সুরু করল। এই সব বিধিনিষেধ এবং কর আরোপের ফলে ইংরাজ এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দিল।

বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গঠনের এই পুনরুজ্জীবিত নীতির বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক বিরোধিতা ছিল খানিকটা আর্থনীতিক প্রতিবাদ আর কিছুটা সংবিধানগত যুক্তি প্রদর্শন। উত্তরাঞ্চলীয় উপনিবেশগুলি যখন শুল্ক আইনসমূহ মেনে নিতে অসম্মতি প্রদর্শন করল এবং আমদানি এবং ব্রিটিশ দ্রব্যাদি ব্যবহার বর্জন করল তখন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কিঞ্চিৎ নরম হলেন। ব্রিটিশ সরকার তখন ঘৃণ্য ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট এবং টাউনসেণ্ড এ্যাক্ট বাতিল করে আরো একটু নতি স্বীকার করলেন। এই টাউনসেণ্ড এ্যাক্ট অনুসারে কয়েকটি সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো মতেই পার্লিয়ামেণ্ট কর নির্ধারণে তার যে "অধিকার" বর্তমান তা ত্যাগ করতে রাজী হল না। উপনিবেশের মানুষরা এই "অধিকার" স্বীকার করতে রাজী হল না, অন্ততঃ যতদিন না পার্লিয়ামেণ্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে ততদিন।

স্বাধীনতার যুদ্ধ জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের একটা নিখুঁত অভিব্যক্তি নয়। ঔপনিবেশিকরা রাজার প্রজা হিসাবে বিবেচিত হতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেনি, কিংবা পার্লিয়ামেণ্টের আইন এড়িয়ে যাওয়াটাও তাদের অভিপ্রেত ছিল না। বরং তাদের এই আপত্তির ভিত্তি অন্যত্র। ইংরাজ হিসাবে তাদের তথাকথিত যে স্বাভাবিক অধিকার, সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ। তারা রাজা তৃতীয় জর্জের সরকারের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের এ্যাংলো-স্যাক্সন ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে চায়নি। প্রকৃতপক্ষে, 'রাজা এবং পার্লিয়ামেণ্টের বিরুদ্ধে' এই বিদ্রোহকে সেই ঐতিহ্যেরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলে গণ্য করা যায়।

দ্বিধাগ্রস্ত ঔপনিবেশিকরা শেষ পর্যন্ত ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই যা জারি করেছিলেন সেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রাজনৈতিক দর্শন ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ ইউরোপীয় সংস্কার আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রের রচয়িতা টমাস জেফারসন তাঁর উদারনৈতিক রাষ্ট্র-দর্শনের মূলমন্ত্র হিসাবে বলেছেন—"শাসিত শ্রেণীর সম্পত্তিই সরকারের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের একমাত্র ভিত্তি।" এই কারণে, নতুন জগতের ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে যে বিপ্লব ঘটেছে তা শুধু স্বাধীনতার যুদ্ধমাত্র নয়। যে শক্তিশালী রাজনৈতিক চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের রাজনৈতিক কাঠামোকে ক্রমশঃ বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল, এই বিপ্লব ছিল তারই অভিব্যক্তি-মাত্র।

ঔপনিবেশিক জনগণের চারটি বিশিষ্ট শাখা এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শক্তি দান করেছে। এরা হলেন দক্ষিণের বৃহৎ চাষীগোষ্ঠী, উত্তরের ব্যবসায়ীবৃন্দ, ছোট্ট চাষীকুল, এবং বন্দর-নগরী এবং শহরের মজুরদল।

দক্ষিণের বৃহৎ চাষীদল উত্তরাঞ্চলের মহাজনদের তাদের ব্যবসায়ের উপর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এরা ব্রিটিশ নীতির দ্বারা

স্বাধীনতার সনদ রচনা—ফ্রাংকলীন, জেফারসন, এডামস, লিভিংষ্টোন এবং সেরম্যান কার্যরত। এলোনজো চ্যাপেল অঙ্কিত মূল চিত্রের প্রতিলিপি। সনদে উল্লিখিত 'মানুষের স্বাভাবিক অধিকার' কথাটি ইংরাজ দার্শনিক জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মানুষের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে ফরাসীরা তাদের সনদ ঘোষণা করে এই ধারা অনুসরণ করেছিল।



সমর্থনপুষ্ট মনে হয়েছিল। এ ছাড়া আপ্যালাচিয়ান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে সীমানা রুদ্ধ করার বিরুদ্ধেও তাদের প্রতিবাদ ছিল।

উত্তরাঞ্চলের বণিকগণ তাদের বাণিজ্য-ব্যবস্থার উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির ফাটকাবাজি থেকে বাদ পড়ায় অনুযোগ করে।

ছোট কিষাণরা বাণিজ্য-হ্রাস ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার ফলে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য কম করতে হয়, অধিকন্তু ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণার ফলে সীমান্তের পত্তনী তাদের কাছে অবরুদ্ধ হওয়ার জন্যও তারা প্রতিবাদ জানায়।

শহরের মজুররা ধনিকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এই শক্তিশালী ভদ্র সম্প্রদায়ের সমর্থনে ছিল পার্লিয়ামেণ্টারী নীতি। মজুর-শ্রেণীর জনগণ রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সামাজিক অসামঞ্জস্য হেতু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারাই কঠ্ঠর বিপ্লবীতে পরিণত হয়।

বিপ্লববাহিনীর অধিকাংশ গোলাবারুদ ফ্রান্স থেকে সংগৃহীত হত। এরাই মার্কিনীদের উগ্রতম মিত্র। প্রকৃতপক্ষে, ফরাসী সহায়তা ব্যতিরেকে এই সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এই যুদ্ধ বেশী দিন চালানো যেত না। কারণ, এই যুদ্ধে ব্রিটিশ মূলতঃ স্বদেশের অনৈক্যহেতু এবং রণকৌশলের দুর্বলতার জন্য পরাজিত হয়েছে। জন এডামস প্রথম দিকে কোনো রকম 'বিজড়িত মৈত্রীর' প্রবলতম বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈপ্লবিক প্রয়োজন এমনই আকার ধারণ করে যে, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীনের উপর ফ্রান্সের সঙ্গে "আক্রমণমূলক এবং আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী" চুক্তি সম্পাদনের ভার অর্পণ করলেন।

স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে থেকেই উপনিবেশের অর্থনীতি প্রভূত পরিমাণে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছিল। এই কারণে, সমরকালে, যদিও ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের মূল যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তথাপি ঔপনিবেশিক জনগণকে অহেতুক ক্লেশ ভোগ করতে হয়নি। এ ছাড়া, ফরাসী, স্প্যানিশ এবং ওলন্দাজরা চিরদিনই উপনিবেশের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য-ব্যবস্থা লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখেছে, ঔপনিবেশিক বন্দর থেকে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ অপসারিত হওয়ায় তারা এখন শূন্য স্থান গভীর আগ্রহে পূর্ণ করতে অগ্রসর হয়ে এল।



লেক্সিংটনের যুদ্ধ—(এলোনজো চ্যাপেলের অঙ্কিত চিত্র) ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল, লেকসিংটনের একটি ক্ষুদ্র 'মিনিটম্যান' বাহিনীর সঙ্গে একটি ব্রিটিশ বাহিনীর গোলা-বিনিময় ঘটে। এর ৭৮ মাস পরে প্রতিরোধের অবসান ঘটে।

এর উপর, অনুমান করা যায় প্রায় ২,০০০ হাজার আমেরিকান তাদের নিজস্ব (প্রাইভেট) নৌকা, বড় ডিঙি প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাদের আইনসম্মত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বাজেয়াপ্তীকরণ, চোরাচালান ও অবরোধ ডিঙানো প্রভৃতির মাধ্যমে অপরিমিত লাভের আশায়। বাস্তবিকপক্ষে, জাহাজ ও পণ্যদ্রব্যাদির প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতির জন্যই ইংরাজ বণিকেরা সত্বর যুদ্ধ অবসানের জন্য দাবী জানাতে বাধ্য হয়।

যদিও বিপ্লবের কালে উৎপাদনের দিক থেকে মার্কিন অর্থনীতি যথোপযুক্তভাবে সবল ছিল, তথাপি কোন রকমের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অভাবে সামরিক সরবরাহের প্রচণ্ড ঘাটতি ঘটে। কর আরোপের ক্ষমতা-বিরহিত অবস্থায় কংগ্রেস অঙ্গরাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র অর্থসংগ্রহের ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণ কেন্দ্রীভূত সরকারের প্রতি সমভাবাপন্ন থাকায় এবং কর-ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিরোধিতা থাকায়, রাজ্যগুলি অনেক সময় প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে বিরত থাকত। অনেকেই চারপাশে যে সংগ্রাম চলছে তা এক রকম উপেক্ষা করেই দৈনন্দিন কাজকর্ম যথারীতি করে যেত, ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের চিন্তাও কেউ করেনি।

অন্য দিকে আবার সাধারণ সৈনিকের দৃঢ়চিত্ততা, আমেরিকান আন্দোলনের সহায়তায় ফরাসীদের দ্বারা নিযুক্ত ইউরোপীয় যোদ্ধাদের প্রশংসা লাভ করেছিল। জেনারেল ডি কালব, ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের তীব্র শীতে ওয়াশিংটনের ক্ষুধার্ত, শীতার্ত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ভ্যালী ফোরজে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ইউরোপের কোনো সৈন্যদল এতখানি তিতিক্ষাভরে ক্লেশ সহ্য করে লড়াই করবে না। লাফায়েৎ নামক আর একজন ফরাসী জেনারেল সগর্বে লিখেছিলেন, "এতখানি বুভুক্ষা, নগ্নতা, ক্লেশভোগ সহ্য ক'রে এবং সম্পূর্ণ বিনা বেতনে যুদ্ধ একমাত্র নাগরিক সৈন্যরাই করতে পারে।"

ভ্যালী ফোরজের সুতীব্র শীতকালের পর বিপ্লবের জয়লাভের আশা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েকটি মার্কিনী বিজয়লাভ সৈন্যদের প্রাণে আনন্দসঞ্চার করল। আর যে ব্রিটিশরা এই সংকটের পরিসমাপ্তি আশা করেছিলেন তাঁরা ক্রমেই যুদ্ধবিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, কারণ এই যুদ্ধে করের ভার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠল। প্যারিস চুক্তি (ট্রিটি অব প্যারিস) সম্পাদিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। যে প্যারিস চুক্তির ফলে আমেরিকান বিপ্লবের অবসান ঘটে তা উভয় শক্তির দ্বারা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চূড়ান্ত ভাবে স্বাক্ষরিত হয়।

নতুন জাতির কয়েকটি আর্থনীতিক বিভাগে এই শান্তির ফলে কিঞ্চিৎ আর্থিক দৈন্য সূচিত হল। যুদ্ধকালীন তেজী চাহিদার রাতারাতি অবসান ঘটল, এক সর্বজনিক শত্রুর বিরুদ্ধে যে একতা দানা বেঁধে উঠেছিল তাও তেমনই ভাবে নিরুদ্দেশ হল। অধমর্ণরা দেনার পরিমাণ হ্রাস করার অনুরোধ জানালেন, এমন কি পুরোপুরি মকুবের দাবীও জানালেন। রপ্তানির যে সব বাঁধা নির্গমন পথ ছিল সেগুলি, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হওয়ায় পণ্যদ্রব্যের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে চাষীরা নতুন করে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। যুদ্ধকালে যে সব শিল্পসংস্থা অঙ্কুরিত হয়েছিল তাদের উৎপন্ন পণ্য গুদামে জমা হতে লাগল আর অন্যদিকে ইউরোপীয় দ্রব্যসম্ভার বিনা বাধায় এসে গৃহজাত দ্রব্যসম্ভারকে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান গ্রহণ করল।

যাই হোক, একদিকে যেমন অর্থনীতির কয়েকটি অংশে মন্দার চাপ পড়ল, তেমনই আবার অন্য কয়েকটি অংশের অবস্থা সক্রিয় এবং সম্প্রসারণশীল হয়ে উঠল।

বহির্জগতে পণ্যদ্রব্যাদির নতুন করে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষিণী কৃষকরা বিশেষ উপকৃত হন। আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য, যথা জমির উন্নয়ন, খাল খনন, মাশুল আদায়ের জন্য চুঙ্গীঘর এবং উৎপাদনকারী কোম্পানী প্রভৃতি নির্মাণের প্রয়োজনের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্য অনেক দিক থেকে উপকৃত হল— যেমন ইউরোপে সরাসরি রপ্তানি-করা কয়েকটি আমেরিকান পণ্যের ওপর তখনও ব্রিটিশ আনুকূল্য ছিল, এ ছাড়া মার্কিন বাণিজ্যের জন্য ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে গেল। আরও হল্যাণ্ড, প্রাশিয়া ও সুইডেনের সঙ্গে বাণিজ্যিক মৈত্রী সম্পন্ন হল।

তবে নতুন আমেরিকান অর্থনীতি এবং তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভাবনাকে দুর্বল 'আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশনে'র সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়েছে। আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশন আমেরিকান গঠনতন্ত্র ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত সমগ্র নীতির নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমষ্টি হিসাবে গণ্য ছিল। এই আর্টিকলস অব কনফেডারেশন ব্যবস্থায় গঠিত জাতীয় সরকার প্রকৃতপক্ষে শক্তিহীন ছিল, কারণ প্রতিটি রাজ্যকে তাদের স্ব স্ব ক্ষমতার অনেকখানি ধরে রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তারা নিজস্ব মুদ্রার ব্যবস্থা পর্যন্ত চালু রাখতে পারত।

অঙ্গরাষ্ট্রগুলির জাতীয় রাজস্ব তহবিল গঠনে অনিচ্ছা ছিল। সমকালীন আর্থনীতিক মন্দার সঙ্গে যে সব সামাজিক এবং আর্থনীতিক রূপান্তর ঘটেছিল, তার ফলে জাতীয় সংকট বৃদ্ধি পেতে লাগল। জাতীয় রাজস্ব আভ্যন্তরীণ দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে অপ্রচুর ছিল, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩,১০০,০০০ ডলার থেকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১,৪০০,০০০ ডলারে বর্ধিত হয়েছিল।

দুর্বল "আর্টিকলস্ অব কনফেডারেশনের" পরিবর্তে একটি নূতন শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠন করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। রাজনৈতিক বিভ্রান্তি এবং প্রজ্জ্বলিত আন্তর্রাজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর্থনীতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রায় অরাজক অবস্থা প্রভৃতির ফলে নতুন সরকার গঠন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল 'চিরন্তন সংযুক্তি'এবং সমৃদ্ধি লাভের যেটুকু আশা ছিল তা পূরণের জন্য।

অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর 'উপযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের জন্য এবারও জনগণের চারটি বিভিন্ন অংশ থেকে দাবী এল: (১) যথেষ্ট কাগজী অর্থ (পেপার মনি), লগ্নীবণ্ড এবং সার্টিফিকেটের অধিকারীবৃন্দ, (২) উন্নয়নশীল উৎপাদকবৃন্দ, যাঁরা বিদেশী দ্রব্য এবং ব্যবসায় সংস্থার প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে

সংরক্ষণ চেয়েছিল, (৩) আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীবৃন্দ, যাঁরা চেয়েছিলেন একটা সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা আর অনিয়ন্ত্রিত আন্তর্রাজ্য বাণিজ্য এবং (৪) জমির ফাটকাবাজ, যাদের ধারণা হয়েছিল যে একটা সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলে তাদের জমিজমার দাম বাড়বে।

উপরন্তু, আর্থনীতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন অনেক ব্যক্তিও সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের স্বপক্ষে ছিল। আমেরিকান জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় তাঁরা প্রণোদিত হয়েছিলেন, জাতীয়তাবাদ তখন সমগ্র নতুন জাতির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে এসেছিল।

সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তারা কিন্তু প্রবল বাধা পেলেন দেনদার-গোষ্ঠীর কাছ থেকে। পশ্চিম সীমান্তের ক্ষুদ্র চাষীদের এই গোষ্ঠী মনে করেছিল যে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলো ওদের 'সস্তার টাকা'র অভিলাষের প্রতি অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। এই সব দেনদার প্রচণ্ড সমর্থন পেয়েছিলেন সেই সব ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাঁরা আশংকা করেছিলেন যে সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে হয়ত।

দেনদার এবং পাওনাদারদের সংঘর্ষ মাসাচুসেটসেই তীব্র ভাবে প্রকটিত হল, সেখানকার কর-ব্যবস্থা চাষীদের ক্ষতি করে পাওনাদারদের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব করত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সব অধমর্ণ চাষীরা রাজ্য

আইন	তারিখ	মুখ্য ধারা
নেভিগেশন এ্যাক্ট	১৬৫১	সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সব পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য করা হবে তা ব্রিটিশ বা আমেরিকান জাহাজ মারফৎ হবে
ষ্টেপল এ্যাক্ট	১৬৬৩	ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য ইংলিশ বন্দর থেকে কলোনীর জন্য চালান দিতে হবে
নেভিগেশন এ্যাক্ট	১৬৯৬	পূর্ববর্তী আইনকে কঠোরতর ভাবে বলবৎ করা হবে
উলেনস এ্যাক্ট	১৬৯৯	পশমে আন্তঃ-উপনিবেশ বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণ
আর্টিফিসারস এ্যাক্ট	১৭১৮	ইংলণ্ড থেকে কলাকুশলী কর্মীদের লুব্ধ করে আনা নিষিদ্ধকরণ
মোলাসেস এ্যাক্ট	১৭৩৩	চিনি, ঝোলাগুড়, রাম, স্পিরিট প্রভৃতি দ্রব্যাদি অ-ব্রিটিশ অঞ্চল থেকে আমদানির ওপর করভার আরোপ

এই সব পার্লামেন্টীয়

সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ সুরু করল। মাসাচুসেটস সরকার কয়েক মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হওয়ায় এই বিদ্রোহ অধমর্ণদের উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে সুবিধাজনক না হলেও জনগণকে সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন করে তুলল। একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি এই পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—"দরিদ্রের উচ্চাশা এবং ধনীর লোভ …ছোটখাটো ধরনের রাজ্য সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ রাখা কখনও সম্ভব নয়।"

এই পরিস্থিতিতে 'গঠনতান্ত্রিক সম্মেলন' বা "কনষ্টিট্যূশন্যাল কনভেনসন" যখন চূড়ান্ত ভাবে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠিত হল, তখন মনে হয়েছিল যে পরস্পর বিবদমান স্বার্থের সংঘাতে এই সম্মেলনে হয়ত বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। প্রতিনিধিবর্গ বাণিজ্যিক এবং কৃষিজীবি উভয়বিধ ধনতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হলেন। বাস্তবিকপক্ষে একটা উন্নয়নশীল নতুন জাতি যখন একই সঙ্গে বহু দিকে উন্নতির জন্য উদ্যত হয় তখন যে সব সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেই জাতীয় আরো অনেক সংঘর্ষের অগ্রপথিক। তাই কনভেনশনের আপোষমূলক বোঝাপড়াগুলো জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের অনৈক্যের অভিব্যক্তি না হয়ে, জাতির পক্ষে প্রবলতর শক্তির উৎস হয়ে উঠল। জাতীয় অর্থনীতিতে একটা ভারসাম্য রক্ষার ধারা এইভাবে প্রবর্তিত হল।

আইন	তারিখ	মুখ্য ধারা
সুগার এ্যাক্ট	১৭৬৪	মোলাসেস এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত কর অর্দ্ধেক করা হয়, কিন্তু প্রয়োগ কঠোরতর হয়
ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট	১৭৬৫	আবগারী কর কয়েকটি বিশেষ দলিল এবং বিলাস উপকরণের প্রতি প্রযুক্ত
কোয়ার্টারিং এ্যাক্ট	১৭৬৫	আমেরিকায় ব্রিটিশ সেনাদের সরাইখানা, চাখানা বা খালি বাড়িতে থাকতে দিতে হবে
ডিক্লেয়ারেটারি এ্যাক্ট	১৭৬৬	ঘোষণা করে রাজা এবং পার্লামেণ্ট উপনিবেশের সর্বময় কর্তা
টি এ্যাক্ট	১৭৭২	ব্রিটিশ রপ্তানিকারদের উপর আমেরিকায় রপ্তানিকৃত চায়ের উপর ধার্য কর কম করা হয়
বোষ্টন পোর্ট বিল	১৭৭৪	যতক্ষণ না "বষ্টন টী পার্টি" দ্বারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত চা-এর সম্পূর্ণ দাম দেওয়া হয়, ততকাল বষ্টন বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়
মাসঃ গভঃ এ্যাক্ট	১৭৭৪	মাসাচুসেটস গভর্ণমেণ্টের ওপর রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরতর করা হয়

বিধির ফলেই বিপ্লব শুরু হয়।

নতুন জাতি

ওয়াশিংটনের মন্ত্রীসভা

সেক্রেটারী অব্
ষ্টেট (স্বরাষ্ট্র সচিব)
টমাস জেফারসন
ভার্জিনিয়া

০

সেক্রেটারী অব্
ট্রেজারী
(অর্থ-সচিব)
আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন
নিউ ইয়র্ক

০

সেক্রেটারী অব্
ওয়াব (সমর সচিব)
হেনরী নক্স
মাসাচুসেটস

০

এটর্ণী জেনারেল
(আইন সচিব)
এডমণ্ড র‍্যানডলফ
ভার্জিনিয়া





যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র যদিও ১৭৫ বছর আগে রচিত হয়েছে, তথাপি আজো তা সজীব, সক্রিয় দলিল। বছরের পর বছর সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে নিরন্তর তাব নতুন ব্যাখ্যা দান করা হযেছে এক সজীব সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজনে।

গঠনতন্ত্র গৃহীত হওযার দু'বছরের মধ্যে প্রতিটি নাগরিকের স্বাধিকার সংরক্ষণে দশটি নতুন সংশোধনী ধারা যুক্ত হয়। এই সব সংশোধনী ধারা তখন থেকে 'বিল অব রাইটস' বা মৌলিক অধিকারের সনদ নামে পরিচিত।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র আর তেরটি সংশোধনী ধারা সংগঠনতন্ত্রে সংযুক্ত হয়েছে। এই সংবিধান জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের সুগভীর দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। কারণ তাঁরা এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যতঃ, গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে কিছু পরিমাণে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা পরিহার করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দিতে হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য কতখানি সার্বভৌমত্ব নিজের হাতে রাখবে এই নিয়ে রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনের প্রথম বারের মন্ত্রীসভার ভিতরের এবং কাছাকাছি লোকদের মধ্যে এক আদর্শগত বিরোধের সূত্রপাত হয়।

রাজস্ব সচিব আলেকজান্দার হ্যামিলটনের নেতৃত্বে একটি দল সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের স্বপক্ষে ছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে এই মতের বিরোধী দল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি সম্পর্কে আতঙ্কিত ছিলেন, তাঁদের মতে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর জোর দেওয়া উচিত। এই মৌলিক গঠনতান্ত্রিক বিতর্ক এক বা ভিন্ন রূপে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

ওয়াশিংটনের প্রথম দফার শাসনকালের শেষ পর্বে (১৭৮৯-৯৩) এই বিরোধ থেকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্ট হল। হ্যামিলটন-গোষ্ঠীরা 'ফেডারেলিষ্টস' নামে পরিচিত হলেন, আর জেফারসন-গোষ্ঠীরা 'রিপাবলিকান' নামে পরিচিত হলেন। হ্যামিলটনের সাংবিধানিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা ছাড়াও, জেফারসন সেক্রেটারি অব ট্রেজারি হিসাবে হ্যামিলটনের আর্থনীতিক নীতিরও বিরোধিতা সুরু করলেন।

হ্যামিলটনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কিছু রাষ্ট্রীয় ঋণভার গ্রহণ করলেন, একটি ইউনাইটেড ষ্টেটস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করলেন এবং আবগারি কর প্রবর্তন করলেন। জেফারসন অনুভব করলেন যে, এই সব আইনাবলী ফেডারেল সরকারকে অন্যায্য শক্তিতে সমৃদ্ধ করছে এবং সেই সঙ্গে অঙ্গরাজ্যসমূহের ক্ষমতা খর্ব করেছে। তার আরও মনে হল যে, পল্লী-অঞ্চলের চাইতে শহরাঞ্চলের প্রতি অধিক পক্ষপাত প্রদর্শন করা হচ্ছে, আর বণিক সম্প্রদায় এবং মহাজনদের (ব্যাঙ্কার) অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে।

প্রাথমিক মার্কিন সমাজের অভিজাত গোষ্ঠীকে তোষণ করার জন্য যদিও হ্যামিলটনকে প্রায় সমালোচনা করা হয়, তবু তাঁর আর্থনীতিক নীতির লক্ষ্য ছিল একটা সুনিয়ন্ত্রিত এবং উন্নতিশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমৃদ্ধি নির্ভর করে "ব্যক্তি-স্বার্থ এবং সরকারের মধ্যে স্বার্থের যোগসূত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর।" দেশের আমানত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য তিনি বিশেষভাবে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং আন্তর্জাতিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন।

আমানত সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল ঋণ শোধের সমস্যা—আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক—দু' তরফের কাছ থেকে বৈপ্লবিক এবং যুদ্ধোত্তর-কালীন সরকার এই ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এই সব সরকারী দেনার (তৎসঙ্গে রাজ্যসমূহের যুদ্ধকালীন ঋণ যার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিল) মোট পরিমাণ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারের মত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পক্ষে এই ঋণের পরিমাণ প্রভূত বিবেচনা করা চলে।

হ্যামিলটনের পরামর্শেই অঙ্গরাজ্যসমূহের যুদ্ধকালীন ঋণের দায়িত্বভার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিলেন, জেফারসন এবং আরো অনেকের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও একাজ করা হয়; জেফারসন প্রভৃতি অবশ্য ন্যায়-সঙ্গতভাবেই মনে করেছিলেন যে এতদ্বারা অঙ্গরাজ্যের মূল পাওনাদারদের (ক্রেডিটার) চাইতে বেশী লাভবান হবে ফাটকাবাজ শ্রেণীর মানুষ। হ্যামিলটন কিন্তু জোরের সঙ্গে বললেন যে, এই সব ঋণের চূড়ান্ত পরিশোধ করা দরকার, নবগঠিত রাষ্ট্রের আমানত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

তিনি যুক্তি দিলেন যে, জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা কিছুতেই সম্ভব হবে না যদি না সরকারী ঋণের হস্তান্তরকরণের নিরাপত্তা বা সিকিউরিটি অব ট্রান্সফার ব্যবস্থা করা হয়; তিনি আরো অনুভব করলেন যে, ঋণের পাওনা মিটিয়ে দিলে পরিণামে কে উপকৃত হবে সেই প্রশ্ন অবান্তর।

জাতির নতুন রাজধানী (ওয়াশিংটন ডি. সি.) দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হোক—জেফারসনের এই বাসনা মেনে নিয়ে হ্যামিলটন এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁদের স্বপক্ষে প্রচুর দক্ষিণাঞ্চলীয় ভোট সংগ্রহ করেন এবং এই সব ভোটের জোরে হ্যামিলটন তাঁর পরিকল্পিত ব্যবস্থা কংগ্রেসে পাশ করিয়ে নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আমানত (মুদ্রা) ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, নিঃসন্দেহে রাজস্ব সচিব হিসাবে হ্যামিলটনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব; জাতির ভবিষ্যৎ আর্থনীতিক উন্নয়ন এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গোপন অর্থ ক্রমশঃ বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করল আর জনগণের নতুন প্রজাতন্ত্রের উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় হল।

যে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দলগত আনুগত্যকে একটা আকার দান করল এবং ইতিমধ্যেই যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছিল তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল তা' হল একটি ইউনাইটেড ষ্টেটস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য হ্যামিলটনের প্রস্তাব।

এই ব্যাঙ্কের দ্বারা বিবিধ প্রকার কর্মসিদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। (১) এই ব্যাঙ্ক নগদ টাকা হিসাবে প্রচলনের জন্য নোট বাজারে চালু করবেন। তার ফলে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযুক্ত মূল্যমানের মুদ্রা চালু থাকবে। (২) বণ্ড বিক্রী প্রভৃতি ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের আর্থনীতিক এজেণ্ট হিসাবে কাজ করবেন। (৩) জনসাধারণের অর্থের নিরাপদ জমার ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে এবং মাঝে মাঝে সরকারকে অর্থঋণ দান করবে। (৪) বাণিজ্যিক লেনদেনেব উপযোগী কাজ চালু রাখার জন্য ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা দান করবে এবং ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য-প্রচেষ্টায় ঋণ দান করে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুবিধা করে দেবে।

জেফারসন আপত্তি করলেন যে, এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক একচেটিয়া অধিকার লাভ করবে এবং অঙ্গরাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে অসঙ্গত প্রতিযোগিতা করবে। তিনি এই প্রস্তাবকে সংবিধান-বিরোধী আখ্যা দিলেন, কারণ সংবিধানে বিশেষ করে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কোনো ধারা নেই। এর ফলে, সর্বপ্রথম সংবিধানের কঠোর বনাম উদারনৈতিক ব্যাখ্যার প্রশ্ন এবং "নিহিত ক্ষমতার" (implied powers) নীতির কথা বড় হয়ে দেখা দিল।

হ্যামিলটন-পন্থীরা যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, সংবিধানকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যেহেতু গঠনতন্ত্র প্রণেতাগণ দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছিল যে সাংবিধানিক দলিলে উল্লিখিত বিষয়াবলীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যামিলটন যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, এই ধরনের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা সংবিধানের ১ সংখ্যক ধারায় নিহিত আছে…,

এই ধারায় বলা হয়েছে যে, "যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে সংবিধান অনুসারে যে সব অধিকার দেওয়া আছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত আইন প্রণয়নের অধিকার কংগ্রেসের থাকবে।" হ্যামিলটন যুক্তি দেখালেন যে, এই 'প্রয়োজন অনুসারে' কথাটির অর্থ 'উপযুক্ত' একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক, মুদ্রা-প্রচলন ও জাতীয় আমানত ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে সংবিধান নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে উপযোগী হবে।

জেফারসন কিন্তু সংবিধানের কঠোরতম ব্যাখ্যার স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি অনুভব করলেন যে, সরকার শুধু সেই অধিকারই প্রয়োগ করতে পারে যা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে উল্লিখিত আছে।

হ্যামিলটনের সুপারিশই টিঁকে গেল। প্রচণ্ডতম বাধা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ব্যাঙ্ক কংগ্রেসের কাছ থেকে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছরের সনদ লাভ করল। ব্যবস্থা হল, এই ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ১০ মিলিয়ন ডলারের এক-পঞ্চমাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেবেন আর বাকী অংশ আসবে সাধারণ লগ্নীকারকদের কাছ থেকে। এই সব সাধারণ লগ্নীকারকরাই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করবেন সরকারের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণাধীন থেকে। রাজস্ব সচিবের উপর ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হল।

নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বর্ধিত দায়িত্বের ফলে বাড়তি রাজস্বের প্রয়োজন হল। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাই কংগ্রেস স্বদেশে চোলাই-করা স্পিরিটের ওপর মোটা কর নির্ধারণ করলেন। এইভাবে কর নির্ধারণ করায় সীমান্ত অঞ্চলে ভীষণ অসন্তোষ সঞ্চারিত হল, কারণ এখানকার অনেক অধিবাসী নিজেদের প্রয়োজনীয় মদ্যাদি নিজেরাই চোলাই করত, ফলে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে "হুইস্কী বিদ্রোহ" সুরু হল ওয়েষ্ট পেনসিলভেনিয়ায়। হ্যামিলটনের পরামর্শক্রমে ওয়াশিংটন সামরিকবাহিনী পাঠিয়ে সেই বিদ্রোহ দমন করে শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। এই ঘটনার ফলে রাজস্ব যে খুব বেড়ে গেল তা নয়। কিন্তু এতদ্বারা প্রমাণিত হল যে নতুন সরকার তাঁদের প্রবর্তিত আইন বলবৎ করতে সক্ষম এবং দৃঢ়সংকল্প।

আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতন্ত্রের সামর্থ্য পরীক্ষিত হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য তখনও প্রধানতঃ ইউরোপের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু 'প্যারিস চুক্তি' অনুসারে একটা নিয়মিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনে

ইংলণ্ড অসম্মত হল। এ ছাড়া, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সব দুর্গ ছিল সেগুলি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে ইংলণ্ড আরেক দফা চুক্তি অগ্রাহ্য করল। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং স্প্যানীশ ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী সীমান্ত নদী মিসিসিপির ওপর নৌচালনা নিয়ে ও স্পেনীয় অঞ্চল থেকে ইণ্ডিয়ানদের অতর্কিত আক্রমণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে স্পেনের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতে হল। যুক্তরাষ্ট্রকে স্পেনীয়, ইংরাজ ও ফরাসীদের উত্তর আমেরিকায় ভূমিলিপ্সা নিয়ে নিরন্তর উৎপীড়িত হতে হয়েছিল।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে ওয়াশিংটনের সামনে সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভব হল ফরাসী বিপ্লবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ভাবে কি ভূমিকা গ্রহণ করবে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রপতি পদে বৃত হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরে ফরাসী বিপ্লবীদের হাতে বাস্তিলের পতন ঘটল। বুরবন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সহানুভূতি অর্জন করেছিল। আমেরিকানরা ফরাসীদের অন্তরে যে তাদের বৈপ্লবিক কর্মধারার প্রেরণা সঞ্চার করেছে তার জন্য গর্ব অনুভব করল।

কিন্তু যেই ফরাসী বিপ্লব "সন্ত্রাসের রাজত্বে" পর্যবসিত হল এবং কয়েকটি ইউরোপীয় রাজতান্ত্রিক সরকার ফরাসী বিপ্লব ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ফরাসীদের সমর্থনে অংশ গ্রহণ করা কঠিনতর হয়ে উঠল। ইংলণ্ড যখন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে নামল তখন যুক্তরাষ্ট্র একটা সংকটের মুখে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সের কাছে আমেরিকার কিছু নৈতিক দায়িত্ব ছিল, কারণ

সকল সম্প্রদায়ই দু'টি অংশে বিভক্ত. এক দিকে সামান্যসংখ্যক মাত্র, অপর পক্ষে অনেক··· এই প্রথম পক্ষ হলেন ধনী এবং সদ্বংশজাত, আর অপর পক্ষ জনসাধারণ···জনসাধারণ উদ্দাম এবং পরিবর্তনশীল; তারা কদাচিৎ যা ন্যায্য তা স্থির করতে পারে। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থাতে এই প্রথম পক্ষকেই একটা সুস্পষ্ট এবং স্থায়ী অংশ দিতে হবে।

—আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন

সকল চোখ আজ উন্মীলিত, কিংবা উন্মীলিত হচ্ছে মানবের অধিকার বিষয়ে। বিজ্ঞানের আলোক বিকীরিত হয়ে সকলের সম্মুখে যা নগ্ন সত্য তা স্পষ্ট করে তুলেছে. এই মানব-সংসারের জনগণ তাদের জিন পিঠে নিয়ে জন্মায়নি, আর ভাগ্যবান কয়েকজন বুটজুতা এবং কণ্টক পায়ে নিয়ে ঈশ্বরের করুণায় তাদের পিঠে সওয়ার হওবার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি।

—টমাস জেফারসন

বিপ্লবের কালে ফরাসীরা আমেরিকাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু ফরাসীদের সাহায্য করার কোনো রকম প্রকাশ্য প্রচেষ্টার অর্থ ইংরাজের কাছ থেকে পাল্টা আক্রমণ আমন্ত্রণ করা।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই অচল অবস্থা এক তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কের তুফান উঠিয়ে দিল। জেফারসনীয় গোষ্ঠী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রতি প্রবল সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন আর অন্যদিকে হ্যামিলটন-গোষ্ঠী প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশ সমর্থক ছিলেন।

পরিশেষে সমগ্র জাতির ফরাসী সহানুভূতি এবং পররাষ্ট্র সচিব জেফারসনের প্রবল বাধা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিতর্কমূলক নিরপেক্ষতার ঘোষণা জারী করলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান বিপ্লবের সূচনায় ফ্রান্সের কাছ থেকে সাহায্যের আশায় যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে যে 'মৈত্রী চুক্তি' সম্পাদন করে, এই ঘোষণা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই চুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়।

যে মুহূর্তে নিরপেক্ষতার নীতি বিঘোষিত হল, সেই মুহূর্ত থেকে এই নীতিকে মান্য করে চলা বৃটেন এবং ফ্রান্সের সামরিক কার্যকলাপের জন্য বিঘ্নিত হয়ে উঠল। আমেরিকান জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জারী করে বৃটেন বহু আমেরিকান জাহাজ বাজেয়াপ্ত করল এবং জোর করে আমেরিকান নাবিকদের বৃটিশ জাহাজে কাজে নিযুক্ত করল। এই ঘটনায়, স্বাভাবিক কারণেই আমেরিকার জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল এবং জাতীয় বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল।

যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশবিরোধী মনোভাব প্রবল আকার ধারণ করল। ইংলণ্ডের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিল। বিশেষ করে, ওয়াশিংটন কর্তৃক বৃটেনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত জন জে যখন বৃটেনের দাবী চাপানোর ব্যাপারটা মেনে নিলেন তখন অবস্থাটা চরমে পৌছলো। ওয়াশিংটন কিন্তু বৃটিশ-প্রদত্ত চুক্তির এই কড়া ধারাগুলি হজম করলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই কালে বৃটিশের সঙ্গে আর একটা যুদ্ধ সুরু করলে তাঁর স্বদেশের পক্ষে তা' সর্বনাশকর হয়ে উঠবে। তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার ফলে কংগ্রেস এই চুক্তি মেনে নিলেন, সংকট থেকে ত্রাণ লাভ ঘটল।

ওয়াশিংটনের নীতি ছিল 'বিজড়িত মৈত্রী' পরিহার করে চলা। বিখ্যাত ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের বিদায়ী ভাষণে একথা পুনরুল্লিখিত হয় এবং এই নীতিই

উনবিংশ শতকে জাতির বৈদেশিক নীতির ভিত্তি স্থাপন করে। এই নীতি নির্ধারণে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নিজের সম্পর্কে এবং ফেডারেলিষ্ট পার্টির পক্ষে বিরোধী রিপাবলিকান দলের তরফ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। যাই হোক, ফেডারেলিষ্টরা ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করল এবং তার ফলে জন এডামস সভাপতি পদে আসীন হলেন।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে এডামসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হল যুক্তরাষ্ট্রকে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত রাখা, 'জে চুক্তি'র ফলে ফরাসীরা অত্যন্ত সমরমুখী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এডামসের নেতৃত্বে ফেডারেলিষ্ট কংগ্রেস অনেক রকমের বিধিনিষেধ সৃষ্টি করে রিপাবলিকানদের বিরোধিতা রদ করেন, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতাও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এর ফলে বহু নাগরিক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বারো বছর ফেডারেলিষ্ট শাসনের পর মার্কিন জনসাধারণ তাদের প্রতি বিশ্বাস হারায়, তারা এই দলের নামকরণ করেছিল "সম্পত্তিশালীদের দল"। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এরা টমাস জেফারসনকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেন এবং রিপাবলিকানদের হাতে শাসনক্ষমতা আসে। (এই কালের রিপাবলিকান পার্টি ধীরে ধীরে আধুনিক কালের ডেমোক্রেটিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে, বর্তমান কালে রিপাবলিকান পার্টি নামে পরিচিত গোষ্ঠীর সঙ্গে এই দলটি এক মনে করা বিভ্রান্তিকর হবে)।

নতুন জাতি গঠনে ফেডারেলিষ্টদের অবদান অতি মহৎ। সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার এবং দুর্ধর্ষ জাতীয় অর্থনীতি গঠনের কৃতিত্ব তাঁদেরই। যদিও জেফারসনের নির্বাচনের পর ফেডারেলিষ্ট পার্টি স্তিমিত হয়ে আসে, এর প্রভাব অবশ্য তৎক্ষণাৎ স্তিমিত হয়নি। পরে দেখা যাবে যে, নতুন রিপাবলিকান সরকার ওয়াশিংটন এবং এডামসের ফেডারেলিষ্ট সরকার গঠিত আর্থনীতিক কাঠামোর ভিত্তিতেই কাজ করতে লাগলেন।

জেফারসন-যুগ

"খাঁটি মার্কিন মনে এই নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠবে না যে আমাদের কিছু নাগরিকদের এবং ধন-সম্পদকে কিঞ্চিৎ বন্ধনদশায় পাঠানো উচিত, না তা স্বদেশে আবদ্ধ রাখাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা, এবং সেই নীতির প্রতিই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দান করা উচিত যা উৎপাদক এবং কৃষিজীবিকে পাশাপাশি বসাবে এবং সকলের দ্বারপ্রান্তে সেই পারস্পরিক শ্রম বিনিময়ের সুবিধা এবং স্বস্তি নিয়ে আসবে যা এতকাল আমরা নিরন্তর সংকটের ঝুঁকি নিয়ে সুদূর প্রান্তে সন্ধান করে এসেছি......"

—১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের এমবারগো এ্যাক্ট প্রসঙ্গে জেফারসন

যে নির্বাচন জেফারসনীয় রিপাবলিকানদের ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতায় আসীন করে তা' জাতি হিসাবে আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে প্রথম "রাজনৈতিক বিপ্লব" হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। এই নির্বাচনের গূঢ় তাৎপর্য ছিল এই যে রাজনৈতিক ক্ষমতা উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে দক্ষিণে, ব্যবসায়ী-ধনতন্ত্রের থেকে কৃষি-ধনতন্ত্রের কাছে হস্তান্তরিত হয়। জেফারসন এবং তার দলবল ছিলেন ক্ষুদে এবং স্বাধীন চাষী সম্প্রদায়, ছোট ব্যবসায়ী এবং আমূলসংস্কারবাদী বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর প্রতিনিধি। এরাই ফেডারেলিষ্ট পার্টির কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। আর এই ফেডারেলিষ্ট পার্টি একটা স্থায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ব্যাপ্তি বা গভীরতাহীন, কেবলমাত্র বিত্তশালী এবং বুদ্ধিজীবিদের একটা মুখ্যতন্ত্র বলে পরিগণিত হয়েছিল।

শুধু আমেরিকার ধনী এবং সম্পত্তি-অধিকারীরা নয়, ইউরোপের এই শ্রেণীর মানুষরাও জেফারসনের বিজয়ের মধ্যে নতুন জাতির অচিরাৎ ধ্বংস ঘটার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। নতুন সরকারের যাঁরা মিত্র তাঁরা কিন্তু ভবিষ্যৎ উক্তি করলেন যে, এর অর্থ 'অত্যাচারী' শাসক সম্প্রদায়ের এবং আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন গৃহীত রক্ষণশীল আর্থনীতিক নীতির অবসান সূচিত হল। পরে যা দেখা গেল, তদ্বারা বলা যায় শুভানুধ্যায়ী এবং শত্রু—উভয় শ্রেণীই প্রচণ্ড ভুল করেছিলেন।

একথা বিশ্বাস করার উপযুক্ত হেতু আছে যে, জেফারসনের রিপাবলিকান দল শাসনভার গ্রহণ করায় ঘরে এবং বাইরে গুরুতর সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়া গেছে। হ্যামিলটন এবং নিউ-ইংলণ্ডীয় ফেডারেলপন্থীরা ফ্রান্সের সঙ্গে স্থুরু করার জন্য যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন—অংশতঃ মার্কিন বা

ক্ষতি করার জন্য, ফ্রান্সের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং অংশতঃ ফরাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রিপাবলিকান পার্টির অমর্যাদা করার জন্য। প্রেসিডেণ্ট এডামস্ একদিকে যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর শাসনকালে ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমনই এক সংকটময় অবস্থায় পৌঁছেছিল যে বিরাট ভাবে ব্যয়বহুল সমর-প্রস্তুতি বিবেচিত হয়েছিল। আর যে উপায়ে এই সব প্রকল্পের খরচ চালানোর ব্যবস্থা হয়েছিল তাকে অন্ততঃ জনপ্রিয় বলা যায় না।

দাস এবং জমিজমা বা রিয়েল এষ্টেট প্রভৃতির ওপর ধার্য প্রত্যক্ষ কর এমন ভাবে দক্ষিণের রিপাবলিকানদের উত্তেজিত করেছিল যে ফেডারেলিষ্ট শাসনকালে দ্বিতীয় বারের মত সৈনিক ডেকে বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা রোধ করার জন্য ফেডারেলিষ্ট কংগ্রেসকে বিখ্যাত এল্যায়েন অ্যাণ্ড সিডিসন (বিদেশী এবং বিদ্রোহ) আইন (১৭৯৮) পাশ করাতে হয়। বিদেশীদের বহিষ্ক্রমণের এবং সরকার-বিরোধী মত প্রচারক নাগরিককে কারারুদ্ধ বা জরিমানা করার ক্ষমতা এই আইনানুসারে প্রেসিডেণ্টের ওপর ন্যস্ত হয়। এর দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেকগুলি দক্ষিণী অঙ্গরাজ্য প্রায় বিদ্রোহের মুখোমুখি গিয়ে পৌঁছেছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া এবং কেনটাকি-প্রস্তাব বিখ্যাত নাকচকরণ নীতি গ্রহণ করে—এই সিদ্ধান্তবলে যে কোন অঙ্গরাজ্য ফেডারেল আইনকে বাতিল এবং অকার্যকর ঘোষণা করতে পারে।

একদিক থেকে, জেফারসন তাঁর নিজস্ব ধারণা—"সেই ভালো শাসক যে অল্পই শাসন করে" আঁকড়ে ছিলেন। ঘৃণ্য 'এলায়েন অ্যাণ্ড সিডিশন' আইন যা ফেডারেলিষ্টরা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন তার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর আর বাড়ানো হল না, এবং যে সব আভ্যন্তরীণ রাজস্ব কর চালু ছিল তা সবই রদ করা হল। (সংরক্ষণী করসমূহের অনেকগুলিকেই অবশ্য চালু রাখা হল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল)। গড়পড়তা বাৎসরিক ৬০ লক্ষ ডলার থেকে হ্রাস করে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ মাত্র ৩০ লক্ষ ডলারে নামিয়ে আনা হল।

জেফারসন তাঁর আট বছরের কার্যকালের মধ্যে এক রকম আর্থনীতিক ইন্দ্রজাল সম্পন্ন করলেন। তিনি জাতীয় ঋণের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে আনলেন। এই সব করা হয়েছিল লুইসিআনা অঞ্চল ১ কোটি ৫০ লক্ষ

ডলার মূল্যে কিনে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও। জাতির বাৎসরিক রাজস্ব আয় ১ কোটি ডলারের প্রায় অর্ধেকটাই জাতীয় ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হল। সেকালে বাৎসরিক ৬০ লক্ষ ডলার পরিমাণ অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ব্যয়-ভার নির্বাহ করা সম্ভব ছিল। বর্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিচালন কার্যে বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৮০শ' কোটি ডলার।

বাজেটের অঙ্ক অবশ্য বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। জেফারসন যদিও ঋণ-ভার হ্রাস করতে পেরেছিলেন এবং সরকারি ব্যয় হ্রাস করেছিলেন, জাতীয় আর্থনীতিক জীবনে ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের ভূমিকা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রিপাবলিকানরা কিন্তু তাদের নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতকাল যে সব নীতির বিরুদ্ধে গুরুতর বাধা দিয়ে এসেছে এখন তা' সমর্থন করতে বাধ্য হলেন।

জেফারসন ছিলেন সীমিত সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের অধিকার বিষয়ের একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কার্যকাল যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কয়েকটি নূতন অঞ্চল সংযোজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার বৃদ্ধির জন্য চিহ্নিত।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের কাছ থেকে লুইসিআনা অঞ্চল ক্রয় করার ফলে ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই বিরাট অঞ্চল সংযুক্ত হওয়ায় জাতীয় ভূমির আয়তন শতকরা ১৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী কালে সমগ্র, কিংবা তেরটি অঙ্গরাজ্যের অংশবিশেষ এই ভূমি থেকেই গড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চল যখন ফেডারেল সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত হল, তখন তার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং আর্থনীতিক প্রগতির জন্য অঙ্গরাজ্য অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই অধিক পরিমাণে দায়ী হলেন। নিয়তির পরিহাস, 'লুইসিআনা ক্রয় চুক্তি' যখন রাষ্ট্রসভায় বিতর্কের মুখে পড়ে তখন ভূমি সংগ্রহে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের 'নিহিত' অধিকারের যুক্তি প্রদর্শন করেন রিপাবলিকানরা, আর ফেডারেলিষ্টরা সহসা অঙ্গরাজ্যের সমর্থক এবং গঠনতন্ত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যার দাবী জানান। আর এই রিপাবলিকানরা, বিশেষতঃ এই দলের পশ্চিমা উপশাখার উৎসাহেই জেফারসন নতুন পশ্চিমা সীমান্তের বিশাল ভূমি শাসনের জন্য নতুন সরকারি প্রকল্পে অগ্রসর হয়েছিলেন।

জেফারসনের শাসন-ব্যবস্থা জাতির আঞ্চলিক পরিধি যে শুধু বাড়িয়ে দিয়েছে তা নয়, তাঁর শাসন যোগাযোগ-ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধন করে

অঙ্গরাজ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করেছে। জেফারসন যখন ক্ষমতায় আসীন হলেন, তখন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক বা সামাজিক দিক থেকে প্রাক-বিপ্লবকালীন সম্পর্কের চেয়ে তেমন বেশী সংযোগ ঘটেনি। ডাকটিকিট ছিল ব্যয়বহুল, সবচেয়ে কম হার ছিল আট সেণ্ট। ঘাঁধাগাড়ি বা ষ্টেজকোচের গতি ছিল অতি মন্দ, (গড়ে এক ঘণ্টায় চার মাইল যেত), এবং বর্তমান কালের চেয়ে সেকালে যাতায়াতের খরচ অনেক বেশী ছিল। কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানী দ্বারা যে সব চুঙ্গি ঘাঁটি প্রস্তুত হয়েছিল তারা অতি চড়া হারে চুঙ্গি আদায় করত। অন্য দিক থেকে পথ-ঘাট বিশ্রী বেমেরামতি অবস্থায় ছিল, আর যথেষ্ট পরিমাণে সেতু বা ফেরী চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। ১৭৯০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কতকগুলো খাল কাটা হয়, কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজনের অনুপাতে তা' ছিল সংখ্যায় অতি অল্প।

পশ্চিমা সীমান্তের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য রাজপথ এবং আভ্যন্তরীণ জলপথের সুবিধার প্রয়োজন ছিল। ১৮০৬ সালে জেফারসন একটা 'জাতীয় রাজপথ' নির্মাণের জন্য জরিপ করার নির্দেশ দান করেন, এই পথ মেরীল্যাণ্ডের কাম্বারল্যাণ্ড থেকে ওহায়ো নদীর উপরিভাগে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হুইলিং পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বন্দরের সুবিধা দানের জন্য বন্দর নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, বাড়িঘর নির্মাণ এবং সেই সঙ্গে উপকূল জরিপের কাজও হাতে নেওয়া হল।

এই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে প্রতিটি জাহাজ থেকে টন প্রতি যে রাজস্ব আদায় করা হবে সেই রাজস্ব থেকে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসনের রাজস্ব সচিব সুইজারল্যাণ্ডে জন্মপ্রাপ্ত আলবার্ট গালাতিন, জাতীয় ব্যয়ে নির্মাণের জন্য সংযোগ-ব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কংগ্রেসে পেশ করলেন; এই নির্মাণকার্য দীর্ঘ দশ বৎসরে সম্পন্ন হবে এবং সেই বাবদ বাৎসরিক আনুমানিক ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় হবে।

এই সব খরচ অনুমোদন করতে গিয়ে জেফারসনকে আবার সেই ফেডারেলিষ্ট নীতি, 'নিহিত' অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, কারণ সংবিধানে কোথাও আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভাবে অধিকার দান করা ছিল না।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হলেও, জেফারসনের দু'টি বারের কার্যকালের মেয়াদে আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তাঁর দলের মধ্যেই বিরোধ ও মতভেদ সুরু হল এবং বহির্জগতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হল। এর ফলে, জেফারসনের অনেকগুলি গঠনমূলক প্রচেষ্টা বিচূর্ণিত হল।

জেফারসনের প্রথম কার্যকালের মেয়াদের অবসানে তার সমর্থকদের মধ্যে একজনের (ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রতিবাদের আশংকা নেই) পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল যে "মিঃ জেফারসনের মত এত সুন্দর শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত আর সম্ভব হয়নি।" তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের মেয়াদের শেষে তাঁর অন্ধ সমর্থকদের পক্ষেও এমন দাবী করা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় কার্যকালের মেয়াদে জেফারসনের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অনেকখানির জন্য তাঁর পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কাজকর্ম অনেক বেশী দায়ী। যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ-ভাবে নেপোলিয়ানের ইউরোপের বিজয় অভিযানে যুক্ত ছিল না, সমুদ্রপথে মার্কিন অধিকার ফরাসী এবং ব্রিটিশ—উভয় রাষ্ট্রই উপেক্ষা করেছেন। ব্রিটিশরা বলপূর্বক মার্কিন সওদাগরী জাহাজ আটক করে তার কর্মী এবং মালপত্র আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি জাহাজখানাই আটক করেছে। বাহ্যতঃ অবশ্য পলাতক ব্রিটিশ নৌকর্মীর সন্ধানে এইসব ঘটেছে। নেপোলিয়ন আবার অন্যদিক থেকে আদেশ দিলেন, যে সব মার্কিন জাহাজ ব্রিটিশের সঙ্গে বাণিজ্য করবে বা ব্রিটিশের তদন্তকার্য বরদাস্ত করবে, সেই সব জাহাজ ফরাসীরা আটক করবে।

জেফারসন এই অচল অবস্থার মীমাংসাকল্পে "শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ" বা "পিসফুল কোয়ার্সন" নীতি অবলম্বন করেন। জেফারসনের নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে এমবার্গো এ্যাক্ট অনুমোদন করলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে এই ব্যবস্থার আর কোনো নজীর নেই। এই আইনানুসারে সমগ্র মার্কিন সওদাগরি নৌবাহিনী বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বরং আর্থনীতিক প্রয়োজনে ফরাসী ও ইংরাজকে আমেরিকার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে একটা রফা করতে বাধ্য করা, ব্যয়-বহুল যুদ্ধের দ্বারা নয়।

কিন্তু জেফাবসন ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে মার্কিন বাণিজ্যকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই আটক-ব্যবস্থা ফ্রান্সে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেনি। অবশ্য ব্রিটেনের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের রপ্তানি পণ্য স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যানাডায় চালান দিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের এই 'আটক বৎসর' যতই এগিয়ে চলে ততই দেখা যায় যে নিউ ইংলণ্ডের জাহাজীরা এবং দক্ষিণাঞ্চলের চাষীরাই সবচেয়ে বেশী

দুর্ভোগ ভোগ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৩০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার থেকে মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলারে দাঁড়াল। বন্দরে জাহাজ সব অচল হয়ে পড়ে রইল। বন্দরের গুদামে মাল পড়ে পচতে লাগল। এদিকে আবার সেই সময় কৃষিপণ্যের দর ভীতিজনক ভাবে পড়তে থাকে। ময়দার দর প্রায় অর্ধেকে নেমে গেল; দক্ষিণের কোনো কোনো অংশে মাত্র আড়াই ডলারে ঘোড়া বিক্রি হতে লাগল; শূকর ত' প্রায় যেন বিলিয়ে দেওয়া হল। সময়কালে অবশ্য এই আটক-ব্যবস্থা নিউ ইংলণ্ডের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল, কারণ এই অবস্থার জন্য সেই অঞ্চলে উৎপাদনের একটা প্রচণ্ড উৎসাহ সৃষ্টি হল। কিন্তু ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কর্মের কল্যাণকর দিকটি তেমন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়নি, জাহাজীদের লোকসানটি যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

অবশ্যম্ভাবী গতিতে রাজনৈতিক অসন্তোষ জেফারসনের যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল তা' দুর্বল করে তুলল। নিউ ইংলণ্ডে আবার ফেডারেলিষ্ট পার্টি সঞ্জীবিত হল এবং তার সমর্থকরা ব্যবসায়ীদের 'আটক আইন' এড়িয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। পশ্চিম এবং দক্ষিণের খেত-খামারে যুদ্ধ সম্পর্কে গরম গরম কথা চলতে থাকে, এখানে প্রাক্তন নিষ্ঠাবান রিপাবলিকানরা জেফারসনের নিষ্ক্রিয় নীতির ফলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। অবশেষে, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন 'এমবারগো' আইননিরোধক আইন বিল সই করে এই প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন। এই কাজের দ্বারা তিনি তাঁর বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা স্বীকার করলেন। এই হতাশাকর পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর শাসনকালের অবসান হল।

জেফারসনের মর্যাদা কিন্তু যথেষ্ট দৃঢ় ছিল এবং তাঁরই প্রভাবে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যাঁকে পছন্দ করতেন সেই জেমস্ ম্যাডিসন তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হলেন। ম্যাডিসন প্রাণপণে আমেরিকান জাহাজী অধিকার সম্পর্কে ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমা রিপাবলিকানগণ, যাঁরা 'যুদ্ধবাজ' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন এবং প্রচণ্ড ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুললেন। 'ওয়ার-হকস্' বা 'যুদ্ধবাজরা' আমেরিকান নৌচলাচলের ওপর ব্রিটিশ অত্যাচারে ততখানি বিচলিত হননি, যতখানি বিচলিত হয়েছিলেন তাঁরা পশ্চিমা-সম্প্রসারণ ব্যাহত করার জন্য ব্রিটিশ প্রচেষ্টায়। তারা ক্যানাডায়

ব্রিটিশ অঞ্চলের প্রতিও লুব্ধ ছিল। এদের এই আন্দোলনের ফলে এক বিভক্ত কংগ্রেস ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, ম্যাডিসনের প্রচেষ্টার ফলে এর ঠিক দু' দিন আগে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকান জাহাজকে ক্লেশ দিতে বিরত থাকবেন—এই প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। অতলান্তিকের এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা থাকলে হয়ত এই যুদ্ধ একেবারে এড়ানো সম্ভব হত।

যদিও ক্যানাডা আক্রমণের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অসাফল্যে পরিণত হল, সামুদ্রিক প্রয়াস কিন্তু অনেক সাফল্যজনক প্রমাণিত হল। প্রকৃতপক্ষে, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের এই যুদ্ধ প্রধানতঃ অতলান্তিক উপকূলে এবং ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্রিটিশ ও মার্কিন জাহাজের সংঘর্ষে পরিণত হল। সামুদ্রিক যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় পক্ষেরই এই জয় হয়, আবার এই পরাজয়। এই ধরনের নিরর্থক সংঘর্ষে যুদ্ধের হেতুটাও ঝাপসা হয়ে ওঠে। এই নিরর্থকতার প্রতিফলন দেখা যায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিতে, যার মধ্যে সামুদ্রিক বিচরণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ এই কারণেই নাকি যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে যুদ্ধে নেমেছিল।

যুদ্ধের আরম্ভের মত, যুদ্ধের সমাপ্তিতেও দ্রুত সংবাদ-প্রেরণ ব্যবস্থার অভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, চূড়ান্ত স্থলযুদ্ধ সংঘটিত হল নিউ অরলিন্সে, কারণ সৈন্যদলের জানা ছিল না যে যুদ্ধ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এই সংঘর্ষই স্থলযুদ্ধে আমেরিকানদের একমাত্র চূড়ান্ত জয়লাভে পরিণত হল। এই বিজয়ের পর মার্কিন বাহিনীর কম্যাণ্ডার এনড্রু জ্যাকসন জাতীয় বীর সৈনিকের স্বীকৃতি পেলেন। এই সংঘর্ষে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার ফলেই তিনি অবশেষে প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ একটা প্রয়োজনহীন যুদ্ধ, কূটনৈতিক খাতে যখন শান্তি প্রায় অর্জিত হয়ে এসেছে তখন তার সুরু, আর সমাপ্তি ঘটেছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাওয়ার পর এক বীভৎস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যে যুদ্ধে অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধ মার্কিন আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে, এবং এর ফলে জাতীয়তা সম্পর্কে একটা নতুন বোধ জাগরিত হয়েছে। অনেক আমেরিকানের ধারণা হয়েছিল যে জাতি দ্বিতীয় বার স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে।

আমেরিকার ব্যবহারিক স্বাধীনতা তার বিশাল প্রান্তরে আর স্বল্প জনসংখ্যায়। উত্তম ভূমি, সর্বত্র অতি সুলভ মূল্যে কিংবা বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। আর প্রয়োজন হলে প্রতিটি মানুষের পক্ষে তার মনোমত যথেষ্ট সম্প্রসারণের ক্ষেত্র আছে। দরিদ্র মজুর, ইউরোপের প্রতিটি দেশ থেকে এই সুলভ মূল্যের ভূমির কথা শুনে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়… তারা আসে, পরিশ্রম করে, উন্নতি করে। এই হল আমেরিকার প্রকৃত স্বাধীনতা।—**জর্জ ফ্লাওয়ার ঃ** একজন ইংরাজ। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর ইনি ইলিনয়ে বসবাস শুরু করেন।

সু-মনোভাবের কাল

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আরো বেশীসংখ্যক আমেরিকান, জাতির এক অভূতপূর্ব ভবিতব্যতায় বিশ্বাস করতে শুরু করে। একমাত্র স্থানীয় পর্যায় ছাড়া সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মের অতি সামান্যই সম্পর্ক ছিল। যদিচ তাঁরা সুবিশাল সমুদ্র এবং সীমাহীন পশ্চিম—এই দুই সীমান্তের মধ্যে বসবাস করতেন, তবু অধিকাংশ মানুষই এই সময় তাদের জন্মভূমি থেকে একদিনের বেশী পথ অতিক্রম না করেই জীবন যাপন করতেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ। এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ দাস—জনসংখ্যার এই অনুপাত ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই অপরিবর্তিত ছিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দাস আমদানি বন্ধ হয়নি এবং স্বাধীন মানুষ ও দাসগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপাত হ্রাস পেতে আরম্ভ করেনি। উপনিবেশগুলির ১/২০ তমেরও কম অংশে জনসংখ্যা ৬,০০০ বা তার বেশী ছিল। অধিকাংশ জনসংখ্যা—প্রতি একশত আমেরিকানের মধ্যে ৯৪ জন—২,৫০০ বা তার চেয়ে কমসংখ্যক পল্লী-সম্প্রদায়ে কিংবা দূরপ্রসারিত কৃষি-খামারে বাস করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামীন আমেরিকায় খেলা এবং কাজ পরস্পর সম্পর্কিত ছিল। গড়পড়তা কর্মসপ্তাহ ছিল ৭২ ঘণ্টা, বা দৈনন্দিন বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা মাত্র। ছুটি-ছাটার কথা অজ্ঞাত ছিল—রবিবার ব্যতীত খুব কমসংখ্যক ছুটির দিন ছিল। ভ্রমণ-ব্যবস্থা ছিল মন্দগতি, ক্লান্তিকর এবং সাধারণতঃ ব্যয়বহুল।

আহার এবং বেশবাসে তখনও আঞ্চলিকতার ছাপ ছিল। তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অল্পকালের মধ্যেই সিল্ক এবং পশমী কাপড় পরা বন্ধ হল, সব সময়ে পশমী শীতবস্ত্র পরিধানও হ্রাস পেল। পরিচ্ছদ ক্রমে ক্রমে একটা রীতিমাফিক হয়ে উঠল। আহারাদির ব্যাপারে অবশ্য সাধারণ মানুষ এবং সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় যাঁরা জন্মগ্রহণ করতেন তাঁদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। যে সব ব্যাধি সাধারণতঃ হত তা হল টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, বাত, ডিসপেপসিয়া এবং আর একটি অসুখ যার সহজ নামকরণ হয়েছিল "জ্বর" রোগ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব কমসংখ্যক মানুষ আমেরিকায় ছিলেন যাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তুর অনটন ছিল, তবে ধনীর সংখ্যাও অবশ্য অনেক কম ছিল। ওয়াশিংটন, হ্যামিলটন, এডামস্ প্রভৃতি ছিলেন অল্পসংখ্যক ভূম্যধিকারী, পেশাদার মানুষ, রাজনীতিবিদ, সওদাগর-জাহাজের কারবারী এবং মহাজন সম্প্রদায়ভুক্ত অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত।

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের আমেরিকা শ্রেণীবৈষম্য নিরোধে ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রণী ছিল। নতুন জগতে, বিশেষতঃ সীমান্ত অঞ্চলে মানুষের বৃত্তিটাই তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল, তার বংশগত মর্যাদা নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে "উন্মুক্ত সমাজ" বা 'ওপেন সোসাইটি' বলেন সীমান্ত অঞ্চলে তার প্রারম্ভিক উৎপত্তির সূচনা। সম্প্রসারণশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পুরুষ ভোটাধিকার ব্যবস্থার সমীকরণমূলক প্রভাবে সমাজে কৃত্রিম শ্রেণীবিভেদ অতি দ্রুত মুছে গেল।

অধিকসংখ্যক মানুষই নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করতেন। কিংবা কোনো হস্তচালিত কাজ বা অন্য কোনো বিশেষ ধরনের বৃত্তি অনুসারে কাজ করতেন। অনুমান করা যায় যে একশতের মধ্যে আশি জন কর্মী প্রাথমিক বা মাধ্যমিক উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন (কৃষি, বনাঞ্চলের কাজ, মাছ ধরা, খনির কাজ বা উৎপাদন কর্ম); বাকী কুড়ি জন বাণিজ্য কিংবা অন্য পেশাদারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের ছিল। প্রচলিত উৎপাদন-সংস্থা ছিল খামার-বাড়ি যেখানে অল্প পরিমাণ উদ্বৃত্ত দড়ি, মোমবাতি, সাবান, মাটির বাসন এবং এমনই অনেক কিছু দ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির

জন্য তৈরী হত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অবশ্য পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত অনেক এই শ্রেণীর উৎপাদন কেন্দ্র ফাউনড্রী, মিল এবং ফ্যাক্টরী জাতীয় উৎপাদন কারখানায় পরিণত হল।

এই সব আদিম ধরনের শিল্প-সংস্থার কাজ অতিশয় মৃদু গতিতে চলত। মালিক কিংবা শ্রমিক কেউই উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন না। যে সব মৌলিক আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার চেয়ে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় সুলভে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, সে সব আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকায় বড় বড় ফ্যাক্টরী গড়ে ওঠেনি। যাই হোক, আমেরিকার "ফ্যাক্টরী সিস্টেম" বা কারখানা পদ্ধতির সূত্রপাত হল— অনেক কর্মী একই আচ্ছাদনের নীচে দাঁড়িয়ে যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে বৃহৎ পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজ সুরু করলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অদক্ষ মজুর দৈনিক ৭৫ সেণ্ট থেকে এক ডলার পঁচিশ সেণ্ট মজুরী পেত। অত্যন্ত দক্ষ কর্মীরা পেত প্রায় তার দ্বিগুণ। মহিলা কর্মীরা পুরুষ কর্মীদের অর্ধেক বা ⅓ অংশ মজুরী পেত। যদিচ বর্তমানে ডলারের যে ক্রয়শক্তি সেকালে অবশ্য তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তথাপি এই মজুরীর হার খুবই কম বিবেচিত হত।

মোটের ওপর, বৈদেশিক বাণিজ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রচুর পরিমাণে প্রসার লাভ করে। এই কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্য ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্কের উপর এবং ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। মার্কিন নিরপেক্ষ নীতির ফলে ইউরোপের নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় আমেরিকার ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কিন্তু ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন জাহাজী সওদাগরবৃন্দ অনিয়ন্ত্রিত ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার মুখে গিয়ে পড়ত। ১৭৯৫ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধাদির জন্য মার্কিন ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকরা ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের চমৎকার সুযোগ লাভ করেন—আগে এই বাণিজ্য মূলতঃ ইংরাজ বা ফরাসীদের জাহাজ মারফৎ চলত।

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাহাজ চলাচলের কাজ যত সম্প্রসারিত হল, সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শিল্প-সংস্থাদিও প্রসারিত হল। নিউ ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী-বৃন্দ এবং মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছে সঞ্চিত মূলধন বস্ত্রবয়ন শিল্পে নিয়োজিত

হতে লাগল। ১৮০৮-এর 'এমবার্গো এ্যাক্ট' বাবদ যখন ইংরাজের তুলার আমদানী প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হল, তখন নতুন বয়ন-কলগুলি তাদের উৎপন্ন বস্ত্রাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার এক মহা সুযোগ পেয়ে গেল। বাষ্পচালিত তাঁত, বাষ্পচালিত বয়ন এবং কটন জিনের উদ্ভাবন প্রভৃতি হওয়ার ফলে দক্ষিণের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং উত্তরের নবগঠিত উৎপাদনমূলক অর্থনীতি একেবারে মুকুলিত হয়ে উঠল।

রাজনৈতিক দিক থেকে জাতি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর যে ভাবে একতাবদ্ধ হয়েছিল তেমনটি আগে আর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এই কালটির নামকরণ হয়েছিল "দি এরা অব গুড ফিলিংস্" বা সু-মনোভাবের কাল। সুগভীর জাতিপ্রীতি এবং স্বাদেশিকতার মনোভঙ্গী চতুর্দিকে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ কালের একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী বলেছিলেন: "যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়তার গর্ব অন্য যে কোনো দেশের মনোভঙ্গীকে অতিক্রম করে যায়। চতুর্দিকে তা পরিস্ফুট, এবং সকল ক্ষেত্রে—তাদের আলাপ-আলোচনায়, সংবাদ-পত্রে, পুস্তিকায়, বক্তৃতায় এবং গ্রন্থাদিতে তা' পরিব্যাপ্ত।" জাতীয় পরিতৃপ্তির ভাব কিন্তু স্থানীয় এবং অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করেনি, সেখানে হাতের কাছের প্রশ্নাবলী তুমুল বিতর্কের তুফান সৃষ্টি করেছে।

এই কালের আমেরিকান জাতীয়তাবাদের এক বিশিষ্ট প্রতিকৃতি অধুনা বিখ্যাত 'মনরো ডক্ট্রিনে' বা নীতিতে পাওয়া যাবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট জেমস্ মনরো। এই বিবৃতি, একদা অতিখ্যাত দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ সাম্রাজ্য ক্রমাগতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল বলেই রাষ্ট্রপতিকে দিতে হয়েছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধের একটা ক্ষুদ্র অংশ, ক্যানাডা বাদে, প্রাচীন পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আমেরিকান সরকার ইতিমধ্যে অনেকগুলি নতুন লাতিন-আমেরিকান রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, স্পেনীয় প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে কোন বন্ধুর কাছে একটি পত্রে টমাস জেফারসন লিখেছিলেন: "...আমেরিকা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গোলার্ধ। এই গোলার্ধের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং ইউরোপের স্বার্থের খাতিরে কখনও এই স্বার্থকে খাটো করা যাবে না।" অধিকসংখ্যক আমেরিকান উৎসাহভরে এই ভাবধারাটি সমর্থন করে। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় স্পেনীয় এবং

ফরাসী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা ছিল। অধিকন্তু, দূর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রুশীয় প্রতিযোগিতার সংকট ছিল, সেই অঞ্চলে রুশীয় পশম ব্যবসায়ীবৃন্দ আলাস্কা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ঘেঁসে অরিগন পর্যন্ত চাপ দিচ্ছিলেন। নতুন জগতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপকে বন্ধ করার কাল সমাগত —এই সিদ্ধান্তকে 'মনরো ডক্ট্রিনে' একটি আকার দান করা হল।

প্রেসিডেন্ট মনরোর এই ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হল যে, পশ্চিম গোলার্ধকে সেই অঞ্চল বলে গ্রহণ করা চলবে না যেখানে "কোনো ইউরোপীয় শক্তি এসে ভবিষ্যতে উপনিবেশ গড়ে তুলবে।" এই ঘোষণায় আরো বলা হল যে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের তরফ থেকে "তাদের শাসনপদ্ধতি এই গোলার্ধের কোনো অংশে যদি চালু করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা' যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকারক বিবেচিত হবে··· এই জাতীয় কর্মকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অমিত্রজনোচিত মনোভঙ্গী প্রকাশের অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে।"

পশ্চিম গোলার্ধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির এই মৌলিক ঘোষণাকে পরবর্তী সময়ে নানা ভাষ্য দেওয়া হয় এবং তার নানাপ্রকার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এই ঘোষণায় সমগ্র বিশ্বের কাছে আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক নীতিসমূহ বিঘোষিত হয় এবং পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপীয় আধিপত্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়।

এই যুগে পশ্চিমে প্রসারের দ্বার উন্মোচিত হল। আপালাচিয়ানের অপর পারে সম্ভাব্য বসবাসকারীদের সামনে নানা সুযোগ-সুবিধার আশা দেখা দিল। এই সবের ফলে আমেরিকানদের জাতীয় অহংকারবোধ ও আশাবাদ, যা ছিল সু-মনোভাবের যুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তা' আরও বেড়ে গেল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকার সীমান্তে বসবাসকারীদের জন্য অল্প মূল্যে উত্তম জমি দান করলেন। এর ফলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আপালাচিয়ানের পশ্চিমে জনসংখ্যা ৫০০,০০০ থেকে ১৮১০-এ ১০ লক্ষেরও বেশী সংখ্যায় পৌছালো। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতির ৯৬ লক্ষ জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও অনেক বেশী এই পশ্চিম অঞ্চলে বাস করতেন।

পশ্চিমের উদ্বোধন অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলির অনুসৃত আর্থিক নীতির দ্বারা। জাতির মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু রাখার ভার এই সব ব্যাঙ্কের হাতে এসেছিল ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সনদের

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর। ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলি সহজ পদ্ধতিতে কর্জ দেওয়ার ফলে বসতকামী জনগণের পক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ নিজস্ব অর্থে জমি কেনার সামর্থ্য খুব অল্পসংখ্যক চাষীরই ছিল।

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য প্রচলিত চলতি মুদ্রার জটিলতার অসহিষ্ণুতায় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ব্যাঙ্কসমূহের প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বেড়েই যেতে লাগল, ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্কপ্রদত্ত কর্জের দ্বারা পুষ্ট, বিপুলায়তন জমি-চাহিদা চিরদিন চলতে পারে না। অনিবার্য ভাবে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কমে এল এবং ব্রিটিশ মহাজনরা পাওনা মেটানোর জন্য তাগিদ দিতে লাগলেন। বৃহৎ পরিমাণে স্বর্ণ দেশের বাইরে চলে যাওয়ায়, অতি-প্রসারিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা টলটলায়মান হয়ে উঠল। সাধারণ দ্রব্যমূল্য অতি দ্রুত নেমে যেতে লাগল এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র জাতি যাকে "১৮১৯-এর আতংক" বলা হয় সেই আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণ অব্যাহত রইল, সরকার দুর্গতদের দুঃখ নিবারণ-কল্পে ভূমি আইনকে উদার করলেন। ঝুঁকি এবং কষ্টভোগের আশংকা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই পূর্বাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থা উপেক্ষা করে সুলভ মূল্যের জমির প্রতিশ্রুতি এবং স্বাধীন আয়ের সম্ভাবনার দিকে ঝুঁকলেন।

অবশ্য পশ্চিম সীমান্তের কষ্ট ভোগ করতে যারা রাজী হয়েছে, পশ্চিম তাদের নিরাশ করেনি। ক্রমে বসতিকামীরা পূর্বাঞ্চল থেকে একটা গরিমাময় বিচ্ছিন্নতার মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন—ইউরোপ এবং সমগ্র পুরাতন জগতের ঐতিহ্যের প্রতি সমগ্র জাতিরই ছিল এই একই মনোভঙ্গী। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের পিছনে ছিল সুদৃঢ় কৃতিত্বের ইতিহাস, তার ফলেই তারা স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে নতুন জগতের প্রতি ইউরোপীয় অভিসন্ধিকে ক্ষুণ্ন করতে পেরেছে। তাদের সামনে সীমাহীন ভৌগোলিক সীমানা সুযোগের এক অপার ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি ধরেছিল, যা কল্পনাকেও পরাভূত করে। আশ্চর্য নয় যে অনেক আমেরিকান মানুষের কাছে পুরাতন জগৎ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের নতুন জগৎ ছিল উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময়।

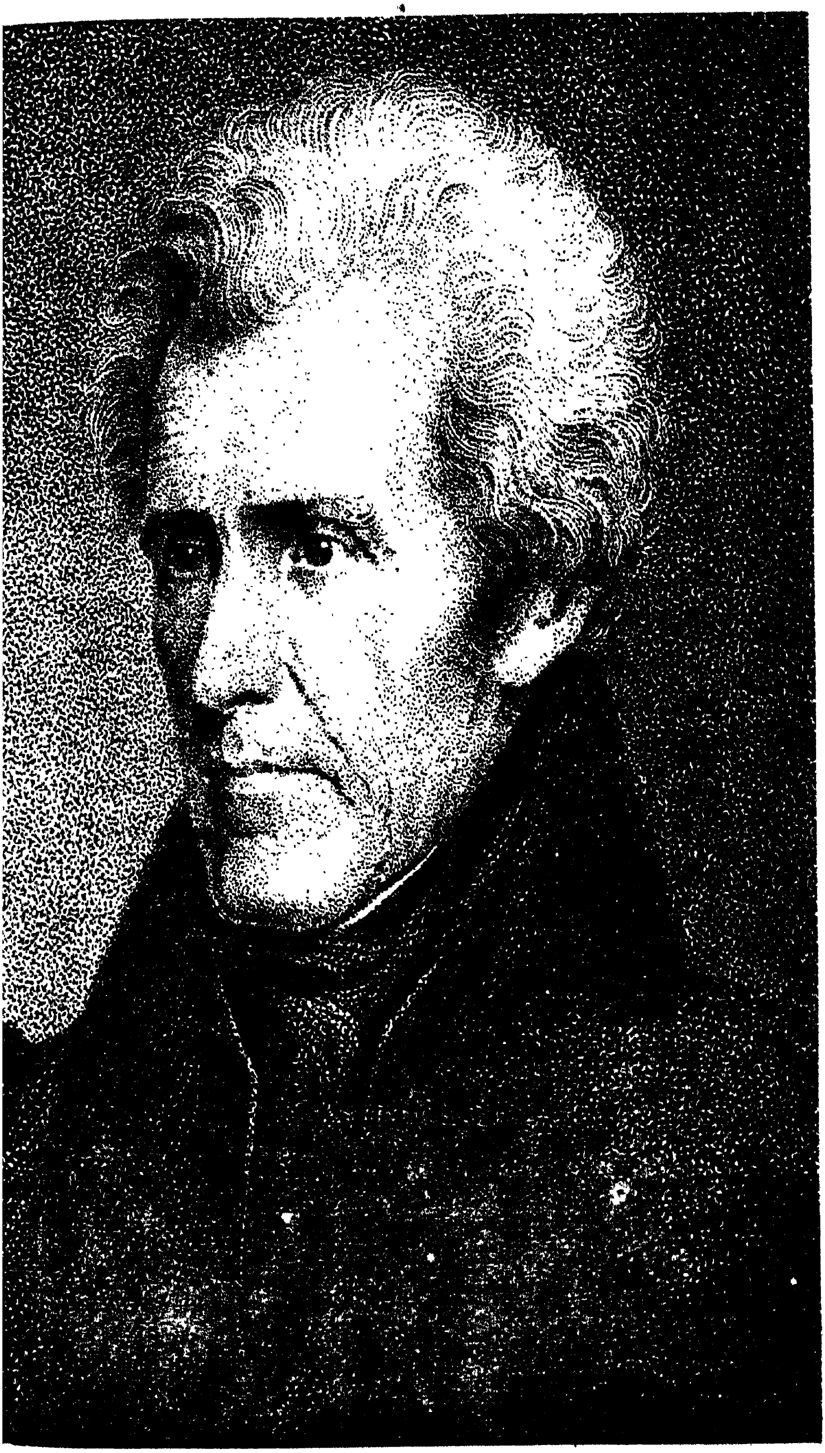
লোকায়ত গণতন্ত্রের অভ্যুদয়

১৮২৪ থেকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কাল তাকে যুক্তরাষ্ট্রের 'জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রে'র কাল বলা যায়। জ্যাকসনীয় গণতান্ত্রিক আদর্শ সকল মানুষের জন্য সমান আর্থনীতিক সুযোগ সৃষ্টির সরল অথচ সুমহান স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য ছোট জোতদার, নাগরিক কারুশিল্পী এবং শ্রমিক, উদীয়মান ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা এবং সাহসী ফাটকাবাজ এই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য উদ্বেগাকুল দাবী জানাচ্ছিল। এই সব লোকজনের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, তবে তারা সমকালীন আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে অসাম্য লক্ষ্য করে এবং সেই কালের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনেও যে অসাম্য প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

তাদের নেতা এবং উদাহরণস্বরূপ ছিলেন এনড্রু জ্যাকসন, জ্যাকসনের জীবন সাধারণ মানুষের পক্ষে কিভাবে সাফল্য এবং সমৃদ্ধি লাভ করা যায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লগ্ কেবিনে (খামার-বাড়ি) জন্ম, নর্থ ক্যারোলাইনা এবং টেনেসির প্রথম বাসিন্দাদের ঐ অঞ্চলে বসবাস স্থাপন প্রচেষ্টার পরিবেশে অতিকষ্টে মানুষ হয়ে সীমান্তের একজন অভিজাত হিসাবে জ্যাকসনের অভ্যুদয়, অর্থসম্পদে তিনি একজন নিজে-হাতে-গড়া মানুষ। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে জ্যাকসন কখনো ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের নায়ক, বহুবিধ সরকারি পদের অধিকারী, উচ্চস্তরের জমির ফাটকাবাজ এবং দাস-মালিক।

যৌবনে তিনি ছিলেন জেফারসনীয় ভাববাদী। কিন্তু ১৮১৯-এর সংকট বা প্যানিকের সময় মহাজন শ্রেণীর অন্যতম হিসাবে, টেনেসির অধমর্ণ চাষীদের ঋণভার যখন লাঘব করার চেষ্টা হয় তখন তিনি ভীষণ ভাবে তার প্রতিবাদ করেন। অথচ, এক দশক পরে এই মানুষটি সকলের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সমান অধিকার দাবীর প্রতীক হয়ে ওঠেন। জ্যাকসনের এই

এনড্রু জ্যাকসন (১৭৬৭-১৮৪৫)— ব্যাকউডস্‌ম্যান, আইনজীবি, সৈনিক, সাধারণ মানুষের জননায়ক, যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম প্রেসিডেন্ট।



পরিবর্তন এবং জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের আর্থনীতিক তত্ত্বের মূল সূত্র কিন্তু মানুষটির মধ্যে যত না পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশী পাওয়া যাবে তাঁর সময়ের মধ্যে। এই কালটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং পশ্চিমাঞ্চলে গমনের কাল হিসাবে চিহ্নিত। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর আপালাচিয়ানের পশ্চিম প্রান্তস্থ অঞ্চলের কণ্ঠ জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ধ্বনিত হল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই অঞ্চলেই সমগ্র জাতির এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার বসতি হয়েছিল।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বাণিজ্যিক এবং শিল্পগত সমৃদ্ধির ফলে একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল—নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কারখানার শ্রমিক মজুর-গোষ্ঠী। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে কারখানার কর্মীদের সংখ্যা ১৮২০ এবং ১৮৩০-এর দশকে জাতির সামগ্রিক শ্রমিক সংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ-মাত্র ছিল। আমেরিকান সমাজের নিকট প্রধান অংশ তখনও গ্রাম্য ভূমি-মালিক। দক্ষিণাঞ্চল বাদ দিয়ে, প্রতি পাঁচজন নাগরিকের মধ্যে অন্ততঃ চারজন স্বাধীন সম্পত্তির অধিকারী এবং মুখ্যতঃ ছোট চাষী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

"মেন অ্যাণ্ড ম্যানারস ইন আমেরিকা" (১৮৩৪) নামক গ্রন্থের ব্রিটিশ লেখক টমাস হ্যামিলটন এই অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে চতুর ভাবে বলেছেন: "বর্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর আর যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দিক থেকে অধিকতর নিরাপদ। জনসংখ্যার একটি বৃহত্তম অংশ সম্পত্তির অধিকারী; এক কথায় যাকে বলে—তাদের বেড়ার খোঁটা এখন শক্ত।"

ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে মার্কিন গণতন্ত্রবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার হল। সীমান্তের সাম্যনীতির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে এবং বহু পূর্বাঞ্চলীয় শহরে শ্রেণীবৈষম্য লোপ পাওয়ায়, অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য ভোটাধিকার এবং পদাধিকারের গুণপনার মান হিসাবে সম্পত্তি-সংক্রান্ত গুণটি পরিহার করল। সীমান্তের একজন প্রতিনিধি এনড্রু জ্যাকসন, যে প্রেসিডেন্ট পদের প্রয়াসী হতে পারেন—এই দৃষ্টান্ত অধিকাংশ মানুষকে ব্যালট বাক্স ব্যবহারে উৎসাহিত করল। ১৮২৮ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জনতা মাত্র দ্বিগুণিত হয়েছে, কিন্তু ভোটদাতার সংখ্যা হয়েছে ত্রিগুণিত।

এই ভাবে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এনড্রু জ্যাকসনের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের পূর্বের এবং পর বৎসরগুলি 'জনগণের গণতন্ত্রে'র অভ্যুদয়ের কাল হিসাবে চিহ্নিত। একবার যখন রাজনৈতিক সাম্য অর্জিত হল, তখন তা' সকল রকম বিশেষ



ব্যঙ্গচিত্র—সেই যুগের ব্যঙ্গচিত্র, জ্যাকসনের 'জবরদস্তি'র প্রতিবাদে। জ্যাকসনের যুক্তরাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের সনদের বিরোধী ব্যঙ্গচিত্র। জ্যাকসন-পন্থীদের কাছে অবশ্য এই ভেটো "প্রতিষ্ঠিত স্বার্থে"র বিরুদ্ধে জনগণের জয় এবং ঋণবুভুক্ষু পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রাচ্যের সমাহৃত সম্পদের ওপর বিজয়লাভ সূচিত হয়।

সুবিধা এবং কৃত্রিম পার্থক্য মুছে দেবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হল। তার ফলে, রাজনৈতিক সাম্যের দাবী, জনশিক্ষার বিস্তার, সনদপ্রাপ্ত একচেটিয়াগিরির অবসান, সমান করভার আরোপ, বাধ্যতামূলক সামরিক পদ্ধতির পরিবর্তন, সকল সরকারি পদের জন্য প্রত্যক্ষ লোকায়ত নির্বাচন

ব্যবস্থা এবং দেনার দায়ে কারাবাস আইনের বিলুপ্তি ইত্যাদির জন্য যে ব্যাপক দাবী তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল। এই সব আন্দোলন থেকে যে সকল সামাজিক এবং আর্থনীতিক কর্মনীতি 'জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রে' কেন্দ্রীভূত ছিল তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

জেফারসনীয়দের মত জ্যাকসনীয়রা "অতিরিক্ত শাসন" নিয়ে কোনো অভিযোগ তোলেননি। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গ-রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিবদ্ধ। তাঁদের কাছে ক্ষুদ্র-ভূম্যধিকারীপ্রধান আমেরিকান সমাজে যৌথ কারবারসমূহ কিংবা ষ্টেট বা ফেডারেল ব্যাঙ্ককে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দান বিশেষ ভাবে তিরস্কারযোগ্য।

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত 'সুবিধা'র বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তথাকথিত ব্যাঙ্ক-যুদ্ধ শুরু হয়, এবং শেষ পর্যন্ত যে বিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সনদের মেয়াদ পুনর্নবীকরণের জন্য উত্থাপিত হয়েছিল তার প্রতি জ্যাকসনের ভেটো প্রযুক্ত হয়।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস কর্তৃক ২০ বছরের জন্য প্রদত্ত সনদে এই ব্যাঙ্ক ছিল ফেডারেল সরকারের আর্থনীতিক প্রতিনিধি। যদিও এই ব্যাঙ্কে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের শেয়ারের এক-পঞ্চমাংশের মালিক ছিল সরকার, কিন্তু এর সম্পূর্ণ পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল বেসরকারি জনসাধারণের হাতে। নিকোলাস বিডলের নির্দেশনায় এই ব্যাঙ্ক সতর্কতা সহকারে ঋণ এবং দাদন বৃদ্ধি করে, চেক-নিকাশী প্রতিষ্ঠান বা ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে কাজ করে, সমগ্র দেশে একই ধরনের মুদ্রা চালু করে এবং ষ্টেট বা স্থানীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক দাদন দানের বা ব্যাঙ্ক নোট চালু করার বিরুদ্ধে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে।

এই বিজ্ঞ অথচ কঠোর স্ফীতিনিরোধক নীতি কিছুসংখ্যক আর্থনীতিক এবং শ্রেণীগত গোষ্ঠীকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে বাধ্য। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতির ৫০২টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ৮৮টি বাদে বাকী সব ব্যাঙ্ক ছিল বালটিমোর, মেরীল্যাণ্ডের উত্তরে। তাই পশ্চিম এবং দক্ষিণের সম্পন্ন চাষীবৃন্দ আপত্তি জানায় যে কার্যতঃ তারা পূর্বাঞ্চলীয় শেয়ার-মালিকদের কর দিয়ে যাচ্ছে।

পূর্বাঞ্চলে দু'টি গোষ্ঠী ব্যাঙ্কের বিরোধিতা করে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী কারণে। একদিকে ছিল বেসরকারি ব্যাঙ্কাররা, তাঁরা বিডলের ক্ষমতার 'অপব্যবহারে'র তীব্র নিন্দা করেন। সেকেণ্ড ব্যাঙ্ককে তাঁরা

"অসম" প্রতিযোগী এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাজকর্মের উপর বাধাপ্রদানকারী বলে অভিহিত করেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, মুদ্রা সরবরাহের ক্ষমতাটা রয়েছে উদীয়মান উদ্যোক্তা সম্প্রদায়ের (entrepreneurs) হাতে। ফেডারেল সরকার পৃষ্ঠপোষিত "টাকার এই অকটোপাশে"র হাতে নয়।

নাগরিক র‍্যাডিকাল গোষ্ঠী, শ্রমিক সংস্কারক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীবৃন্দ অপরদিকে, সব ব্যাঙ্ককেই অবিশ্বাস করতেন এবং কাগজী মুদ্রার পরিমাণের তারতম্যকে তাঁদের আর্থিক দুর্গতির মূল বলে মনে করতেন। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা ছেঁড়া বিশ্রী নোট হাতে পেত। তাই তাঁরা পুরাতন কঠিন মুদ্রা-ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাইত।

ব্যাঙ্কের সনদের পুনর্নবীকরণের বিলে (১৮৩২) ভেটো দান প্রসঙ্গে জ্যাকসন যে বিখ্যাত বাণী দান করেন তার মধ্যে যে আন্দোলনের তিনি তখন প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তার সারমর্ম উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি "জনগণের কাছে দায়িত্বশীল নয় এমন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা"কে আক্রমণ করেন! আর্থনীতিক দিক থেকে তিনি বলেন, পুনর্নবীকরণের অর্থ হবে "বহুর ঘাড়ে চেপে মাত্র কয়েকজনের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে সরকারের ব্যভিচারবৃত্তি অবলম্বন।"

জ্যাকসনের সেকেণ্ড ব্যাঙ্ক সংহার এবং পরবর্তী আর্থনীতিক নীতি শুধু-মাত্র ষ্টেট ব্যাঙ্কারদের উৎসাহিত করে। কিন্তু তার ফলে কাগজী মুদ্রার সমালোচকদের কোন লাভই হয়নি। কিন্তু ব্যাঙ্কিং প্রথা বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী যতই দুর্বল এবং সীমিত হোক, জ্যাকসন তাঁর কালের সংস্কার আন্দোলনকে অর্থদান করেছেন, বিশেষ ধরনের সুবিধা এবং কৃত্রিম বিধিনিষেধের কোনো স্থান আমেরিকান সমাজে নেই একথা তাঁর কাজকর্মে পুনর্বার বিঘোষিত হল।

তাঁর সমালোচকরা নির্দয়ভাবে তাঁকে আক্রমণ করল। কিন্তু অতি সামান্য কটূক্তিই কার্যকরী হল। যে সমাজের অধিকাংশই ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারী কিংবা জমি এবং অর্থের অধিকার লাভের স্বপ্ন দেখে, সে সমাজের উপযোগী সত্য কথা বলেছেন জ্যাকসন—তাঁর সমালোচকরা নয়। এই ভাবে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এনড্রু জ্যাকসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়ে।

সেকেণ্ড ব্যাঙ্কের পরাজয়ের পর শত শত, আর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বল ব্যাঙ্ক বা যাদের 'ওয়াইল্ড ক্যাট' ব্যাঙ্ক বলা হয়, বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যসমূহে সনদীকৃত (চার্টার্ড) হল। এই সব ব্যাঙ্কের কাগজী মুদ্রা চালু

করার ক্ষমতা ছিল। এই মুদ্রানীতি হাজার হাজার বসতিকামীকে পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসের জন্য আকৃষ্ট করল, এদের অধিকাংশই বন্ধকী কিংবা জিনিষ-পত্রাদি ক্রয়ের দরুণ গুরু ঋণজালে জড়িত ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারের ব্যাঙ্ক ঋণ ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে পৌছলো সাত বছরের মধ্যেই। ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের সঙ্গে সমান তালে চলছিল কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল ঋণগ্রস্ত অবস্থা। অঙ্গরাজ্যের ঋণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের নীচে ছিল, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তা দ্বিগুণিত হয়ে উঠল এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ কোটি ডলারে পৌছলো—কোনো রকম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব না থাকায়, সমগ্র ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি এক রকম অনিয়ন্ত্রিত চলছিল।

প্রচণ্ড ফাটকাবাজি ও তার সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের বেহিসাবী কাজ-কারবারের ফলে একটা বিপজ্জনক মুদ্রাস্ফীতির চক্রজাল সৃষ্টি হল। জ্যাকসন যখন যুক্ত-রাষ্ট্রীয় তহবিল রাজ্য ব্যাঙ্কগুলিতে জমা রাখতে এবং উদ্বৃত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করে দিতে আরম্ভ করলেন তখন এই মুদ্রাস্ফীতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। Specie Circular (১৮৩৬) নামক স্বর্ণমান-সংক্রান্ত প্রকাশিত ঘোষণায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বেসরকারি জমির দাম স্বর্ণমুদ্রায় দিতে হবে, কাগজের টাকায় নয়—এই ব্যবস্থা কিন্তু ফাটকাবাজি বা মুদ্রাস্ফীতি রোধে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। অপরিহার্য ভাবে একটা মুদ্রা-আতংক বা 'মনি প্যানিক' সৃষ্টি হল। জ্যাকসনের পরে এলেন মার্টিন ভ্যান বুরেণ, প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করার স্বল্পকাল মধ্যে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অবস্থার সৃষ্টি হল, এবং এর পিছে পিছে এল এক নিদারুণ আর্থনীতিক সংকট যা ১৮৪৩ পর্যন্ত টিঁকে রইল।

যাই হোক, আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপরিসরতা সত্বেও জ্যাকসনের শাসন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক নীতি উন্নয়নে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে—দু'টি নীতিকে একত্রীভূত করে 'আর্থনীতিক সুযোগ' এবং 'সমান অধিকার'।

জ্যাকসনীয় কালের আর্থনীতিক ফলাফল সম্বন্ধে ব্রে হ্যামণ্ড নামক আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের ব্যাঙ্কিং-এর একজন ছাত্র মন্তব্য করেছেন: "জ্যাকসনীয় আন্দোলনের সর্বোত্তম কৃতিত্ব হচ্ছে ব্যবসার গণতন্ত্রীকরণ। হ্যামিলটনের কালের ব্যবসার মত ব্যবসা আর একটা মুষ্টিমেয় বণিক বা সওদাগরি অভিজাতশ্রেণীর কুক্ষিভূত রইল না। সাধারণ মানুষও ব্যবসার অংশভূত হয়ে উঠল।

"জ্যাকসনীয় কাল আবার জনপ্রিয় রাজনীতিকদেরও অভ্যুদয়ের কাল। এই কাল থেকে, রাজনীতিকদের সাধারণের প্রয়োজন এবং শ্রেণীগত অভাব-অভিযোগ মেটাবার চেষ্টা করতে হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে নিজেদের 'সাধারণ মানুষে'র সঙ্গে একাত্ম করার চেষ্টা করেছেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য হুইগ পার্টির মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে সম্পদ এবং রক্ষণশীলতার প্রতীক ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টারকে কোনো লগ কেবিনে ভূমিষ্ঠ না হওয়ার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করতে হয়েছে। তিনি অবশ্য বলেছিলেন, তাঁর বড় ভাই এবং বোনদের অনেক হীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে এবং তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যদি কোনো দিন আমি এর জন্য লজ্জা অনুভব করি, তা' হলে যেন আমার নাম এবং আমার বংশধরদের নাম মানব-ইতিহাসের স্মরণ-পথ থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়।"



আন্দালুসিয়া অন্‌ দি ডেলাওয়্যার—যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের প্রধান নিকোলাস বিড্‌লের বাসগৃহ। পথিকৃৎ জীবনের সঙ্গে বৈপরীত্য জ্যাকসন-পন্থীদের কাছে এক প্রত্যক্ষ আয়ুধসদৃশ।

দ্বিতীয় ভাগ

পূর্ণতার
পরীক্ষা

পূর্ণতার পরীক্ষা

॥ পশ্চিমের খোলা পথ ॥

আমরা সংকীর্ণ জাতি নই…যাদের রক্ত মহত্তীকরণের চেষ্টায় কলুষিত হয়েছে, নিজেদের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা আমরা সীমাবদ্ধ রাখিনি। আমাদের রক্তধারায় আমাজন নদীর স্রোতের মত সহস্র মহৎ স্রোত এক হয়ে এসে মিলেছে। আমরা একটি জাতিমাত্র নই, আমরাই এক বিশ্বজগৎ।

—হেরমান মেলভিল, ১৮৪৯

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গৃহযুদ্ধের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পশ্চিমা সম্প্রসারণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় অর্থনীতি, নতুন জগতে প্রথম উপনিবেশ চালু হওয়ার সুরু থেকেই, দুই পরস্পর-বিরোধী পথে অগ্রসর হয়ে বিকশিত হচ্ছিল। এখন তাদের স্বার্থ বর্ধিত হারে জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কংগ্রেসের শক্তির ভারসাম্য নতুন পশ্চিমা অঙ্গরাজ্যের আনুকূল্যে এদিকে বা ওদিকে ঝুঁকবে।

জাতীয় কর্মে পশ্চিমাঞ্চলকে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হতে প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও কম সময় লেগেছে। এই কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোট ভূমির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছিল। ফ্লোরিডা অঞ্চলের (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন কর্তৃক ছেড়ে দেওয়া অঞ্চল) কথা বাদ দিলে, সমগ্র আঞ্চলিক সংযুক্তি পশ্চিমাঞ্চলেই ঘটেছে—১৮৪৫-এ টেক্সাস, ১৮৪৬-এ অরিগন অঞ্চল এবং ১৮৪৮-এর মেকসিকান ছাড়।

ইতিমধ্যে পুরোগামী বসতিকামীর দল ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এই বিশাল অঞ্চলে এসে পৌঁছাতে থাকে। ১৮১৫ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা যখন চতুর্গুণ হয়ে উঠল, আপালাচিয়ানের পশ্চিম প্রান্তে জনসংখ্যা বেড়ে গেল দশ গুণ। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র জাতির ৩ কোটি ১৪ লক্ষ অধিবাসীর প্রায় অর্ধেক লোক আপালাচিয়ান পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে বাস করত।

পশ্চিমাঞ্চলে এই সম্প্রসারণের একটি প্রধান কারণ ছিল ইউরোপীয় নতুন আগমনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ

নবাগত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। এরা ছিল প্রধানতঃ আইরিশ এবং জার্মান। উত্তরাঞ্চলে এবং পশ্চিম-সীমান্ত বরাবর অঞ্চলে কৃষি, শিল্প এবং যানবাহনের সুযোগ-সুবিধায় এঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিনেসোটা এবং উইস্‌কন্‌সিনের শতকরা ত্রিশ ভাগ অধিবাসী ছিলেন বহিরাগত।

দক্ষিণাঞ্চলে অবশ্য বহিরাগতের প্রভাব খুব কমই ছিল। সেখানে বৃহৎ খামার-মালিকগণ বাছাই-করা জমিতে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে বসেছিলেন, তাঁরা ছোট চাষীদের এবং কারিগরদের দাস-মজুরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করেন। এই কারণে উৎসাহী বহিরাগতরা দক্ষিণাঞ্চলের পরিবর্তে পশ্চিমাঞ্চলের জমির দিকে চলে যান।

পশ্চিমের মোহ ছিল ভূমি—এবং এক স্বাধীন জীবিকার প্রতিশ্রুতি। তবে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ক্যালিফোর্ণিয়ায় আর এক আকর্ষণ ছিল—তা' হল স্বর্ণের আকর্ষণ। দশ বছরের মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার জনসংখ্যা চতুর্গুণ বেড়ে গেল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সোনা আবিষ্কৃত হওয়ার পর।

এই ক'বছরে যুক্তরাষ্ট্র ভূমিহীনদের ভূমি বিতরণের এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছে। এবং তার জন্য পূর্ববর্তী স্থায়ী ব্যবস্থার কোনো রকম রদবদল করার প্রয়োজন হয়নি। এই ভাবে অবাধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে পিতৃসুলভ সরকারি উৎসাহ মিশ্রিত হয়ে একটা নতুন এবং সম্পূর্ণ সার্থক ধরনের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হল সর্বপ্রথম "সাধারণ সম্পত্তি" যা নিলাম করে নাগরিকদের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে। এই বৃহৎ অঞ্চলটি পরে পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে,—ওহায়ো, মিসিগান, ইলিনয় এবং উইস্‌কন্‌সিন—এই সুবৃহৎ এলাকা কয়েকটি 'ভূমি আইন' বা 'ল্যাণ্ড অর্ডিন্যান্স' (১৭৮৪—১৭৮৭) দ্বারা বণ্টন করা হয়। এই সব আইনে যে ভূমিনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে এই সব মুখ্য ধারা ছিল। যথা—(১) নতুন অঞ্চলটিকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সাম্যের ভিত্তিতে ইউনিয়নভুক্ত করতে হবে জনসংখ্যা ৬০,০০০ হাজারে পৌছানো মাত্র, (২) কোনো একটি বিশেষ সম্পত্তির ক্রেতা সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করবেন, (৩) সরকারি জমি নিলাম দ্বারা ৬৪০ একারের এক-একটি অংশে বিক্রি করা হবে, প্রতি একারের দাম ১ ডলারের নীচে হবে না, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা সবাইকে দিতে হবে

এবং দাসপ্রথা লুপ্ত করা হবে, (৫) অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত ভাবে সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী ভূমি দেওয়া হবে।

কিছু পরিমাণে, এই সব ধারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ভূমিবণ্টন নীতিকে প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্য দাসপ্রথা নিষিদ্ধকরণ প্রযুক্ত হয়নি। এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাইরের এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাই নতুন রাজ্য হিসাবে ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল না।

অতি অল্পকালের মধ্যেই বোঝা গেল যে, সরকারি জমি ৬৪০ একার হিসাবে অংশ করে বিক্রি করার ফলে জমির ধনী ফাটকাবাজকেই অধিকতর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, ক্ষুদ্র চাষীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে না। ফলে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তা' হ্রাস করে ৩২০ একার করা হল এবং চার বছর পরে তা' আরও হ্রাস করে ১৬০ করা হল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই সব অংশ হ্রাস করে ৮০ একার এবং আরো পরে মাত্র ৪০ একার করা হল। জমির দাম ওঠানামা করতে থাকে প্রায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাস্তুভিটা আইন' বা 'হোমষ্টিড এ্যাক্ট' বলবৎ হওয়ার কাল পর্যন্ত, এরপর দামের প্রশ্ন অন্তর্হিত হল। এরপর যে-কোন বসতকামী ১৬০ একার জমি সংগ্রহ করতে পারতেন সেই জমিতে চাষবাস করে এবং পাঁচ বছর ধরে বাস করে।

জমি-সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, বিশেষতঃ যানবাহনের ব্যবস্থার প্রশ্ন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইতিমধ্যেই আমেরিকার বার্মিংহাম নামে পরিচিত শিল্পনগরী পিট্‌স্‌বার্গ মাল চালান দেওয়ার প্রধান বন্দর রূপে গণ্য হয়ে ওঠে। এইখানে বালটিমোর এবং ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায়ীরা তাঁদের শাখা কর্মকেন্দ্র খুললেন। উপকূলস্থ নগর-অঞ্চল থেকে যে-সব পণ্য স্থলপথে আনা হত তা' এইখানে পিটস্‌বার্গ এবং ওহায়ো উপত্যকার উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করা হত।

কিন্তু স্থলপথের দূরত্ব প্রচণ্ড এবং ক্লেশকর। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৎসরে ১,২০০ চেপ্টা পাটাতন-নৌকা ওহায়োর জলতরঙ্গে বাহিত হয়ে মিসিসিপি এবং নিউ অরলিন্সে যাত্রা করত। এখানে পণ্যদ্রব্যের একটা সামান্য অংশ নগদ মূল্যে বিক্রি করা হত। বাকী অংশ চিনি এবং তুলার সঙ্গে বিনিময় করা হত, তারপর সেগুলি সমুদ্রপথে জাহাজযোগে অতলান্তিকের বন্দরসমূহে প্রেরিত হত।

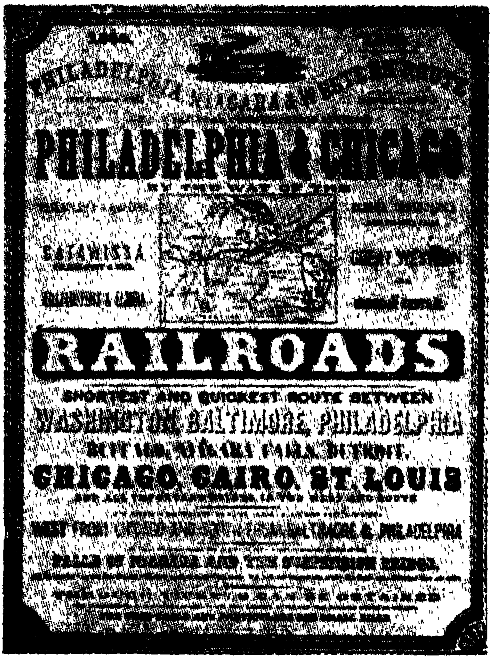
এই পদ্ধতির অসুবিধা ছিল এই যে, উজানে ফিরতি মাল পাঠানোর কোনো উপায় ছিল না। মিসিসিপির স্রোতের বিরুদ্ধে লুইসভিল, কেনটাকী

পর্যন্ত চেপ্টা মালবাহী নৌকায় ১,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে ৯০ দিন লেগে যেত। এই সমস্যা ক্রমে বিদূরিত হতে লাগল, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ফুলটনের প্রথম পায়ে-চালানো বাষ্পীয় পোত হাডসন নদীর বুকে ভাসমান হবার পর থেকে অল্পকালের মধ্যেই ধূম-উদ্‌গীরণকারী বাষ্পীয় পোত মিসিসিপি এবং অন্যান্য পশ্চিমা নদী বেয়ে চলেছে—এ এক সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হল। যানবাহনের এই উন্নতি সম্পর্কে বলা হয়েছে—"হাজার যুদ্ধের ফলাফলের চেয়েও পশ্চিমের কাছে এই ঘটনার প্রভাব অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"

বাষ্প-পোত, ওহায়ো উপত্যকা থেকে পূর্ব সমুদ্রের উপকূলে অতলান্তিক বন্দরসমূহে যাতায়াতে মিসিসিপি নদী-মেকসিকো উপসাগর-অতলান্তিক মহাসাগর—এই সুদীর্ঘ এবং ঘোরালো পথের দূরত্ব হ্রাস করতে পারেনি। এই সব বিন্দুতে পৌছনোর জন্য আরও সোজাসুজি যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য খাল এবং কপাটকল বা লক্‌ নির্মাণ করতে হল। এই সব প্রকল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল 'এরি ক্যানাল'। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মধ্য-পশ্চিমের খামার থেকে শস্য এবং ময়দা গ্রেট লেক থেকে প্রবাহিত হয়ে এরি ক্যানালের পথ ধরে হাডসন নদী বেয়ে নিউ ইয়র্কের বন্দর মারফৎ পৃথিবীর বাজারে ছড়িয়ে পড়ত।

এরি ক্যানাল পশ্চিমকে জাতীয় অর্থনীতির একটা প্রধানতম অঙ্গে পরিণত করেছিল। এর ফলে আবার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য বিশিষ্ট আকৃতি লাভ করে এবং মিসিসিপি দক্ষিণ থেকে নিউ অরলিন্স পর্যন্ত পূর্ব-প্রচলিত বাণিজ্য-পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। পশ্চিম এবং উত্তরের মধ্যে বাণিজ্য যেমন নাটকীয় গতিতে বর্ধিত হল, পশ্চিম এবং দক্ষিণের মধ্যে প্রচলিত বাণিজ্য-ব্যবস্থা তেমনই ধীরে ধীরে হ্রাস পেল। প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে নিউ অরলিন্সের গুরুত্ব স্তিমিত হয়ে এল। উত্তরের বহুমুখী কর্মকাণ্ড, পূর্ব-প্রান্তীয় বণিকদের আগ্রাসী মনোভাব এবং উত্তরাঞ্চলের উদার ঋণদান পদ্ধতি অতলান্তিক বন্দরসমূহের বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করল এবং উপসাগর অঞ্চলের বন্দর নিউ অরলিন্সের গুরুত্ব কমে এল।

পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য রেলপথের দ্বারা আরও সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। প্রথম দিকে, রেলপথের সংগঠন, এরি ক্যানাল নির্মাণের মত, অঙ্গ-রাজ্যের দায়িত্ব ছিল। জেফারসনের শাসনকালে যখন ব্যাপক ভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়, তখন থেকেই প্রাচীনতর অঙ্গরাজ্যগুলি



১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রাচীরচিত্র—এই প্রাচীরচিত্রে পূর্বাঞ্চল এবং শিকাগো ও সেন্ট লুইসের মধ্যে রেলপথই যে যোগাযোগের দ্রুততর ব্যবস্থা তা' বিজ্ঞাপিত হয়েছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূল রেলপথ দ্বারা সংযোজিত হয়।

তার বিরোধিতা করে এসেছে, কারণ তাতে অঙ্গরাজ্যগুলির অতি সামান্যই উপকৃত হবার সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্গ-রাজ্যসমূহের হাতেই দেওয়া ছিল।

কিন্তু উত্তম রাজপথ এবং রেলপথ নির্মাণের ফলে রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হত। কিন্তু ক্রমাগতই অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আতঙ্ক বা 'প্যানিকে'র কালে যে সমস্ত সরকারি উদ্যম রাজ্যের রাজকোষ প্রায় শূন্য করে তোলে, সেই ধরনের উদ্যম নিষিদ্ধ হয়ে উঠল। তাই অধিকাংশ রেলপথ নির্মাণের ভার বেসরকারি কোম্পানীগুলির হাতে দেওয়া হতে লাগল। এই সব প্রকল্পে সাধারণতঃ পূর্বাঞ্চলীয় এবং ইউরোপীয় মূলধন ব্যয়িত হত, যদিও অঙ্গরাজ্য কিংবা স্থানীয় সরকার প্রয়োজন মাফিক অর্থ সাহায্য করতেন। ১৮৫০ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রেলপথ কোম্পানীসমূহকে ভূমি দান করার নীতি গ্রহণ করল তখন থেকে এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সহায়তা পাওয়া গেল। এই সব বরাদ্দ ব্যাপক হারে রেলপথ নির্মাণে বিরাট প্রেরণার সঞ্চার করল। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রেলপথের মাইল-সংখ্যা ৯,০১০ থেকে ৩১,০০০ হাজার মাইল পর্যন্ত বর্ধিত হয় এবং রেল এবং রেলগাড়ির ওপর লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ ৩০ কোটি ডলার থেকে

প্রায় একশ' কোটি ডলারে পৌঁছোয়—এই অঙ্ক জাতির সক্রিয় মূলধনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং বালটিমোর রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত হয়েছিল শিকাগো, সিনসিনাটি এবং সেণ্ট লুইসের সঙ্গে। এই সব শহরের মধ্যে রেলপথের যোগাযোগ উত্তর এবং পশ্চিমের আর্থনীতিক বাঁধন সুদৃঢ় করে এবং এই দু'টি অঞ্চলের মধ্যে একটা আর্থনীতিক তেজী বাজার সৃষ্টি করে। জাতির শিল্পোৎপাদনের মোট অঙ্ক শতকরা ৮৬ ভাগ ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে বেড়ে যায়।

অনুরূপ ভাবে, পশ্চিমা কৃষি উৎপাদন চমকপ্রদ ভাবে বর্ধিত হয়। খামারগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রেলপথের উন্নয়নের ফলে স্থানীয় ফসলের চেয়ে গম, শস্য, মাংসজাত দ্রব্য ইত্যাদি আঞ্চলিক ফসলের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়। কৃষি এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থা এই উভয়েরই বৈপ্লবিক উন্নয়নের ফলে পশ্চিমেব কৃষকরা নূতন এবং দূরদূরান্তের বাজারের সুযোগ লাভে সমর্থ হলেন। অন্যদিকে, আবার এই সব, তুলা-উৎপাদক অঞ্চলটিকে সস্তায় খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল, কারণ পশ্চিম প্রান্ত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এবং ইউরোপে জাহাজযোগে মাল চালান দিয়ে অধিক মুনাফা লাভ কবতে লাগলেন।

পশ্চিম এবং উত্তরেব মধ্যে প্রসারিত বাণিজ্যিক লেনদেন, পশ্চিমের রাজনৈতিক নীতিতে একটা পবিবর্তন এনে দিল, বিশেষতঃ দাসপ্রথা এবং শুল্ক বিষয়ে। পশ্চিমাঞ্চল যখন জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শক্তি অর্জন করলেন, তখন এই পরিবর্তন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৮২০ থেকে গৃহযুদ্ধের আরম্ভের মধ্যবর্তী সময়ে, পশ্চিমাঞ্চলের বারোটি রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের মোট ৬৮টি আসনের মধ্যে ২৩টি ছিল এদের দখলে। এই সমস্ত পশ্চিমা সেনেটরদের মাত্র চার জন ছাড়া সকলেই আসেন দাসবিরোধী রাজ্য থেকে। যে ব্যবস্থা পরিষদে জাতির রাজস্ববিষয়ক প্রস্তাব নির্ধারিত হয় সেইখানে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধির শক্তি বৃদ্ধি হওয়া এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সংরক্ষণমূলক শুল্ক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনে পশ্চিমের রাজনৈতিক চেতনার একটা পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সংরক্ষণী শুল্ক থেকে পশ্চিমা চাষীদের কিছুই লভ্য ছিল না, কারণ তারা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন করে বিশ্বের

বাজার দর অনুসারে তা' বিক্রি করত। এই শুল্ক-ব্যবস্থার ফলে শুধু যে-সব শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য পশ্চিমাঞ্চল তাদের কৃষিজাত উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে পেত তার মূল্য বেড়ে গেল।

দক্ষিণাঞ্চল বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদির ওপর নির্ধারিত এই শুল্কের তীব্র বিরোধী ছিল। কারণ, এই শুল্কের ফলে ইউরোপের বাজারে তাদের তুলা বিক্রির পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেল। এর ফলে, শেষ পর্যন্ত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চল দক্ষিণের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের শিল্পদ্রব্য-সংক্রান্ত স্বার্থের বিরুদ্ধে এক-যোগে প্রতিবাদ জানালে কংগ্রেস এই সংরক্ষণী শুল্ক-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানল।

কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চল উত্তরের সঙ্গে শুল্কহার হ্রাসের বিপক্ষে ভোট দিল একটা ব্যবস্থাপক চুক্তির ফলে, এই চুক্তি অনুসারে একটা সাধারণ 'হোমষ্টেড ল' বা বাস্তুভিটা আইনে উত্তরাঞ্চলের সমর্থন লাভ হল শুল্ক ব্যাপারে পশ্চিমাঞ্চলের সহযোগিতার বিনিময়ে। অবশ্য এই বিলটি শেষ পর্যন্ত পাকা করা হয়নি। তবু উত্তর-পূর্বের লগ্নীযোগ্য মূলধন এবং পশ্চিমের উন্নয়ন বিষয়ে উচ্চাকাঙ্খা সংযুক্ত হয়ে একটা রাজনৈতিক মৈত্রী দু'টি অঞ্চলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল।

ঐতিহাসিক চার্লস বীয়ার্ড বলেছেন, পূব আর পশ্চিম উভয় অঞ্চল পরস্পর "ইস্পাত আর স্বর্ণসূত্রে"র বন্ধনে বাঁধা ছিল। উত্তর এবং পশ্চিমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই মৈত্রীর ফলে উত্তরের মিল এবং ফ্যাক্টরী বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করল। আর পশ্চিম অঞ্চল বিনামূল্যে ভূমি লাভ করল এবং অধিকতর সম্প্রসারণের জন্য যেটুকু আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল তা' সম্পন্ন করল।

পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে শক্তির ভারসাম্য উত্তরের দিকে ঝুঁকল, রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক উভয় দিক থেকেই।

"দাস-মজুরী অপটু কারিগরি বৃত্তি; স্পষ্টই বোঝা যায়, সেই হেতু উৎপাদন শিল্প ও যান্ত্রিক কারিগরি শিল্পকর্মের আওতা থেকে তাকে বাদ দেওয়া চলে। একজন মজুর যেখানে বাধ্যতামূলক অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তার মানসিক শক্তির উন্নয়নের কোন প্রেরণাই যেখানে নেই, সেখানে উৎপাদন-সংক্রান্ত কোন সূক্ষ্ম যান্ত্রিক কাজে সে যে দক্ষতার অংশ গ্রহণ করবে তা' সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

—জনৈক আইরিশ অর্থনীতিবিদের মন্তব্য, ইনি প্রাক্-গৃহযুদ্ধকালীন পর্বে দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণ করেন।

প্রাক্-গৃহযুদ্ধকালীন দক্ষিণাঞ্চল

প্রাক্-গৃহযুদ্ধকালীন দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌছোতে গেলে, যে পরিস্থিতিতে দাসবৃত্তি এবং একটি মাত্র ফসলের ওপর দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিকে নির্ভরশীল হতে হয়েছিল তা' আলোচনা করা আমাদের প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি যে, ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকা থেকে সর্বপ্রথম দাস আমদানি করা হয়, এখন যাকে আমরা যুক্তরাষ্ট্র বলি সেই অঞ্চলে। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে অব্যাহত ভাবে দাস আমদানি করা হয়, তবে খুব কম সংখ্যায়। শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে তামাক এবং অন্যবিধ দক্ষিণাঞ্চলীয় ফসলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের খামারগুলিতে ব্যাপক ভাবে দাস-মজুর নিয়োজিত হতে লাগল। আমেরিকান বিপ্লবের কালে, ভার্জিনিয়ার অর্ধেক জনসংখ্যা এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল নিগ্রো ক্রীতদাস।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে যখন তামাকের দাম হ্রাস পেল এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী কৃষি-সম্পর্কিত মন্দার বাজার দক্ষিণের কাজকর্ম আহত করল, তখন বনেদী ক্রীতদাস-মালিকরা নিগ্রো জনসংখ্যার পরিমাণ সীমিত রাখার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে, বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীতদাস-বিরোধী মনোভাবও প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতার সংগ্রাম মানুষকে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে। উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস-ব্যবস্থা শ্রমশিল্প এবং ক্ষুদে-খামার অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খায়নি। তাই উত্তর এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত

ঘৃণ্য মনে করত। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডেলাওয়ারের উত্তরে সমস্ত রাজ্যগুলি এই ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে।

এমন কি দক্ষিণাঞ্চলেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দাস-মজুরীর অসুবিধা উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ওয়াশিংটন বা জেফারসন ক্রীতদাস-প্রথাকে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা বিবেচনা করেন এবং আশা করেছিলেন যে, যথা সময়ে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটবে। ক্রীতদাসদের মালিকরাই মুক্তি দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এর ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই একটা ছোটখাটো 'মুক্ত-নিগ্রো' শ্রেণী গড়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই ক্রীতদাস-প্রথার হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যু ঘটত, যদি না দু'টি পরস্পর-সহায়ক ঘটনার উদ্ভব ঘটত। প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংরাজ কাপড়-কলগুলিকে যন্ত্রচালিত করা হল। ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সব মিলের জন্য প্রচুর পরিমাণে তুলার প্রয়োজন হয় বর্ধিত উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখার জন্য। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এলি হুইটনি যে 'কটন জিন' (তুলা থেকে বীজ ও আঁশ নিষ্কাশনের যন্ত্র) উদ্ভাবন করেন, তার ফলে দক্ষিণাঞ্চলে তুলা উৎপাদনের ব্যয় নাটকীয় ভাবে হ্রাস পেল। যে মুহূর্তে ইংরাজ মিলগুলি থেকে অধিকতর তুলার চাহিদা আসছিল ঠিক সেই সময়েই আশ্চর্যজনক ভাবে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেল।

কটন জিন উদ্ভাবনের আগে, ক্রীতদাসরা হাত দিয়ে তুলার বীজ ছাড়িয়ে আঁশটা আলাদা করত। এই কালক্ষয়কারী কাজটি যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায়, ভূমি-ক্রীতদাসের ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে গেল। তুলা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের এই ছিল প্রধানতম কারণ। ফলতঃ, খামার-ক্রীতদাস ব্যবস্থার প্রসারে এটিও একটি প্রধান কারণ। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাসের সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশী হয়ে উঠল। এর পরবর্তী ত্রিশ বছরে নিগ্রো জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হয়ে উঠল, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস আমদানি বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

তুলার মূল্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পাউণ্ড প্রতি ৪৪ সেণ্ট থেকে ১৮৩০ এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দা হারে গড়পড়তা পাউণ্ড প্রতি ১০ সেণ্টে দাঁড়ায়। পড়তি দাম সত্ত্বেও তুলাচাষীরা কিন্তু অন্য ফসলের দিকে অগ্রসর হননি। মজুর এবং জমির মূল্য এতই কম ছিল যে, তুলার উৎপাদন-ব্যয় পাউণ্ড প্রতি আট সেণ্ট

হলেও কোনো কোনো অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের খরচ চালিয়ে নেওয়া গেছে। অধিকন্তু, যদিও এক-ফসল পদ্ধতির ফলে জমির তেজ নষ্ট হয়ে যায়, জনসংখ্যানুপাতে জমির প্রাচুর্যের ফলে চাষীর পক্ষে ব্যবহৃত জমি ছেড়ে দিয়ে অনাবাদী জমি গ্রহণ করা সম্ভব হত। গৃহযুদ্ধ কালের ঠিক পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের আগে এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মূঢ়তা চাষীরা অনুধাবন করতে পারেনি।

ক্রীতদাসভিত্তিক পদ্ধতির ত্রুটি দক্ষিণের অর্থনীতিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অনুমান করা গেছে যে, দক্ষিণাঞ্চলের খামার-ক্রীতদাসদের দক্ষতা ছিল মুক্ত শ্বেতাঙ্গ মজুরদের দক্ষতার অর্ধেকমাত্র। মুক্ত কৃষাণ, যে তার পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পেত, সে কর্মী হিসাবে ছিল শ্রমশীল। কিন্তু যে ক্রীতদাস তার পরিশ্রমের কোনো পুরস্কারই পায় না, ফলের বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ থাকা সম্ভব নয়। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য, জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য বা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য তার কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। সাধারণত বেত্রাঘাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য যতটুকু শক্তি ও আগ্রহ না দেখালে নয়—সে সেইটুকুই দেখাত।

দক্ষিণাঞ্চলে উন্নততর কৃষিপদ্ধতি এবং জটিল শ্রমনিবারক যন্ত্রাদির প্রচলন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ, ক্রীতদাসদের হাতে যন্ত্র দিলে তা' যে যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হবে তার বিশ্বাস ছিল না। সে শুধুমাত্র অতি-সরল এবং গুরুভার যন্ত্রপাতির যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারত। সুতরাং, ক্রীতদাস-প্রথা দক্ষিণাঞ্চলকে কয়েকটিমাত্র মুখ্য ফসলের কাজেই সীমিত রেখেছিল। ফলে, দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি।

ক্রীতদাস-ব্যবস্থাযুক্ত অঙ্গরাজ্যসমূহের বৃহৎ চাষীরাই দক্ষিণাঞ্চলের শাসক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং তাঁদের খুসী মাফিক সমাজটাকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অন্যান্য সব দেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের যে স্থান ছিল, তাঁরা মনে করতেন আমেরিকায় তাঁদের স্থান ঠিক তাই। একজন দক্ষিণ প্রান্তের সম্পন্ন চাষী বলেছিলেন, "খামারের কাজ এই দেশের একমাত্র স্বাধীন এবং সম্মানজনক পেশা।"

কিন্তু এই সম্পন্ন চাষীরা ছিল একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের ৩৫ লক্ষ ক্রীতদাসের মালিক পরিবারভুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার মাত্র শতকরা পঁচিশ ভাগ। ক্রীতদাস মালিক পরিবারসমূহের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল দশ

জনের কম। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশের যাঁরা ছিলেন অন্যের দশ বা ততোধিক ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল দশ জনের কম। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশের যাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে দশ বা ততোধিক ক্রীতদাসের মালিক (আনুমানিকভাবে এঁরা হলেন দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার শতকরা ৮'৫ ভাগ), সমগ্র নিগ্রো জনসংখ্যার বারো আনা অংশ তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন, আর সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতেন দক্ষিণের আয়ের একটা বৃহত্তম অংশ। এই ভাবে আর্থনীতিক ক্ষমতা একটা মুষ্টিমেয় ভদ্র সম্প্রদায়ের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল।

ক্রীতদাস-প্রথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক দুর্বলতা ছিল মূলধন সঞ্চয়নে অক্ষমতা। সম্পন্ন চাষীরাই ছিলেন একমাত্র শ্রেণী যাদের আয় ছিল প্রচুর, এবং তাঁরা তাঁদের সেই সম্পদ ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় ব্যয় করতেন। যেটুকু তারা সঞ্চয় করতে পারতেন তা' তাঁরা জমি এবং ক্রীতদাসে লগ্নী করতেন। একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় পত্রিকাব বিবরণ অনুসারে এই ব্যয়ের চক্র ছিল—"আরো তুলা উৎপাদন করে আরো অনেক নিগ্রো কেনা, আরো প্রচুর তুলা উৎপন্ন করা এবং আরো বেশী নিগ্রো কেনা"—এই নীতিভিত্তিক।

আফ্রিকার ক্রীতদাস-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হওয়ায় ক্রীতদাসের দাম ধীরে ধীরে বেড়ে চলে। অ-কৃষিমূলক কাজকর্মে ক্রীতদাস ব্যবহার এবং খামার-পদ্ধতির সম্প্রসারণের ফলে আমদানি এবং সরবরাহের মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হল। একমাত্র মাঠের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের যোগ্য নয়—এমন একজন দাসের দাম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৬৫০ ডলার, ১৮৫০-এর দশকে তার দাম বেড়ে হল ১,০০০ ডলার, আর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই দাম দাঁড়াল ১,২০০ থেকে ১৮,০০ ডলারে। ইতিমধ্যে, তুলার মূল্য অতিশয় নেমে গেল—পাউণ্ড প্রতি প্রায় ৯ থেকে ১২ সেণ্টে। এই ভাবে তুলার মূল্য এবং মাঠ-মজুরের ক্রয়মূল্যের অনুপাত এই ক'বছরে অনেক নেমে গেল। অধিকন্তু, এই জাতীয় লগ্নীর কাজ ছিল বিপজ্জনক। ক্রীতদাস যদি ক্রয়মূল্য এবং ভরণপোষণের খরচ শোধ হওয়ার উপযুক্ত যথেষ্ট কাজ করার পূর্বেই মারা যায়, তা'হলে সেই ক্ষতির বোঝাটা সম্পূর্ণ ভাবে পড়ে খামার-মালিকের কাঁধে।

সম্পন্ন চাষীরা কিন্তু দাস-ব্যবস্থার সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁদের মূলধন ক্রীতদাস বাবদ ব্যয় করার ফলে তাঁদের লাভের অঙ্ক নির্ভরশীল ছিল ক্রীতদাসদের আরো বেশীসংখ্যক ক্রীতদাস উৎপাদন করার ক্ষমতার উপর। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার না করে 'দাস বিক্রি' করে দিয়ে যন্ত্রশিল্পে অর্থ বিনিয়োগ

করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া, আবার ক্রীতদাসের মালিক হওয়াটা ছিল একটা সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার। সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সম্পন্ন চাষীরা আরো বেশীসংখ্যক ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্যই তাঁদের অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত হতেন।

সম্পন্ন চাষীরা ক্রীতদাস-প্রথার সংরক্ষণের সমর্থনে, ক্রীতদাস-প্রথাকে দক্ষিণাঞ্চলের একটা "বিশেষ প্রথা" বলে উল্লেখ করতেন। তাঁরা কিন্তু আর বলতেন না যে, এ একটা "প্রয়োজনীয় অথচ সাময়িক অশুভ ব্যবস্থা।" অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেক দক্ষিণাঞ্চলীয় মানুষ কিন্তু এ-কথা বলতেন। এর পরিবর্তে তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করে বলতেন, দক্ষিণের নিগ্রোরা শুধু ক্রীতদাস হওয়ারই যোগ্য এবং বহু উত্তরাঞ্চলীয় শ্বেতাঙ্গ মজুরের, নিগ্রোদের চাইতেও অনেক বেশী নিকৃষ্ট অবস্থা। তাঁরা দক্ষিণাঞ্চলীয় অভিজাত ঐতিহ্যকে সমর্থন করে বলতেন, যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতার এই হল একমাত্র উত্তম রক্ষাকবচ।

ভূমি এবং ক্রীতদাসে দক্ষিণাঞ্চলীয় মূলধনের একটা বৃহৎ অংশ এই ভাবে লগ্নী হওয়া দক্ষিণের মূলধন সঞ্চয়ের পথে একমাত্র বাধা ছিল না। এই মূলধনের অবস্থা আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল জটিল ঋণ-ব্যবস্থার ফলে, সম্পন্ন চাষীরা উত্তরের মহাজনের কাছে খাতক হিসাবে বাঁধা পড়েছিলেন। এই প্রথায় প্রতিটি গাঁট তুলায় মধ্যবর্তী দালালদের অনেক রকম কমিশনের বন্দোবস্ত ছিল। উপরন্তু, ঋণ-ব্যবস্থার দরুণ খাদ্যবস্তু, কাপড়চোপড় এবং কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের মানুষদের কাছে কেনার সময় চাষীদের বাধ্য হয়ে চড়া দাম দিতে হত। সম্পন্ন চাষীরা উৎপাদনের সময়, বিনা ঋণে এই সমস্ত বস্তু খরিদ করতে পারতেন না বলে এই প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার কোন সামর্থ্যই তাঁদের ছিল না। এর চেয়ে আবার বিশ্রী কাণ্ড, ফসল আগাম বাঁধা দেওয়া হত, সুতরাং বাজার দর মন্দা হলেও তুলা উৎপাদন থেকে সরে আসা তাঁদের পক্ষে কঠিন হত।

যেটুকু মূলধন দক্ষিণাঞ্চলের ছিল তা'ও আবার নানাদিকে ব্যয়িত হত। দক্ষিণাঞ্চলের জাহাজী কারবার ছিল না। ফলে, উত্তরাঞ্চলীয় জাহাজীরা দক্ষিণী মালের আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হত। দক্ষিণে উৎপাদন-শিল্প ছিল না, সুতরাং উত্তরাঞ্চলীয় উৎপাদন-শিল্পের মালিকগণ দক্ষিণের বাজারে কর্তৃত্ব করতেন। দক্ষিণে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, পশ্চিমের চাষীরা শস্য এবং শূকর-মাংস এমন এক কৃষিপ্রধান

অঞ্চলকে পাঠাত যা ছিল নিজের খাদ্য উৎপাদনেও অক্ষম। এই সব খাতে যখন মূল্য বৃদ্ধি পেল, তখন দক্ষিণাঞ্চলীয়রা তীব্র ভাবে অনুযোগ করতে লাগল। কিন্তু, পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন যখন রোধ করা সম্ভব নয় তখন চল্‌তি দরে দ্রব্যাদি না কিনে আর অন্য পথ কই? কিন্তু তার ফলে দক্ষিণের অর্থনীতি সর্বাংশে স্থাণু হয়ে ওঠেনি। তুলার রপ্তানী ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার মোট রপ্তানী মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশই তুলা রপ্তানী থেকে আদায় হয়। তা'ছাড়া, ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তামাকের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

কিন্তু তুলা এবং তামাকের চাষ অতি দ্রুত জমিকে অকেজো করে তোলে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণে অনেক পরিত্যক্ত খামার দেখা গেল। সম্পন্ন চাষীরা, যাঁরা ক্রীতদাস কেনায় প্রচুর অর্থ লগ্নী করেছিলেন, তাঁরা নতুন জমি সংগ্রহের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা আবার অভিযোগ করতে লাগলেন যে তুলার উৎপাদন বিশেষ চমকপ্রদ ভাবে বেড়ে উঠলেও তার বণ্টন-ব্যবস্থা উত্তরাঞ্চলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে লাভের পরিমাণ বড় কম হচ্ছে। উপরন্তু, উৎপাদন-ব্যয় তুলার দামের চেয়েও অতি দ্রুত বেড়ে চলল। খামারে ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার এবং মালের ভাড়া, আর ক্রীতদাসের দাম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর অতিশয় বেড়ে গেল। ক্ষুদে চাষীদের কাছে এই বর্ধিত ব্যয় বিশেষ ভার হয়ে উঠল।

এই সমস্ত সমস্যার ফলে দক্ষিণাঞ্চল তার এক-ফসলী অর্থনীতির অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হল। ১৮৪০ এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চল তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য সচেতন হয়ে উঠল, কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে এবং স্থানীয় উৎপাদন শিল্পের প্রাণসঞ্চারে সচেষ্ট হলেন। এই সব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তরাঞ্চলের হাত থেকে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু স্থানীয় শিল্পের উন্নতি, সম্পন্ন চাষীদের শহরের ব্যবসায়ীদের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে ব্যাহত হল। এ ছাড়া, দক্ষিণাঞ্চলে, সম্পদ মুষ্টিমেয়সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সমৃদ্ধিশালী ছোট চাষীদের মধ্যে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের একটা স্থানীয় বাজার গড়ে ওঠার পথে বাধার সৃষ্টি হল।

স্থানীয় বাজারের এই অভাবের ফলে আর একটি হানিকর প্রতিক্রিয়া ঘটল; এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের আমদানীর পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে অনেক

কম থেকে গেল। গৃহযুদ্ধের আগের দশকে জাতির রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ তখনও নিউ অরলিন্স থেকে হত, কিন্তু এই বন্দর দিয়ে আমদানির পরিমাণ ছিল একের পঞ্চদশাংশ। আলাবামা রাজ্যের মোবইল ছিল একটি বিশাল দক্ষিণাঞ্চলীয় তুলার বন্দর। কিন্তু এই বন্দর দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কিছুই আমদানী হত না। এই ভাবে দক্ষিণকে তার তুলা নিউ ইয়র্কে জাহাজ বোঝাই করে পাঠাতে হত, তারা আবার এই তুলা ইউরোপে পাঠাত। অন্যথায় ইউরোপ-গামী দক্ষিণাঞ্চলীয় জাহাজগুলিকে শূন্য খোল নিয়ে ফিরতে হত। উপরন্তু, শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই জাহাজ কোম্পানী চালাবার উপযুক্ত মূলধন ছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই তুলা-সাম্রাজ্যের মাটি একেবারে ঊষর হয়ে এল অপটু ক্রীতদাস-প্রথার চাপে এবং মাটিকে পুনরায় সারযুক্ত করাব মত আর্থিক অক্ষমতার জন্য। তখন দক্ষিণকে আবার নতুন জমি সংগ্রহ করতে হবে, নতুবা তুলা-অর্থনীতির আরো অবনতি দেখতে হবে, এবং সেই সঙ্গে ক্রীতদাস-প্রথাও ভেঙে পড়বে—এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হল।

দাসপ্রথার সম্প্রসারণবিরোধী উত্তরের মানুষরা রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণের মানুষকে নতুন করে দাসরাজ্য অধিকারে বাধা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। সেনেটে ক্রীতদাস এবং স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে যে অস্থায়ী ভারসাম্য ছিল তা' ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিয়নে সংযুক্ত হওয়ায় লুপ্ত হয়। এর সামান্য কিছুকাল পরেই অরিগন ও মিনেসোটা স্বাধীন রাজ্য হিসাবে যুক্ত হল। 'হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভ'-এ এই ব্যবধান বিস্তীর্ণতর হল। প্রতি তিন জন ক্রীতদাস রাজ্যের প্রতিনিধির বিপক্ষে স্বাধীন রাজ্যগুলি থেকে প্রায় পাঁচ জন প্রতিনিধি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের দশকের প্রথম দিকের ব্যবস্থা পরিষদে এসেছিলেন।

দক্ষিণ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল তা' ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট: জাতীয় আইন সভায় প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে দক্ষিণের বিশেষ ব্যবস্থা বজায় রাখা যায় এবং তার আর্থনীতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায়। পরিবর্তন অথবা যুদ্ধ—এই দু'য়ের একটাকে বেছে নিতে দক্ষিণ বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তাতে এই দক্ষিণাঞ্চল যুদ্ধ করাটাই স্থির করল। কিন্তু তাতে তাকে দ্বিবিধ পরাজয় বরণ করতে হল—প্রথমতঃ যুদ্ধে তাব পরাজয় হল, আর দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ায় তার এতদিনের সযত্নলালিত ঐতিহ্য ধুয়ে মুছে গেল।

আলামো থেকে এ্যাপোমাটক্স

এই সংঘর্ষে আমার প্রধান লক্ষ্য এই যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করা, ক্রীতদাস-প্রথাকে রক্ষা করাও নয়, ধ্বংস করাও নয়। যদি কোনও ক্রীতদাসকে মুক্ত না করেও যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারি, তা'হলে তা'ই করব; আবার যদি কিছুসংখ্যক ক্রীতদাসকে মুক্ত করে, কিছু বাকী রেখে যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচাতে পারি তা'হলে আমি তা'ই করব।

—এব্রাহাম লিনকন, ১৮৬২

তুলা-সাম্রাজ্যের মুরুব্বীরা দেখলেন, টেকসাস্‌ই তাদের সীমানাকে সম্প্রসারণ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দক্ষিণাঞ্চল থেকে বসতিকামী মানুষ এসে টেকসাসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সেই অঞ্চলটি তখনও কিন্তু মেকসিকোর অধীন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সেই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ছিল মার্কিন মূলভূমি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত মানুষ। মেকসিকান সরকারকে উপেক্ষা করার পক্ষে এইটুকুই তাদের যথেষ্ট শক্তি দান করল; তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, টেকসাস্‌ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল।

সান্তা আনার নেতৃত্বে একটি সৈন্যদলকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠালেন মেকসিকো সরকার। এই যুদ্ধের সর্বাধিক খ্যাত একটি ঘটনা হল মেকসিকান বাহিনীর একটা বেশ বড় দল আলামো নামক একটি ক্ষুদ্র টেকসাস্‌ সৈন্য ঘাঁটিতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের নৃশংস ভাবে হত্যা করে। রণহুঙ্কারে "রিমেমবার দি আলামো" বা 'আলামোকে স্মরণ করো' এই ধ্বনি দ্বারা উত্তেজিত টেকসানরা কিন্তু সান জ্যাসিণ্টোর রণক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে সান্তা আনার সৈন্যদলকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলল। এই ভাবে টেকসাসের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রইল এবং নবগঠিত প্রজাতন্ত্র কালবিলম্ব না করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানালো।

উত্তরাঞ্চলের প্রচলিত মনোভঙ্গী ছিল এই যে, আর একটি ক্রীতদাস-রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে টেনে আনার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা কৌশলে এই ভাবে একটা কৃত্রিম স্বাধীনতা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। ফলে, টেকসাসের

অন্তভু ক্তির জন্য আনিত বিলটিতে উত্তরাঞ্চলীয় সেনেটরগণ প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট টাইলারের চাপে বিলটি চূড়ান্ত ভাবে পাশ হল। ভার্জিনিয়াবাসী টাইলার ছিলেন ক্রীতদাসত্ব-প্রথার অনুকূলে।

এক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র মেকসিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল টেকসাসের দাবীর সমর্থনে যে রাইও গ্রাণ্ডে পর্যন্ত তার সীমানা। উত্তর-পূর্ব এই যুদ্ধের অতিশয় বিরোধী ছিল, কিন্তু দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চল এই যুদ্ধ প্রাণপণে সমর্থন করল। দু' বছর কাল প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রণক্লান্ত মেকসিকোর পক্ষে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করা ভিন্ন আর কোনো পথ রইল না এবং তার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি তাকে ছাড়তে হল। এই অঞ্চলটুকুর জন্য যুক্তরাষ্ট্র মেকসিকোকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দিল, এই অঞ্চলের অন্তর্গত হল টেকসাস এবং পরে যা ক্যালিফোর্ণিয়া, নিউ মেকসিকো এবং আরিজোনা হয়। তা'ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র মেকসিকোর কাছে প্রাপ্য যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ৩২৫,০০০০ ডলার দাবী-দাওয়া নিজের কাঁধে তুলে নিল।

মেকসিকান যুদ্ধের পর দক্ষিণাঞ্চল এই সব নব-অধিকৃত অঞ্চল এবং লুইসিআনায় ক্রয়-করা যে সব অঞ্চল তখনও পর্যন্ত রাজ্যে পরিণত হয় নি, সেইগুলিকে ক্রীতদাস-ব্যবস্থাযুক্ত রাজ্যে পরিণত করার জন্য আন্দোলন শুরু করল। ইলিনয়ের সেনেটের ষ্টিফেন ডগলাসের পরিকল্পনাটিও এই একই সঙ্গে উত্থাপিত হল। লুইসিআনার ক্রয়-করা বিরল বসতিসমূহকে সংগঠিত করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র মহাদেশে রেলপথ বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মনে।

উত্তরাঞ্চলীয় শিল্পপতিরা, বিশেষ করে শিকাগোর ভূম্যধিকারীরা ডগলাসকে ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড সমর্থন দান করেছিলেন। কারণ, দ্রুত-উন্নতিশীল শিকাগো হবে প্রস্তাবিত রেলপথ জালের স্বাভাবিক কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ডগলাসের পক্ষে কানজাস-নেব্রাস্কা অঞ্চলকে রাজ্য হিসাবে সংগঠনের জন্য দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থনেরও প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মিজুরি আপোষের অন্তর্গত ধারানুযায়ী মিজুরি একটি ক্রীতদাস রাজ্য হিসাবে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। কানজাস্-নেব্রাস্কা অঞ্চলসহ ৩৬° ৩০' অক্ষাংশের উত্তরস্থ লুইসিআনার বাকী অংশ ক্রীতদাস-প্রথা থেকে মুক্ত থাকবে—এই স্থির ছিল। এই অঞ্চলে পশ্চিমী সম্প্রসারণ দক্ষিণের কাছে কিছুতেই প্রীতিপদ হতে পারে না।

ডগলাস এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিখ্যাত কানজাস-নেব্রাস্কা বিলটি উত্থাপন করলেন। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল মিজুরি আপোষের ধারাগুলি বাতিল করা এবং নতুন অঞ্চলে একটি "স্কোয়াটার সভারেনিটি" বা বসবাসকারীদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এর অর্থ এই যে, বসতিকামীরা যুক্তরাষ্ট্রে তারা মুক্ত কিংবা দাস কোন হিসাবে আসবে তা' স্থির করার অধিকার পাবে। সমগ্র অঞ্চলটি কানজাস এবং নেব্রাস্কা—দু' ভাগে বিভক্ত করা হবে এই আশায় যে উত্তরাঞ্চলীয়গণ নেব্রাস্কা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয়গণ কানজাসে আধিপত্য বিস্তার করবে।

দক্ষিণের সেনেটরগণ এই বিলটিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, কিন্তু অনেক পশ্চিমী সেনেটার তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। মধ্য-পশ্চিমের কৃষকের কাছে পশ্চিমাভিমুখে সম্প্রসারণ ছিল এক রকম মৌলিক বিধান। এই সময়ের মধ্যে এই কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য ভূমিনীতির অর্থ দাঁড়াল নিষ্কর ১৬০ একার বাস্তু জমি লাভ করা। একথা বিচার করার জন্য কোনো উচ্চশ্রেণীর গণিততত্ত্বের প্রয়োজন নেই যে পশ্চিম প্রান্তে যদি কয়েক শত একার জমি প্রতিটি খামারকে দেওয়া হয় তা'হলে তার অর্থ হবে যে মুক্ত বসতিকামীদের পক্ষে অনেকগুলি বাস্তুভূমি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমাঞ্চলের চাষীরা তেমন দাসত্ববিরোধী ছিল না। তারা কিন্তু তার চেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছে যে দাস এবং ১৬০ একারের খামার—এই দু'য়ের মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি নেই।

তীব্র বিতর্কের মধ্যে কানজাস-নেব্রাস্কা এ্যাক্ট ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাশ হল। তার ঠিক পরেই উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে হাজারে হাজারে বসতিকামীর দল কানজাসে এসে দাস-ব্যবস্থার ব্যাপারে সেখানকার ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে লাগল। এর ফলে ক্রীতদাসত্বের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কানজাস বসতিকারীদের মধ্যে একটা রক্তাক্ত সংঘর্ষ সুরু হল। বহু পরাজয়ের পর ক্রীতদাসত্ব-বিরোধীরা ভাবাবেগমিশ্রিত এক তীব্র সংঘর্ষে অনুপ্রাণিত হয় জন ব্রাউন নামক জনৈক ক্রীতদাসত্ব-বিরোধীর প্রেরণায় এবং জয়লাভ করে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কানজাস একটি মুক্ত রাজ্য হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

কানজাস-নেব্রাস্কা এ্যাক্ট পাশ হওয়ার ফলে, এবং উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলের উন্নতির প্রতিরোধের জন্য দক্ষিণী চেষ্টার ফলে এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হল। এই সব অঞ্চলে দাসত্ব-সংক্রান্ত প্রশ্ন তখন জাতীয় প্রশ্নে পরিণত

হল। দক্ষিণ এবং উত্তরের ডেমোক্রাটরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে বিজড়িত হওয়ায় ডেমোক্রাটিক পার্টির জাতীয়তাবাদী আকৃতি লোপ পেল এবং একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টির জন্ম হল। (জেফারসনের কালের রিপাবলিকান পার্টি অনেক আগেই ডেমোক্রাট-রিপাবলিকান বা ডেমোক্রাটিক পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।)

ইলিনয়ের একজন হাড়-উঁচু তরুণ ব্যবহারজীবি এব্রাহাম লিঙ্কন এই নতুন দলের নেতাদের অন্যতম ছিলেন। নতুন অঞ্চলগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিঙ্কন তাঁর দলের কাছে এমন একটি রাজনৈতিক আদর্শ খাড়া করলেন, যার ফলে উত্তর এবং পূব—তুই অঞ্চল থেকে প্রচুর সমর্থক এই দলটির প্রতি আকৃষ্ট হল। এই নতুন রাজনৈতিক দলটির অভ্যুদয়ের ফলে ক্রীতদাস সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হতে শুরু করে। এই সমস্যা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে মূলতঃ নৈতিক এবং অরাজনৈতিক সমস্যা বলে বিবেচিত হত। পশ্চিমী কৃষক, যে-সব ছোট ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং শরণাগত দাসপ্রথার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আতঙ্কিত ছিল, তারা সবাই এই নতুন দলটির পিছনে এসে দলে দলে হাজির হল।

ধীরে ধীরে এব্রাহাম লিঙ্কনের মূর্তি এই সব জনগণের প্রবক্তা হিসাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ইলিনয়ের পিওরিয়ায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাষণ দান কালে লিঙ্কন জোর দিয়ে বললেন যে, এই সব অঞ্চল "মুক্ত শ্বেতাঙ্গের বাসস্থান" হিসাবে চিহ্নিত। "কিন্তু তা হবে না"···তিনি বলে চলেন, "···যদি ক্রীতদাস-প্রথা তার মধ্যে এনে বসানো হয়। দাসরাজ্যগুলি এমন সব রাজ্য যেখান থেকে দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের সরিয়ে আনা দরকার। এই সব রাজ্যে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করতে পারবে না। নতুন মুক্ত রাজ্যগুলি দরিদ্র মানুষদের অবস্থার উন্নয়নের সুবিধা দানের জন্য হয়েছে। এই প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজন এই সব অঞ্চলগুলি।" দু' বছর পরে লিঙ্কন আবার যোগ করলেন: "আমাদের বরং দাসরাজ্যগুলির চারপাশে একটা বেষ্টনীর সৃষ্টি করা উচিত। তখন এই ঘৃণিত প্রথা, সরীসৃপ যেমন আপন বিষেই ধ্বংস হয়, তেমনই আপন কলঙ্কের বিষে ধ্বংস পাবে।"

তাঁর এই জাতীয় সরল ওজস্বিতা এবং সুচিন্তিত অভিমতের জন্য লিঙ্কন ১৮৬০ সালের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান দলের

মনোনয়ন পেলেন। নির্বাচন অভিযানে রিপাবলিকান দলের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র ছিল তাদের অনমনীয় দাসপ্রথার সম্প্রসারণবিরোধী মনোভাব। এ-ছাড়া রিপাবলিকান দলের নিকর ভূমি দান, রক্ষণমূলক শুল্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উদ্যোগে রেলপথসহ অন্যান্য আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির জন্য উত্তরাঞ্চলের বহু নতুন অনুগামী এই দলে যোগদান করে। ডেমোক্রাটিক দল উত্তর এবং দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পড়ায় রিপাবলিকানদের নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠল, এবং দক্ষিণাঞ্চল ইউনিয়নের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটি উদ্ধার-সম্ভাবনাহীন সংখ্যালঘুর স্থান লাভ করল। এই অসহনীয় অবস্থার জবাবে গর্বিত দক্ষিণীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "কন্‌ফেডারেট ষ্টেটস অব আমেরিকা" প্রতিষ্ঠা করল। নিঃসন্দেহে দক্ষিণের অনেকেই আশা করেছিলেন যে, এই বিচ্ছিন্নকরণ বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটে যাবে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের কাছে দক্ষিণ প্রান্তের এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা বিদ্রোহের সমতুল্য বিবেচিত হল। লিঙ্কন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বেশ জোর দিয়ে জানালেন যে, দক্ষিণাঞ্চলে সরকারি কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাটাই তাঁর কর্তব্য। "আমার বিবেচনায়...এই যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছিন্ন; আমার সামর্থ্যানুসারে আমি তার সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকব ...আমি দেখব যেন যুক্তরাষ্ট্রের আইনগুলি সব ক'টি অঙ্গরাজ্যে সমভাবে প্রযুক্ত হয়।"

গৃহবিপ্লবের যে আশংকা এতদিন ধরে জাতির উপর কালো মেঘের মত ছেয়ে ছিল তা' শেষ পর্যন্ত প্রকট হল, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ফোর্ট সুমটারে। সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় দুর্গের অধিনায়ক প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের আদেশ-অনুসারে, তার পদাধিকার কন্‌ফেডারেট সরকারের কাছে সমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন। কন্‌ফেডারেট এর জবাবে কেল্লার উপর একটি কামান দাগলেন। এই তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশে যুদ্ধের পূর্ণ বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল।

প্রবল সংঘর্ষের জন্য দু'টি যুযুধান দল যখন সকল শক্তি সমাবেশ করল তখন দেখা গেল তা' অসহায় ভাবে অসম। কন্‌ফেডারেট ষ্টেট বা রাজ্যগুলিতে মাত্র নব্বই লক্ষ মানুষ (৩৫ লক্ষের অধিক ক্রীতদাস সহ) বাস করত, আর যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। মোট ১৬শ' কোটি ডলার সম্পত্তিমূল্যের মধ্যে, কন্‌ফেডারেসি ছিল মাত্র ৬শ' কোটি ডলারের অধিকারী—এর এক-তৃতীয়াংশ ছিল ক্রীতদাসের মূল্য। দক্ষিণের

বস্তুতঃ কোনো রকম জাহাজ ছিল না, শিল্পোৎপাদন-সংক্রান্ত যন্ত্রাদির পরিমাণ দক্ষিণের ছিল জাতির মোট যন্ত্রপাতির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ আর মোট রেলপথ মাইলসংখ্যার বড় জোর এক-তৃতীয়াংশ।

এই দুর্বলতার মুখে লড়াই করার জন্য উত্তরকে আমন্ত্রণ জানানোটা দক্ষিণের পক্ষে নিছক মূর্খামির পরিচায়ক। কিন্তু অনেকগুলি বিষয় ছিল দক্ষিণের অনুকূলে। দক্ষিণী সমাজ ছিল সমরনীতির দিক থেকে অনেকটা উপযুক্ত; তার উপর দক্ষিণাঞ্চলে সমরকৌশলে শিক্ষিত অফিসারের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী, তাদের পিছনে ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সরকারি সহানুভূতি এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ—একটা বিশেষ ধরনের সভ্যতাকে রক্ষা করার প্রেরণা দক্ষিণের ছিল।

সমর পরিচালনে উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। উত্তরাঞ্চলের সম্পদ-প্রাচুর্য অনেক বেশী থাকায় সেখানকার নেতৃবৃন্দ ধরেই রেখেছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। উত্তরের প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষিণের উচ্চশ্রেণীর মানসিক দৃঢ়তা সংযুক্ত ভাবে বোধ হয় এই যুদ্ধ, চারটি রক্তাক্ত বছর ধরে চালু থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ হেতু।

উত্তর এবং দক্ষিণ দুই পক্ষই ঋণ করে, করভার বসিয়ে এবং কাগজী টাকা বাজারে ছেড়ে যুদ্ধের খরচ চালিয়েছেন। এই সব পদ্ধতি উত্তরে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করে। সেখানে সরকারি বণ্ডকে জনপ্রিয় করে দু'শ কোটিরও বেশী পরিমাণ ডলার ওঠানো সম্ভব হয়। আবগারি কর, আমদানি শুল্ক এবং আয়কর—এই সব কর-ব্যবস্থার ফলে আরও ৬৬৭ শত কোটি ডলার পাওয়া গেল। কনফেডারেটের বণ্ড কিন্তু তেমন সাফল্য লাভ করল না; অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে বণ্ড ক্রয় করা যেত, ফলে সরকারের হাতে অচিরাৎ প্রচুর পরিমাণে তুলা, তামাক এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি এসে জমতে লাগল। দক্ষিণাঞ্চলের কর-ব্যবস্থাও ছিল মোটামুটি হতাশাজনক। অনুমান করা যায় যে, কন্‌ফেডারেসির কর বাবদ মোট আদায়ের পরিমাণ ১০ কোটি ডলারের বেশী হয়নি। উভয় সরকার কর্তৃক প্রচারিত কাগজের মুদ্রার ফলে উত্তর এবং দক্ষিণে সাধারণ ভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল। যুদ্ধের শেষে উত্তরাঞ্চলের "গ্রীণব্যাক" ডলারের মূল্য চল্লিশ সেণ্টে নেমে এল। কিন্তু তা'হলেও দক্ষিণাঞ্চলে, উত্তরের কাগজী নোট, নোটের গায়ে

লেখা দামের চেয়ে বেশী দামে চলতে লাগল এবং কনফেডারেসির কাগজী মুদ্রা অতি দ্রুতগতিতে সেখানে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে উঠল।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধিরা জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অনুপস্থিত থাকায় উত্তরের অর্থনীতি বিনা বাধায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে দেশের বাণিজ্যিক এবং শিল্পগত উন্নয়নের পক্ষপাতী মতাদর্শের চূড়ান্ত বিজয় ঘোষিত হয়। চড়া হারে শুল্ক বসানো হল, আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ কোম্পানীগুলিকে ফেডারেল সরকারের অর্থসাহায্য দেওয়া হল, জাতীয় ব্যাঙ্কিং প্রথা দ্বারা রাজ্য ব্যাঙ্ক পদ্ধতি লোপ করা হল, এবং পশ্চিমা কৃষককুলের এতদিনের প্রত্যাশিত বাস্তুভিটা আইন (হোমষ্টিড এ্যাক্ট) এইবার চূড়ান্ত ভাবে পাশ হল। উত্তরাঞ্চলীয় বাণিজ্যিক সম্প্রদায় এবং পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ী কৃষিকুলের মধ্যে বোঝাপড়া আগের চেয়ে অনেক সুদৃঢ় হয়ে উঠল।

গৃহযুদ্ধের ফলে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রীতদাস-প্রথাও যুক্তরাষ্ট্র থেকে উঠে গেল এবং দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতির রূপান্তর ঘটল। সব চুকে যাওয়ার পরও যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি বেশ কয়েক পুরুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিল। তার অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তার এত আদরের সামাজিক প্রথা ভেসে গেল, আর যে কনফেডারেসির পুণ্য আদর্শের জন্য দক্ষিণ এত ক্লেশ স্বীকার করেছে, এত আত্মত্যাগ করেছে তার চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে গেল। এখন শুধু পুনর্গঠনের মন্দগতি বেদনাময় কর্তব্য হাতে রইল।

উদারহৃদয় লিঙ্কন যুদ্ধজনিত ক্লেশের বেদনা তীব্র ভাবে অনুভব করলেন এবং দক্ষিণাঞ্চলের ক্লেশভার লাঘব করার জন্য চেষ্টা করলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রদত্ত তাঁর দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণের শেষাংশ এই মনোভাবের পরিচায়ক: "কারো প্রতি অসূয়ার ভাব না মনে রেখে, সকলের প্রতি করুণার দৃষ্টি রেখে, ঈশ্বরের করুণায় যা কিছুকে আমরা ন্যায় বলে উপলব্ধি করি তার প্রতি অটুট নিষ্ঠা মনে রেখে, যে কাজে আমরা ব্রতী সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। জাতির ক্ষতকে আজ বাঁধতে হবে, যারা যুদ্ধের ভার সহ্য করেছে তাদের জন্য, তাদের বিধবা স্ত্রী এবং অনাথ সন্তানের জন্য, যা কিছু করণীয় তা' সবই করতে হবে, আর আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্য সব জাতির সঙ্গে একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমাদের করতে হবে।"

কিন্তু তিক্ততাহীন মনোভাব নিয়ে এই দেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নেতৃত্বে যে পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তা' পূরণ করা যায়নি। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লিঙ্কনের বেদনাদায়ক হত্যার ফলে শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং সামান্যতম অসূয়ার ভাব মনে না নিয়ে জাতির দ্বিতীয় জন্মের সকল আশা নির্মূল হল। যুদ্ধে ক'টি অন্ধকার বৎসরে যিনি জাতিকে নিরাপদে পরিচালনা করেছেন সেই লিঙ্কন ইউনিয়নের শিখরদেশে উপস্থিত থাকলেও কাজটা সম্পন্ন করা যথেষ্ট কঠিন হত। তাঁর অবর্তমানে এই কাজ একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

পুনর্গঠন ও পুনরুত্থান

সেই মহান মুক্তিদাতার হত্যার ফলে উপরাষ্ট্রপতি এনড্রু জনসন হোয়াইট হাউসে এলেন। তাঁর বাসনা ছিল দক্ষিণাঞ্চলের জন্য একটা পুনর্গঠনের কার্যসূচী গ্রহণ করা যা লিঙ্কনের পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গতিযুক্ত। কিন্তু জনসন উগ্র রিপাবলিকানদের কথা বিবেচনা না করেই এই সংকল্প করেছিলেন। এই উগ্র রিপাবলিকানরা কিন্তু দক্ষিণের কাছ থেকে বিদ্রোহের পূর্ণ মূল্য আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

কংগ্রেসীয় মনোভঙ্গী যতই চরমপন্থী অভিমতের দিকে ঝুঁকতে থাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের সংঘর্ষ ততই তিক্ত হয়ে ওঠে। পরিশেষে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসনের বিরুদ্ধে সরকারি পদের অযোগ্য আচরণের অভিযোগ আনা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইনিই প্রথম এবং একমাত্র প্রেসিডেন্ট যাঁর বিরুদ্ধে ইম্‌পিচমেন্ট আনা হয় এবং জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদের উচ্চতর সভায় যাঁর বিচার হয়। অনেক উত্তপ্ত বিতর্কের পর সেনেট একটি মাত্র ভোটের জন্য জনসনকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করতে অক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে, এক পুনর্গঠন কার্যসূচী দক্ষিণকে নতজানু হতে বাধ্য করে। এই কার্যসূচী অনুসারে উত্তরের সৈন্যদল দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে রইল, 'ওল্ড সাউথ' দলের রক্ষণশীলদের রাজ্যসমূহের আইনসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হল, এবং নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হল। এই সব কিছুর প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

যে-সব অনভিজ্ঞ প্রাক্তন ক্রীতদাসকে সহসা রাজনৈতিক পদে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তারা অতি সহজেই উত্তরাঞ্চলীয় অবিবেচক রাজনীতিকদের শিকারে পরিণত হল। তাঁরা এই এলোমেলো অবস্থা থেকে যতদূর সম্ভব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে লাগলেন। রাজ্য এবং মিউনিসিপাল কোষাগার-সমূহ লজ্জাকর অমিতব্যয়িতায় শূন্য হয়ে উঠল। জালিয়াতি এবং উৎকোচ গ্রহণ প্রবল হয়ে উঠল। প্রাক্তন কন্‌ফেডারেসির এগারোটি রাজ্যের ওপর প্রচণ্ড ঋণভার চাপানোর প্রস্তাব করা হল। তাদের ঋণের অঙ্ক ১৮৬৮ থেকে ছ' বছরে ১০ কোটি ডলারেরও বেশী বেড়ে গেল।

যাই হোক, চাপে পড়ে যে-সব নতুন সংবিধান দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেগুলি ছিল পূর্বেকার সংবিধানসমূহের চেয়ে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক। কালক্রমে এই সব সংবিধান একটি সুযোগ্য শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করল। দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে প্রগতিশীল আইন প্রবর্তন করা হল, অবৈতনিক সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং নিগ্রো চাষীদের সাহায্যদান ব্যবস্থা তার অন্তর্গত। যদিও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি তখনও বেশ স্থূল ছিল, তথাপি এই ভাবে গণতন্ত্র চালু হল।

এই সব সামাজিক উন্নয়ন সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রযুক্ত পুনর্গঠন কার্যসূচী যে অসফল হয়েছিল তা' মানতেই হবে। নাগরিক অধিকার বেয়নেট প্রয়োগে চাপাতে গিয়ে নিঃসন্দেহে যে জাতিগত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা' হয়ত ধীরে ধীরে বিদূরিত করা সম্ভব হত, যদি প্রাক্তন ক্রীতদাসদের স্বাধীনতার দায়িত্ব ও সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে অবহিত করা হত। অধিকন্তু, পুনর্গঠন-জনিত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণাঞ্চলীয় মানুষ রিপাবলিকান পার্টির বিরোধীতে পরিণত হল। এই ভাবে উত্তর-গৃহযুদ্ধকালীন পুনর্গঠন নীতির ফলে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল ডেমোক্রাটিক দলেব এক দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলে জাতিবিদ্বেষের মনোভাব এমন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে যে, এখনও পর্যন্ত তা' মুছে যায়নি।

দক্ষিণের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ ছিল জমিকে উৎপাদনমূলক কর্মে নিয়োগ করা। চূর্ণিত ক্রীতদাস-প্রথা এই কাজটিকে জটিল করে তুলল। রাতারাতি প্রাক্তন ক্রীতদাসগণকে বন্ধনমুক্ত কবা হল, কিন্তু দাসেরা স্বাধীনতার অর্থ করে নিল কিছু না করার অধিকার। এদিকে মজুরের অভাবে জমি অকর্ষিত পড়ে রইল—ভ্রাম্যমান নিগ্রোরা গ্রামাঞ্চলে তাদের 'অধিকার' পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে লাগল।

এমন কি যখন অশান্ত নিগ্রো শ্রমিকরা তাদের ঘরে ফিরে এল, তখন সমস্যা দেখা দিল কি ভাবে তাদের বেতন দেওয়া হবে অতি সামান্য খামার-মালিকেরই মজুরের বেতন দেওয়ার মত অর্থ ছিল। এর ফলে, 'শেয়ারক্রপিং' বা ভাগচাষ-প্রথা এক বিশিষ্ট ধরনের কৃষি-ব্যবস্থায় পরিণত। হল এই ব্যবস্থানুসারে জমিদার কোনো বেতন দিতেন না, মজুর জমির জন্য কোনো খাজনা দিত না এবং দু'জনেই ফসল ভাগাভাগি করে ভোগ করত। এ-সব সত্ত্বেও জমির মালিককে প্রায়ই বীজ, যন্ত্রপাতি এবং অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য

অর্থ ঋণ করতে হত। এই ভাবে, প্রাক্-যুদ্ধকালীন ফসল বন্ধকী-প্রথা আগের চেয়ে অনেক প্রবল ভাবে দক্ষিণের অর্থনীতিতে কায়েম হয়ে উঠল।

ভাগচাষের অনেক রকম অসুবিধা ছিল। তুলার অতিরিক্ত উৎপাদন ছিল একটা নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা, এবং নিঃসন্দেহে তার প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষিত হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা দক্ষিণের ভূমি আবার কৃষিকর্মের আওতায় এল।

খামারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় খামার আভিজাত্যের অন্তর্ভুক্ত অনেককে জীবিকার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হল। এর অন্যতম ফল এই হল যে, সমবেত প্রচেষ্টা শিল্প-সংগঠনে প্রযুক্ত হল। যদিও মূলধনের অপ্রতুলতা দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের পক্ষে তাদের আঞ্চলিক সম্পদের উন্নয়ন প্রয়াসে এক প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল, তবু শিল্পোন্নয়নের জন্য কলকারখানা স্থাপনে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হল। আলাবামা রাজ্যের বার্মিংহাম ছিল যুদ্ধের আগে একটি প্রধান তুলা-উৎপাদন কেন্দ্র। কিন্তু অচিরে এই স্থান লৌহ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হল। তুলাজাত বস্ত্রাদি, লৌহ এবং ইস্পাত, কাঠের ব্যবসা, আসবাব নির্মাণ এবং তামাক তৈরীর কাজ দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় একশ' কোটি ডলার দক্ষিণের উৎপাদন শিল্পগুলিতে লগ্নী করা হয়েছিল।

সমগ্র দেশেও কলকারখানা স্থাপনের ধুম পড়ে গেল। গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে, নিউ ইংলণ্ডের কিছু অংশ এবং মধ্য-অতলান্তিক রাজ্যগুলি ব্যতীত এই দেশ ছিল মূলতঃ কৃষি এবং বাণিজ্যপ্রধান। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য অতিক্রম করে গেল। দশ বছর পরে তা' প্রায় দ্বিগুণিত হল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পজাত দ্রব্যাদির মোট মূল্য ছিল ১৯০ কোটি ডলার। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তা' বেড়ে এই সংখ্যার সাত গুণে পরিণত হল।

কোনো রাজ্য কোনো প্রকার আইন প্রণয়ন বা জারি করবে না যদ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুবিধা বা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়; কিংবা কোনো রাজ্য কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে, আইনের যথাবিহিত বিধি অনুযায়ী ভিন্ন বঞ্চিত করতে পারবে না।…

—সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী, ১৮৬৮

বিংশ শতাব্দীর সূচনার পূর্ববর্তী দুই দশকে কয়লা উৎপাদনের হার বাৎসরিক ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় তার চতুর্গুণ হয়ে উঠল। ঐ একই কালে, পরিশ্রুত তেলের পিপার সংখ্যার বাৎসরিক হার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেল, প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তামা খনি থেকে ওঠানো হত তা' প্রায় দশগুণ বেড়ে গেল। আর লৌহ এবং ইস্পাতী দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন চতুর্গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৩ কোটি টনে পৌছোল।

এই শিল্পগত সমৃদ্ধির পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল রেলপথের সম্প্রসারণ। ১৮৪৩ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত কালটিকে "দি এরা অব রেলরোড ক্যাপিটালিজম" বা "রেলপথ ধনতন্ত্রের যুগ" বলা যায়। এই পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে মার্কিন রেলপথ-ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম হয়ে ওঠে। রেলপথের দৈর্ঘ ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে, আর এদিকে লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১২০ কোটি ডলার থেকে ৩৭০ কোটি ডলারে পৌছোয়। ১৮৮০র বছরগুলিতে আরও ৭৩,০০০ মাইল রেললাইন বিস্তারিত হয়, আর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের সব কয়টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত রেলপথেরও অধিক মাইল রেলপথের অধিকারী হয়ে দাঁড়াল যুক্তরাষ্ট্র।

রেলপথ শুধু মাল-চলাচলের উপযোগী যানের চেয়েও অনেক বেশী কিছু, রেলপথ স্বয়ং একটা বিশাল বাজারস্বরূপ। ১৮৭০-এর দশকে জাতির মোট সঞ্চিত মূলধনের শতকরা কুড়ি ভাগ আসত রেলপথ থেকে আর ১৮৮০র দশকের বছরগুলিতে তার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা পনের ভাগে। রেলপথের জন্য ইঞ্জিন, গাড়ি, যন্ত্রপাতি, লোহা এবং ইস্পাত, কাঠ এবং কয়লা প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন, তাই রেলপথের প্রসার অন্যান্য বহুপ্রকার যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নে প্রেরণা যোগাল। জাতীর আয়ের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে গেল, এবং প্রসারশীল মজুর-বাহিনীর জন্য অনেক নতুন চাকরির সৃষ্টি হল; এই বর্ধিত আয়ের ফলে ভোগ-সামগ্রীর শিল্পগুলিও সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

সম্পূর্ণ ভাবে শুধু রেলপথের প্রয়োজনেই যে-সব বিরাটাকার শিল্প গড়ে উঠেছিল ইস্পাতের কারখানা তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন ইস্পাতের ¾ অংশ রেলপথে ব্যবহৃত হত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্পাতের মালগাড়ী রেলপথের বহনক্ষমতা বাড়িয়ে দিল। পুরানো কাঠের গাড়ীর বহনক্ষমতা ছিল ৭ কি ৮ টন। কিন্তু নতুন ইস্পাতের গাড়ীর বহন-

ক্ষমতা ছিল ৩০ টন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইস্পাতের গাড়ীগুলির বহনক্ষমতা ৪০ থেকে ৫০ টনে দাঁড়ায়। ইস্পাত ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে অধিকাংশ ইস্পাত-উৎপাদক বহিরাগত মূলধনের মুখ চেয়ে বসে না থেকে সম্প্রসারণের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতে পারতেন।

বেসরকারি উদ্যোক্তারা নিজেরা রেলপথ স্থাপনের খরচ চালাতে পারতেন না, কারণ এর জন্য প্রচুর প্ররিমাণে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ যেখানে জনবসতি কম ছিল কিংবা যে-সব অঞ্চল তখনও অনুন্নত ছিল, সে-সব ক্ষেত্রে রেলপথ স্থাপনের ঝুঁকি ছিল অনেক এবং অচিরে তা' লাভজনক হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। রেলপথ নির্মাতারা তাই যৌথ মূলধনী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হলেন ঝুঁকি মূলধন সংগ্রহের আশায়।

দুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে এই সব যৌথ কোম্পানী ছিল রেলপথ প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের দ্বারা গঠিত "গোষ্ঠী"মাত্র, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য জনসাধারণের অর্থ সংগ্রহ করা। জে. গোল্ড্, জিম ফিসক এবং কর্ণেলিয়াস ভ্যানডারবিলট প্রভৃতি কয়েকটি নাম প্রায় উপকথায় দাঁড়িয়েছে। এঁরা ছিলেন রেলপথ ধনতন্ত্রের "স্বর্ণযুগে"র অতিকায় পুরুষবিশেষ, এই সেই কাল যখন সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাধাবিমুক্ত বড় বড় লগ্নীকারকরা অর্থনীতির একটা বিরাট অংশ পরিচালিত করত।

অসাধু ব্যবসায়বুদ্ধি অবলম্বন করে অনেকে প্রচুর সম্পদ লাভ করেছে, আবার অনেকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশ এই জাতীয় লেনদেন ঘটেছে জনসাধারণের অর্থের অবিবেচনাপূর্ণ অপচয়ে। "সম্মান ব্যতীত আর কিছুই হারায় না!"—এই কথাটি হল এরি রেলপথের শেয়ারঘটিত একটা চমকপ্রদ লেনদেনের সমাপ্তি পর্বে জিম ফিসকের নির্লজ্জ মন্তব্য। আর একটি উপলক্ষ্যে কমোডোর ভ্যানডারবিল্ট এই দর্শনই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন অতিশয় স্থূল ভাবে ঘোষণা করে—"আইনের আমি কি ধার ধারি? আমার নিজেরই ক্ষমতা আছে, নেই কি?"

আজকের দিনে এই নৈতিক দর্শন যত ঘৃণ্যই মনে হোক না কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দুর্দম আমেরিকান জীবনে তা' মোটেই অসঙ্গত ছিল না। যে-সব সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন, তা' এমন ভাবে সার বেঁধে এসেছিল যে খুব কমসংখ্যক মানুষই আগে হয়ত তার স্বপ্ন দেখে থাকবেন। সুযোগ যেখানে

এমন বিস্তৃত, এবং এক ক্ষেত্রে অসাফল্যের ফলে অপর ক্ষেত্রে সাফল্যের বাধা যেখানে ছিল না, সেখানে জাতির সম্পদ উন্নয়নকল্পে এই ভাবে কিছু পরিমাণে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বপক্ষে কিছুটা যুক্তি নিশ্চয় ছিল।

এর ফলে, যে ধরনের আচরণ কোন অধিকতর সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল সমাজে অসহনীয় মনে হত, তা' অন্ততঃ সেই ক্ষণে একটা প্রয়োজন সিদ্ধ করল। তার ফলে রেলপথ নির্মিত হল। পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হল। ঠিক যেমন গৃহযুদ্ধের আগে ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে আধিক্যকে পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করতে হয়েছে, তেমনই যুদ্ধের পর রেলপথ নির্মাণের কাজ সেই প্রয়োজনমূলক মাপকাঠি ভিন্ন বিচার করা সম্ভব হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ সাম্রাজ্য কোনদিনই গড়ে তোলা সম্ভব হত না যদি না বেসরকারি মূলধনের সীমিত সম্পদকে বৈদেশিক এবং সরকারি সাহায্যে পুষ্ট না করা হত।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরাজ মূলধন লগ্নীকারকগণ আর সেই সঙ্গে ওলন্দাজ, জার্মাণ, সুইস্ এবং ফরাসীরাও আমেরিকান রেলপথের শেয়ার কিনতে শুরু করে। এই বৈদেশিক লগ্নীকৃত অর্থ রেলপথ নির্মাণের যে ধুম মাঝে মাঝে উঠেছে তা' পুষ্ট করেছে। এ ছাড়া, এই বৈদেশিক মূলধন আভ্যন্তরীণ মূলধনের রব চাপ হ্রাস করার কাজে অনেক পরিমাণে সহায়তা করায় অন্যান্য যন্ত্রশিল্প জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সুলভ হয়েছে।

স্থানীয়, রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ রেলপথকে প্রকৃত মূলধন সরবরাহ ভিন্ন আরও অনেক ভাবে সহায়তা করেছে। সরকারি ভূমি দান, রেলবণ্ড ক্রয়, বন্ধকীঋণ, সোজাসুজি নগদ দান, প্রভৃতির দ্বারা রেলপথের মূলধনের 'বুভুক্ষা' উপশম করা হয়েছে। অনুমান করা হয়েছে যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে রেলপথ গঠনের শতকরা ৪০ ভাগ খরচ (ভূমিদানের ব্যাপার এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত না করে) সরকারি সূত্রে বহন করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ-ব্যবস্থার সংগঠনে বিশেষ ভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। ১৮৫০ এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনগুলি আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথগুলিকে রেলপথ স্থাপনের অধিকার দান করেছে, বিনামূল্যে কাঠ, মাটি ও পাথর ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে এবং বেশ মোটা মোটা দাগে জমি দান করেছে। সব জড়িয়ে, বেশ মোটা রকমের অর্থসাহায্য ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আন্তর্মহা-

দেশীয় রেলপথগুলিকে ১৫ কোটি একারেরও বেশী জমি দিয়েছেন। এই জমির পরিমাণ নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, এবং নিউ ইংলণ্ডের আয়তনের সমতুল।

যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ-সংস্থানের এই সব উন্নয়ন-ব্যবস্থা পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। রেলপথ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের উন্নয়নের জন্য দায়ী। কৃষকের পক্ষে সীমান্তের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত যদি তার ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলকে বাজারে পাঠানো না যেত। তাই অনেক সীমান্তবাসী সম্প্রদায় রেলপথের বিস্তারকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে রেলপথের শেয়ার ক্রয় করেছিলেন। অনেক কৃষক এই কারণে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তাদের ক্ষেত বন্ধক পর্যন্ত দিয়েছেন।

কিন্তু একটু একটু করে কৃষকরা রেলপথ কোম্পানীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। রেলকোম্পানীগুলিকে ফেডারেল এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ভূমি দান বাস্তু-অধিকারীদের প্রাপ্য নিষ্কর ভূমি লাভের অন্তরায় হয়ে উঠল। মাল চালানের অতিরিক্ত ভাড়া এবং গৃহযুদ্ধোত্তর কালে গম এবং ময়দার নিয়ত নিম্ন মূল্য বিরোধের অন্য হেতু। অধিকন্তু, রাজনৈতিক শক্তির বল্গা ক্রমশঃই চাষীর হাত থেকে দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থগোষ্ঠীর হাতে চলে যেতে লাগল। জে. গোল্ড্, জিম ফিসক্ প্রভৃতির মত মানুষরা যে ধরনের কাণ্ড শুরু করেছিলেন তা' ব্যক্ত হয়ে যাওয়ার পর কৃষক-সম্প্রদায় যে বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং নতুন অতিকায় শিল্প-সংস্থাসমূহের ক্ষমতা খর্ব করতে উ[illegible] হবে, তা' মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। ক্রমবিকাশের প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত এই কৃষক-বিদ্রোহ আমেরিকার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়।

ভূমি সীমান্তের অবসান

১৮৭০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম সীমান্তের যে চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তি তা' এক রূঢ় বাস্তবের রোমান্টিক প্রতিচ্ছবি রেখে গেছে। বৃহৎ সমতল ভূমিগুলি (গ্রেট প্লেন্‌স) বসতিকামী এবং স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষের কথা, কলোরাডো এবং নেভাদার খনি-অঞ্চলীয় শহরের কট্টর স্বাতন্ত্র্যবাদ, টেক্সাস্‌-এর পশুপালকদের কানজাসের রেল ডিপো অভিমুখে "সুদীর্ঘ যাত্রা" আর সেই সঙ্গে অভিযাত্রী বাস্তুজীবি কৃষকের উপত্যকার আধা-মরুভূমির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই কালের যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই, রোমান্টিক বা বাস্তবানুগ যাই হোক, তা' এক বীর্যবান ধনতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি আর এই ধনতন্ত্রই পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণ সম্ভব করে তুলেছিল।

অতলান্তিক উপকূল থেকে মিসিসিপি উপত্যকা পর্যন্ত অঞ্চলে স্থায়ী লোক-বসতি স্থাপনে ও ঐ অঞ্চলে একটা স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে দু'শ' বছরেরও বেশী সময় লেগেছে। কিন্তু বৃহত্তর এবং অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় গ্রেট প্লেনসে'র লোক-অধ্যুষিত এবং আর্থনীতিক দিক থেকে স্থিতিশীল হয়ে উঠতে চল্লিশ বছরের কম সময় লেগেছে। গৃহযুদ্ধোত্তর কালে যে প্রচণ্ড শিল্পগত এবং রেলপথের সম্প্রসারণজনিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা' ভিন্ন এই ভাবে দ্রুত গতিতে উন্নয়ন সম্ভব হত না।

শুধুমাত্র বাজারকে আরো কাছে নিয়ে আসার চেয়েও কিছু বেশী করেছে পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথগুলি, তারা পত্তনী গঠনে এবং নিজেদের লগ্নীর নিরাপত্তা-স্বরূপ আর্থনীতিক প্রচেষ্টাকেও উৎসাহিত করেছে। শিল্পগত সম্প্রসারণ পূর্বাঞ্চলে শহর বিস্তারের উদ্দীপনা জাগিয়েছে এবং এই সব শহর সমতল ভূমির কৃষাণদের শস্যাদির এবং গবাদি পশুপালকদের গোমাংসের বর্ধনশীল বাজার সৃষ্টি করেছে। পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের ফলে ক্রমে আমেরিকা থেকে আত্মনির্ভরশীল কৃষক লোপ পেয়ে গেল। এর ফলে, চিরন্তন আর্থনীতিক আত্ম-উজ্জীবন এবং সুযোগের প্রতীক হিসাবে পশ্চিম-প্রান্তিক কৃষি-সীমান্ত তার অর্থ হারাতে শুরু করল। মোট যুক্তরাষ্ট্রীয় জনসংখ্যার সঙ্গে কৃষিজীবির

গ্রীকদের কাছে যেমন ছিল ভূমধ্যসাগর, যা রীতিনীতির বাঁধন ভেঙে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপ্রচেষ্টাকে আহ্বান জানিয়েছে, নিয়ত অপসারণশীল সীমান্ত প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এবং পরোক্ষ ভাবে ইউরোপের জাতিসমূহের কাছে ছিল তাই এবং আরো অনেক কিছু।

—ফ্রেডরিক জ্যাকসন টারনার, ১৮৯৩

সংখ্যাব অনুপাতেব ধাবাবাহিক ক্রমাবনতি থেকে এটা লক্ষ্য কবা যায়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যার ৮৩ ভাগ কৃষিকর্মে বত ছিল। ১৮৬০-এব মধ্যে এই সংখ্যা শতকবা ৬০ ভাগে নেমে যায়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় শতকবা ৩০ ভাগে দাঁড়ায়। বর্তমানে, মোট জনসংখ্যাব মাত্র শতকরা ১১ ভাগ কৃষিকর্মে লিপ্ত।

অতিদ্রুত শিল্পায়ন এবং শহবেব উন্নয়নের সাথে সাথে খেত-খামারের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিরাট জনসংখ্যাব উদ্ভবে কৃষাণেবা স্বভাবতই বাজাব-সচেতন হয়ে উঠল। খামাবজাত দ্রব্যাদিব বর্ধনশীল চাহিদা এবং নগদ ফসলের ওপর বেশী জোব দেওয়াব ফলে কৃষিব কাজে বিশেষীকবণ উৎসাহিত হল। এর ফলে আত্মনির্ভবশীল কৃষাণেব বিলোপপ্রাপ্তি আরও দ্রুত হয়ে এল।

ঐতিহাসিক হ্যাবী কাবমান এবং হ্যারল্ড সাইবেট লিখেছেন: "আত্মপুষ্ট কৃষি-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হল এবং ব্যবসাদাব চাষী একজন কারিগরি সওদাগরে পবিণত হল, সে যা কিছু তাব প্রয়োজন তা' কিনত, আব যেটুকু সে উৎপাদন কবত তাই বিক্রি কবে দিত।" ব্যবসায়ী চাষীব জীবিকা এখন থেকে আর মূলতঃ প্রকৃতিব সঙ্গে সংগ্রামেব মুখাপেক্ষী হয়ে রইল না, "কারণ তার লাভের অঙ্ক এখন আব শুধু প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নিভব করত না, শুল্কহার, পৃথিবী জুড়ে সববরাহ এবং চাহিদা আব অর্থ-বাজাবের অবস্থা ইত্যাদির উপরও তার লাভ নির্ভব কবত।" *

সরকাবি জমি বিলি যে আইন দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হত তা' এবং প্রকৃত ভূমি-বণ্টনের ব্যবস্থা, গ্রেট প্লেনসে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ-ব্যবস্থাকে পরিপুষ্ট করে তোলে। মজাব কথা এই যে, বহু বৎসরব্যাপী কৃষিজীবি এবং নাগবিক জনগণেব আন্দোলনেব ফলে যে 'হোমষ্টড এ্যাক্ট' বা বাস্তুভিটা

---

* A History of the American People, Vol. I, New York: Alfred A. Knopf, 1952.

আইন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ হয়েছিল, এই ব্যাপারে তার গুরুত্ব খুব বেশী ছি না। সুবিশাল পশ্চিমের অতি সামান্য অংশমাত্র বাস্তুকামীদের দেওয় হয়েছিল এবং ১৮৯০-এর পূর্বে তিনজনের মধ্যে প্রায় দু'জন বাস্তুকামী তাদে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

কেন এমন হল? প্রথমতঃ একটা খামার প্রতিষ্ঠাব খরচ অত্যন্ত বেে যাওয়ায় বাস্তুগঠন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ল, আর কংগ্রেস ঋণদানে ব্যবস্থা করে এই আর্থিক ভার লাঘবের কোনো চেষ্টাই কবে নি। কৃষাণর অধিকন্তু উপলব্ধি করল যে, ১৬০ একাব পরিমাণ জমি বনভূমি এবং আর্দ্র অঞ্চলে যথেষ্ট হলেও, গ্রেট প্লেনসের মত অনুর্বর অঞ্চলে তা' মোটেই যথে নয়। উপবন্তু, এ্যাক্টেব কয়েকটি ধারা এবং সংশোধনী জমির ফাটকাবাজ এবং অ-বসতিকামীদের জন্য জুয়াচুরিমূলক নানা রকম কৌশল অবলম্বনের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করল।

প্রকৃতপক্ষে, গৃহযুদ্ধেব পর, ভূমিবণ্টনেব ব্যবস্থা কৃষাণদেব অনুকূলে মোটেই যায়নি। 'হোমষ্টিড এ্যাক্ট' ভিন্ন যে-সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার ফলে অ-বসতিকামীদের হাতে প্রচুর পবিমাণ জমি এসে পড়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, "রেলপথ" অগ্রণী কৃষকদেব চেয়ে চার গুণ বেশী বিনা-মূল্যের জমি" লাভ করেছে।

অন্যান্য আইনের আওতায় কৃষিমূলক শিক্ষায় উৎসাহ দানেব জন্য বাজ্যসমূহ যে ভূমি পেয়েছিলেন এবং ইণ্ডিয়ানদেব জন্য যে পবিমাণ জমি সংরক্ষিত করে বাখা হয়েছিল তা' ফাটকাবাজদের হাতে চলে যায় এবং এই সমস্ত সময়টা জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার নগদ মূল্যে জমি বিক্রয় করে যায়। সর্বসাকুল্যে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ একাব ভূমি এই ভাবে বণ্টন করা হয়।

কানজাস, নেব্রাসকা, উত্তব ও দক্ষিণ ডাকোটা এবং অন্যান্য বাজ্যে ১০,০০০ হাজার থেকে ৬০,০০০ হাজাব একার জমির এক-একটি প্লট অনেক ক্ষেত্রেই ফাটকাবাজ বা জমি ক্রয়-বিক্রয় কোম্পানীকে বিক্রয় করা হয়েছে। দু'টি চরম দৃষ্টান্ত উল্লেখ কবা যাক, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬টি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি, যুক্তবাষ্ট্রের ২ কোটি ১০ লক্ষ একার পরিমাণ ভূমির মালিক ছিল। এগারোটি কাঠের কারবার প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ একাব বনভূমির মালিক ছিলেন।

উন্নত ধবনের কৃষি যন্ত্রপাতি, বাণিজ্যিক সার ব্যবহার এবং প্রায়-শুষ্ক ভূমিকে চাষযোগ্য কবাব জন্য বিশেষ ধরনেব কৌশল প্রয়োগের ফলে খামার-

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে ভূমির ফলনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতিতে লগ্নীকৃত মূলধন তিন গুণ বেড়ে যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এক বুসেল গম উৎপাদনে যে পরিমাণ মানবিক শ্রমের প্রয়োজন হত, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তার আঠারো গুণ বেশী প্রয়োজন হত। এই ভাবে যদিও ১৮৭০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু কৃষক খামার ছেড়ে শহরে চলে যায়, তবু খামার-মজুরের বর্ধিত কর্মদক্ষতা শ্রমিকশক্তির এই ক্ষয়টুকুর উত্তমরূপে ক্ষতিপূরণে সমর্থ হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শস্য কৃষিজীবিরা প্রায় ৮০ কোটি বুসেল শস্য উৎপাদন করে। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শস্য উৎপাদন এর চেয়ে প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিরাট বৃদ্ধি কিন্তু সমৃদ্ধি বা 'সুবর্ণ যুগ' আনতে পারে নি নতুন রীতির বাণিজ্যিক চাষীদের জন্য। গুরুতর কৃষি-সংকটের এই কালে নতুন কৃষির সঙ্গে শিল্পগত অর্থনীতির সামঞ্জস্য সাধন অতিশয় বেদনাদায়ক ছিল। যদিও খামারের সংখ্যা এবং চাষকর্মে ব্যবহৃত ভূমির মোট পরিমাণ এই কয়েক বছরে দ্রুত ভাবে বেড়ে গেল, তবু খামারের আয়ের মোট পরিমাণ ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অতি সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আধুনিক "খামার সমস্যা" একটা আকৃতি গ্রহণ করতে শুরু করল।

কৃষকদের কাছে গৃহযুদ্ধোত্তর কালে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল খামারজাত কৃষিপণ্যের নিম্নগামী দর আর তার ফলে খামারগুলির আয় হ্রাস সবচেয়ে মজার কথা, কৃষকরা নিজেরাই কিন্তু এই অবস্থার জন্য আংশিক দায়ী ছিল। পশ্চিমাভিমুখে সুতীব্র ভঙ্গীতে অগ্রগমনের পিছনে আর্থনীতিক সুবিধা বিষয়ে চাহিদা এবং সরবরাহের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোনো রকম যুক্তিগ্রাহ্য প্রেরণা ছিল না। স্বাধীনতার আকর্ষণ এবং একটা সব দিক থেকে মুক্ত খামার লাভের আশার বশে ভূমির পত্তনী এবং চাষবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে, অতি-উৎপাদন ঘটেছে—বিশেষ করে গম এবং তুলার ক্ষেত্রে, এবং তা' একটা বাঁধা সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

গৃহযুদ্ধের পর কিছুকাল ধরে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিজাত খাদ্যবস্তু ইউরোপীয় বাজারে একটা নির্গমনের পথ পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সব দ্রব্যাদির বহির্বাণিজ্যের বাজার আরো সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু ক্যানাডিয়, আর্জেনটাইন, এবং রাশিয়ান শস্যাদি এবং আর্জেনটাইন

গো-মাংস, ভারতীয় ও মিশরীয় তুলা, নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার পশম-জাত দ্রব্য এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি আমেরিকান খামারজাত কৃষিপণ্যের বহির্বিশ্বের মূল্য একেবারে নিম্নাভিমুখী করে দেয়। আমেরিকান শুল্কের চড়া হার সম্ভাব্য ক্রেতাদের আমেরিকান পণ্যের থেকে অন্য বাজারের দিকে যে দ্রুতগতিতে আকৃষ্ট করেছে তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অপ্রতুল অর্থ-সরবরাহ খামারের আয় হ্রাস করার অন্যতম কারণ। মুখ্যতঃ, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা এবং সবুজ-পৃষ্ঠ হুণ্ডি (গ্রীন-ব্যাকস্) বাজারে চালু ছিল, ১৮৯০ সালে তার পরিমাণ মোটেই বাড়েনি। যদিও ইতিমধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়েছে এবং আর্থনীতিক প্রচেষ্টা ত্রিগুণ হয়ে উঠেছে। কৃষকরা সব সময়েই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে তাদের অসুবিধা থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেছে। কারণ, ডলারের মূল্য হ্রাস করে খামারের ঋণের পরিমাণ আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস করা সম্ভব ছিল। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের অবসানে কৃষকের হাতে আর যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, যার দ্বারা 'সস্তাব মুদ্রা' সহজলভ্য করার অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা যায়।

কৃষিতে যখন বিশেষ বিশেষ শস্যোৎপাদন ব্যবস্থা গৃহীত হল এবং কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের বহুল প্রসার ঘটল, তখন কৃষকদের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বহু অর্থ লগ্নী করতে হল এবং সেটা হল এমন একটা সময়ে যখন অর্থের যোগান বেশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার অভাবে, খামার-বন্ধকের সুদের হার ভীষণ ভাবে বেড়ে গেল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশেষ পশ্চিমা রাজ্যে সুদেব হার গড়পড়তা শতকরা ৯·৪-এ পৌছেছিল। তথাপি, খামারের জন্য যন্ত্রাদি ক্রয় করার প্রয়োজনে, খামারের পুঁজি বৃদ্ধির জন্য কিংবা ভূমি সংগ্রহের দায়ে কৃষকের পক্ষে বন্ধকীর হাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, অনুমান করা হয়েছিল যে কানজাস, নেব্রাস্‌কা, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, মিনেসোটা প্রভৃতি অঞ্চলে যতগুলি খামার আছে বন্ধকী খামারের মোট সংখ্যা ছিল ঠিক ততগুলি।

কৃষকের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেল চড়া এবং অনেক ক্ষেত্রে তারতম্যযুক্ত ভাড়ার হারের জন্য। অনেক সময় এক বুসেল শস্য পাঠাতে আর এক বুসেল শস্যের দাম পড়ে যেত। কোনো কোনো সময় ডাকোটার কোনও অঞ্চল থেকে মিনেয়াপোলিসে শস্যাদি পাঠাতে যে ভাড়া লাগত তার চেয়ে অনেক কম ভাড়া লাগত শিকাগো থেকে লিভারপুলে জাহাজযোগে শস্য রপ্তানি করতে। আর

খামারজাত দ্রব্যাদির দর হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার হার কিন্তু আনুপাতিক হিসাবে কমেনি।

অধিকন্তু, একটি অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলের ভাড়ার মধ্যে কিংবা বড় চালানকারী আর ছোট চালানকারীর মধ্যে ভাড়ার হারের উল্লেখনীয় তারতম্য লক্ষ্য করা যেত। রেলপথের মালখানায় মালপত্র জমা রাখার জন্য চড়া হারে ভাড়া আদায় করা হত বলে, মালের ভাড়া আরো বেড়ে যেত। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, রেলপথ-সংস্থাকে লাভ করতে হলে, রেলপথ চাষীদের ওপর যে নির্মম ব্যবহার করেছিল তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জনস্বার্থ-বিরোধী কলঙ্কজনক উৎকোচ গ্রহণ, 'সুবিধাজনক শেয়ার' (ওয়াটারড্ স্টক) বিক্রি এবং অন্যান্য অনাচারেব সংবাদ যখন প্রকাশ পেল তখন রেলপথ-সংস্থার রীতিনীতি সম্পর্কে কৃষকগণের মনে ন্যায্য কারণেই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

খামাবজাত পণ্যের নিম্নগামী দবের সঙ্গে উৎপাদন এবং বণ্টনের ব্যয়-বাহুল্য সংযুক্ত হয়ে হাজার হাজার চাষীকে সর্বনাশের সীমানায় পৌছে দিল। একটা সময়ে গমচাষীরা বুসেল প্রতি ৬৫ সেণ্ট ব্যয় করত উৎপাদন বাবদ আর তার বিক্রয়মূল্য ছিল বুসেল প্রতি ৪২ সেণ্ট। এই সেই কাল যখন কানজাস ও ডাকোটা অঞ্চলের শস্য এবং গমচাষীবা বাজারে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি না করে ঘর গবম রাখার জন্য শস্যকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা অনেক লাভজনক মনে করত।

যথাসময়ে সুদের টাকা দিতে না পারায় বহু কৃষককে তাদের খামার ব্যাঙ্ক কিংবা অন্য প্রকার মহাজনী কারবারীদের হাতে সঁপে দিতে হয়েছে। ভাড়াটিয়া চাষীর দ্বারা জমি চাষ করার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়েও আমেবিকান খামারগুলির এক-চতুর্থাংশ ভাড়াটিয়া চাষীদের দ্বারা চাষ করান হত। কুড়ি বছর পরে এই সংখ্যাটি শতকরা ৩৫ ভাগে পৌছোয়।

• ১৮৭০-এর দশকের প্রথম ভাগের মধ্যে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের চাষীবৃন্দ তাদের প্রতিবাদ যাতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুভূত হয় সেই জন্য একটা ফলপ্রদ পন্থা উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। তাদের প্রধান হাতিয়ার হল 'পেট্রনস অব হাসবানড্রি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান, যার অধিকতর জনপ্রিয় নাম হল "গ্রেঞ্জ" (Grange)। কৃষকরা যতই অনুভব করতে থাকে যে, তারা একদিকে বিশ্বের

বাজারে তাদের পণ্যের নিম্নগামী দর আর অপরদিকে শিল্পোন্নত পূর্বাঞ্চল—এই দু'য়ের মধ্যে পিষে মারা যাচ্ছে, এই আন্দোলন ততই তীব্র হয়ে উঠল। স্বতন্ত্র কৃষক-সংস্থার সহযোগিতায় গ্রেঞ্জ জাতির রেলপথ-সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য 'দালাল'দের হাত থেকে কৃষকরা যাতে অধিক পরিমাণে সুবিচার লাভ করে তার জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ কবতে লাগল।

রেলপথ-সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বিশেষ ভাবে সরকারি সাহায্য দেওয়ার বিরুদ্ধেও চাষীরা প্রতিবাদ ধ্বনিত করল। এই নয়া শিল্পগত পরিবেশে জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষম বণ্টনের কাজে সরকারকে একটি যথার্থ কার্যকরী নিয়ামক শক্তি রূপে গড়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তনে কৃষকদের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর প্রচেষ্টা তেমন দ্রুতগতিতে কার্যকরী হল না। তবে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

জনতার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

তোমাদের ঐ ক্লান্ত, দরিদ্র, সংকুচিত মুক্ত বাতাসে শ্বাসগ্রহণেচ্ছু জনগণকে আমার কাছে দাও, তোমাদের মুখরিত তীরপ্রান্তের দুর্গত অবাঞ্ছিতদের, এই সব ঘর-ছাড়া, ঝঞ্ঝাবিধ্বস্তদের আমার কাছে পাঠাও, আমি সোনার সিংহদ্বারে আমার প্রদীপ তুলে ধরে আছি।

—এমা লাজারসের ষ্ট্যাচু অব লিবার্টির গাত্রে খোদিত বাণী

উনবিংশ শতকের শেষ দশকের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পগত ধনতান্ত্রিকতা যেমন কৃষি-ব্যবস্থাকে নতুন আকার দান করেছিল, তেমনই জাতীয় শ্রমিকশক্তির গঠনভঙ্গীকেও একটা নতুন আকার দিয়েছিল। নতুন যৌথ মূলধনী কারবার, নয়া কলাকৌশল এবং 'কারখানা-ব্যবস্থা'র দ্রুত অভ্যুদয়ে যে ধরনের গ্রাম্য আমেরিকা এনড্রু জ্যাকসন ও আব্রাহাম লিনকন তাঁদের বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করেছেন তার লয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রমিক-গোষ্ঠীর মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ কৃষিগত বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রমিকবাহিনীর মাত্র এক-চতুর্থাংশ খামারের কাজে লেগে রইল।

নয়া শিল্পবাদ শহরের উন্নয়নে সহায়তা করল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আট হাজার লোকের বেশি এক-এক গোষ্ঠীতে জনসংখ্যার মাত্র বারো ভাগের এক ভাগ লোক বাস করত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুপাত একের ষষ্ঠাংশে পৌঁছোল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু প্রতি তিনজন আমেরিকাবাসীর মধ্যে একজন শহরের অধিবাসী ছিল। শিকাগোর সম্প্রসারণ ঘটল অতি বিস্ময়কর ভাবে। এর জনসংখ্যা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৩০ হাজার। সেই সংখ্যা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ লক্ষে পৌঁছোল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শিকাগোর জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

• বৃহৎ শহরগুলি পরিকল্পনাবিহীন অবস্থায় যথেচ্ছ ভাবে বেড়ে উঠল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের ৩২ একার পরিমাণ বাস্তুজমিতে, একার প্রতি ৯৮৬·৪ জন লোক বাস করত। প্রাগ শহর, ইউরোপীয় শহরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল ছিল। সেখানকার সবচেয়ে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে তখন একারপ্রতি ১৮৫·৪ লোকের বাস ছিল।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দলে দলে নবাগতদের আগমন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে একটা প্রধানতম কারণ। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পনের বছরে ৪৫ লক্ষেরও বেশী নবাগত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। এর পরবর্তী চল্লিশ বছরে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ নবাগত যুক্তরাষ্ট্রে এসে হাজির হয়। এই থেকে এই বছরগুলির মধ্যে বর্ধিত মোট জনসংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ মানুষের হিসাব পাওয়া যায়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার নবাগতদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জার্মানী, আয়ারলাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন, ক্যানাডা এবং স্ক্যানডেনেভিয়া অঞ্চল থেকে এসেছিল। এদের প্রায়ই "ওল্ড ইমিগ্রেশন" (প্রাচীন নবাগত দল) বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তী যুগে এই দৃশ্য পরিবর্তিত হয়। অধিক সংখ্যায় মানুষ আসতে শুরু করে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া, পোলাণ্ড, ইতালী এবং বলকান অঞ্চল থেকে। এদের প্রায়ই "নিউ ইমিগ্রেশন" (নয়া নবাগত) বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নিউ ইয়র্কের ইতালীয় জনসংখ্যা নেপলসেব জনসংখ্যার সমতুল হয়ে উঠল। শিকাগোর জনগণের চার-পঞ্চমাংশ ছিলেন নবাগত বা তাদের পুত্রকলত্র।

সুলভ যানবাহন খরচ এবং জাহাজ কোম্পানীদেব ব্যাপক বিজ্ঞাপন বিশেষ করে এই সব নবাগতদের উৎসাহিত করেছে। ইউরোপ থেকে মধ্য-পশ্চিমে যাতায়াতের খরচ কখনও কখনও এত নিম্ন হাবে পৌছেছিল যে যাত্রীপিছু মাত্র পঁচিশ ডলার ভাড়া পড়ত। এ ছাড়া, পূর্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপের মানুষের কাছে আমেরিকায় বেতনহার বেশ উঁচু বলেই মনে হত। কিন্তু উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপের মানুষদের তা' মনে হত না। কাবণ, এই সব অঞ্চলের উন্নত জীবনযাত্রার মান আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয ছিল। অধিকন্তু, পূর্ব ইউরোপ—বিশেষতঃ জারের রাশিয়া থেকে আগত এই সব নবাগতের দল রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত শরণাগত ছিলেন।

আন্তঃ-অতলান্তিক এই অভিযানের মুখ্য প্রেরণা ছিল আর্থনীতিক। আমেরিকায় একটি চাকরি লাভের প্রতিশ্রুতি, জীবনযাত্রার একটা উচ্চতর মান লাভের সম্ভাবনা, এবং স্বয়ং শবণাগতদেব ক্ষেত্রে যদি নাও সম্ভব হয় তাঁদের বংশধরদের জন্য নতুন সুযোগের আশা ছিল। দুঃখের বিষয়, এই সব প্রতিশ্রুতি সর্বদা পূরণ সম্ভব হয়নি। শরণাগতরা অনেক সময় এমন বেতনে মজুরী করেছে যে তার দ্বারা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অর্থই মাত্র পাওয়া গেছে, এবং অনেক সময় যে অবস্থায় তাদের মজুরী করতে হয়েছে এবং

থাকতে হয়েছে তা' যে দেশ থেকে তারা পালিয়ে এসেছে তার চেয়ে কোনো অংশে ভালো নয়। এই নতুন দেশের প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা বলার অক্ষমতা এবং আমেরিকান রীতির জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যর্থতাও তাদের খানিকটা বিহ্বল করে তুলে জ্বালা বৃদ্ধি করেছিল।

শিল্পগত অভিধায় শরণাগত এবং কারখানা-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ বেশ সহজে মিশ খায়। আনাড়ী নবাগত চাষীর দল পদার্পণ করল এক নিয়ত সম্প্রসারণশীল কারখানার দেশে, আর সেইখানে অদক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ মজুর—এ দুয়েরই যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের একটা সতর্ক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, 'নয়া' শরণাগতদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চল থেকে চলে আসা নিগ্রোদের যুক্ত সংখ্যা আমেরিকায় ২১টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বিভাগের মোট কর্মীর দুই-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়।

নতুন উৎপাদনী কারখানা অধিক সংখ্যায় স্ত্রীলোক এবং শিশুও নিয়োগ করেছে। ১৮৮০-র আদমসুমারীতে দেখা গেছে যে, ১০ লক্ষেরও কিঞ্চিৎ বেশীসংখ্যক শিশু (দশ থেকে পনের বছর বয়সের মধ্যে) লাভজনক কর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মোট মজুরবাহিনীর শতকরা ৫·২ ভাগ ছিল শিশুদের নিয়ে গঠিত—তাদের মোট সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ।

কর্মরত স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ লক্ষ স্ত্রীলোক কাজে নিযুক্ত ছিল, কুড়ি বছরের মধ্যে স্ত্রীলোক শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে মোট মজুরবাহিনীর শতকরা ১৪ ভাগে পৌছোয়। এই ত্বরান্বিত শিল্পায়নের কালের বেতন, আয় এবং কাজ করবার সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে উপযুক্ত পরিসংখ্যান-নির্ভর তথ্যাদি সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় না। যাই হোক, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সব বিষয়ে সেনেটের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অ-কৃষিমূলক মজুরের ঘণ্টা প্রতি আয় ১৮৬০ থেকে ১৮৯০-এর ভেতর শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু দুর্লভ কুশলী শ্রমিকের বেতন যে রকম দ্রুত তালে বেড়েছে অকুশলী শ্রমিকের বেতন সে ভাবে বাড়েনি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয় বণ্টনের একটা আনুমানিক খসড়া থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ২০০,০০০ পরিবারের আয় ছিল ৫,০০০ ডলারের বেশী, ১৩ লক্ষ পরিবারের আয় ছিল ১,২০০ থেকে ১,৫০০ ডলার, এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ পরিবারের আয় ছিল ১,২০০ ডলারেরও কম। এই পরবর্তী গোষ্ঠীর জনপ্রতি গড়পড়তা বেতন ছিল বাৎসরিক ৩৮০ ডলার।

এই পরিসংখ্যান, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে অবস্থায় মজুরদের কাজ করতে হত তার সামান্যই পরিচয় দান করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দশ থেকে চোদ্দ ঘণ্টার রোজ ছিল সাধারণ ব্যাপার, এবং যদিও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অল্পসংখ্যক কুশলী শ্রমিক আরো কম ঘণ্টার রোজে খাটত, তবু ইস্পাত বা কাগজ কলের শ্রমিক বা তৈল শোধনাগাব এবং অন্যান্য 'ভাবী' শিল্পের মজুরগণ ছ' বা সাত দিনের সপ্তাহে বারো ঘণ্টা রোজ হিসাবে কাজ কবেছে।

উৎপাদন-শিল্পে মৌসুম অনুযায়ী বেকাবী শ্রমিকদের অসুবিধা বৃদ্ধি করে তোলে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত ম্যাসাচুসেটসেব একটা নিরীক্ষা অনুসারে সেই রাজ্যের শতকরা ত্রিশ ভাগ শ্রমিককে সেই বৎসরেব প্রায় পাঁচ মাস কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে। ব্যবসাব পর্যায়চক্রেব ওঠানামার ফলে, যেমন ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ এব° ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে দু'বাব বাণিজ্যিক মন্দা এব° আবো কযেকটি বেকাবীব আবিভাবেব ফলে মজুবদের দুর্দশা ভীষণ বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে, চাকবিস্থলের অবস্থা ছিল জঘন্য এব° বিপজ্জনক। কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে ধীবে ধীবে এব° এলোমেলো ভাবে। কযলা-খনিগুলিতে বায়ু চলাচলের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। কযেকটি উৎপাদন কাবখানার নাম হয়েছিল 'স্বেদ-কাবখানা' (sweat shops), এই নামকবণের হেতু ছিল এই যে মজুরদের কাজ করাব সুযোগ-সুবিধাব ব্যবস্থা ছিল অতি দীন এবং অতি অল্প বেতনে অনেক বেশী সময় তাদেব কাজ কবতে হত। বৃহৎ নগবীগুলির বাইরে মজুববা কোম্পানীব বাড়িতে বাস কবত, আর তাদের বেতন দেওয়া হত "হাত-চিটা" মাবফৎ, যা শুধু কোম্পানীর দোকানেই খবচ কবা যেত।

কাবখানাব শ্রমিকদের এই ক্লেশভোগকে সচেতন বঞ্চনাব শযতানী বলা চলে না। প্রগতি ছিল সকলেবই প্রতি অকরুণ, আব ব্যবসায়ীবাও ক্লেশজনক দ্রুত তালে দেউলিয়া হয়েছে। এই কাল ছিল প্রচণ্ড শিল্পগত পবিবর্তনের, এই কাল প্রয়োজনীয় এবং বেদনাদাযক ধনতান্ত্রিক মূলধন সঞ্চযনের কাল। মূল্য-সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা ছিল ভয়ংকব। ব্যবসাব পর্যায়চক্র অক্ষম এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল উদ্যোক্তাদের সর্বনাশ সাধন করল। অস্বচ্ছল অর্থ সরববাহের ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী মূল্য হ্রাসের পর্ব চলল। এই সবই শ্রমিকদের প্রতি দৃষ্টিভংগীটা প্রভাবিত করল। উৎপাদন-ব্যয়ের বিবেচনা, যে সব ব্যবসায়ী

সংকটের পর সংকটের মুখে পড়ছে, তাদের পক্ষে ভয়ংকর ছিল—আর সেই কালে মজুর অধিকাংশ মালিকের কাছে একটা উৎপাদন-ব্যয়ের সামিল ছিল।

যাই হোক, অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, কেননা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের তেজী অবস্থা মানবিক দাবীকে ছাপিয়ে উঠছিল। সাধারণ ভাবে আর্থনীতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও মজুরদের অবস্থার নিরন্তর অবনতির ফলে ঘনঘন ধর্মঘট এবং শ্রমিক-বিদ্রোহ শুরু হল। কিন্তু মালিক এবং আদালতের বিরোধিতার জন্য তাদের বিরাট সংখ্যা সত্ত্বেও, নয়া শিল্পগত অর্থনীতির প্রতিনিধিস্বরূপ এই অকুশলী মজুরদের পক্ষে, নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপযোগী একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনেক সময় লেগেছে।

কর্মক্ষেত্রের এই অসন্তোষজনক অবস্থা যে-সব শিল্পে বিশেষ ভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত, সেই সব শিল্পের শ্রমিকদের পক্ষে ভীষণ ক্লেশকর হয়ে উঠল, যথা—লোহা এবং ইস্পাত মজুর, যন্ত্রশিল্পী, ছাঁচকার, পিপা তৈরীর মিস্ত্রী, জুতা প্রস্তুতকারক এবং ছাপাখানার অক্ষর-শিল্পী। এই সব ক্ষেত্র থেকে এমন সব মানুষ উদ্ভূত হয়েছেন যাঁরা পরে দেশের শিল্পায়নের আনুষঙ্গিক শ্রমিক-আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগের দশকে এই সব শিল্পে ২৪টি জাতীয় ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে দেখা গেল। এদের মধ্যে ছিলেন লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স (সর্বপ্রথম বিরাট রেলপথ ইউনিয়ন), লোহা ঢালাইকার, যন্ত্রশিল্পী এবং কামার, খনি-মজুর এবং জুতা প্রস্তুতকারক বা মুচি। এই সব ইউনিয়নের ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মোট সদস্যসংখ্যা ছিল সম্ভবতঃ প্রায় ৩০০,০০০।

কিন্তু বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের ইউনিয়ন গঠন করাই যথেষ্ট নয়; এর পরবর্তী কাজ ছিল তাদের সকলকে একটিমাত্র শ্রমিক-সঙ্ঘে একত্রিত করা। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল লেবার ইউনিয়ন' গঠিত হওয়ায় তা' সম্ভব হল। এই সংস্থার প্রথমতম সম্মেলনে আট ঘণ্টার দিন-মজুরী ব্যবস্থাকে আইনগত করার দিকে তাঁরা নজর দিলেন। তা'ছাড়া, তাঁরা নজর দিলেন সমবায় সমিতি গঠন করা, কারেন্সী বা অর্থনীতির পরিবর্তন, বহিরাগতদের আগমন নিয়ন্ত্রণ এবং একটি ফেডারেল ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রমদপ্তর গঠন দাবী করা ইত্যাদির দিকে।

তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই সংস্থা ক্রমশঃই শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক স্বার্থসিদ্ধি থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, এবং সেই জন্য ন্যাশন্যাল

লেবার ইউনিয়ন কোনো রকমের একটা কার্যকর ফল লাভ করতে সমর্থ হয়নি। যাই হোক, শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে এই সংস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই সংস্থা সর্বপ্রথম সমগ্র জাতির ভিত্তিতে কাজ করার দিকে গুরুত্ব দিল, সমগ্র শ্রমিক-সমাজের সাধারণ সমস্যাবলীর প্রতিবিধানের জন্য বিভিন্ন শ্রমিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের একতাবদ্ধ করল এবং শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমগ্র জাতির মধ্যে একটা চেতনার সঞ্চার করল।

১৮৮০-র দশকের মধ্যভাগে আর একটি শ্রমিক-সঙ্ঘ ন্যাশন্যাল লেবার ইউনিয়নের চেয়ে অনেক বেশী প্রাধান্য অর্জন করল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একটা গুপ্ত সমিতি হিসাবে সংগঠিত হয়ে 'নাইটস্ অব লেবার' প্রথমটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, কারণ এর কার্যক্রমের সঙ্গে যে রহস্যময়তা জড়িয়ে ছিল তার ফলে সমিতিকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গোপনীয়তা উঠিয়ে নেওয়ার ফলে, এই সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে উঠল, এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তা' ১ লক্ষে পৌছোল। এই বছরে ঐ ইউনিযন ধূর্ত ধনপতি দানব-সদৃশ জে. গুলড্‌কে বাধ্য করেছিল ওযাবাস এবং মিজুরি প্যাসিফিক রেলপথের ধর্মঘট এডানোর জন্য এই সমিতিব সঙ্গে আলোচনা করতে। নাইটস অব লেবারের এই চাঞ্চল্যকর বিজয়লাভের ফলে পরের বছর তার সভ্যসংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৭৩০,০০০-এ দাঁড়াল এবং এই সংস্থা এমন এক শক্তিশালী শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল যা দেশ আর আগে কখনো দেখেনি।

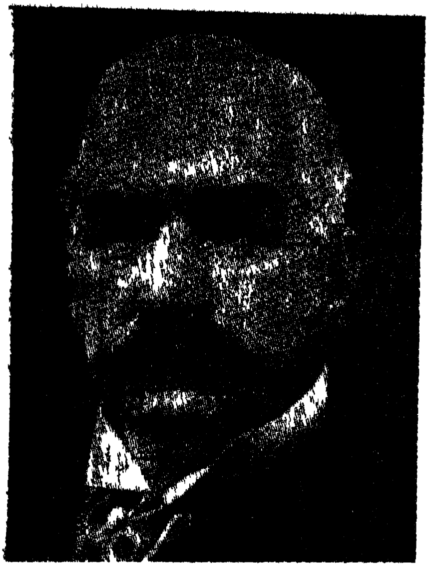
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পর কিন্তু নাইটস্ অব লেবারও শক্তিহীন হয়ে পড়তে লাগল। প্রকৃত প্রস্তুতির অভাবের জন্য অনেকগুলি বড ধর্মঘট নিষ্ফল হওয়ায এই গোষ্ঠীর মর্যাদাহানি হল শ্রমিকদেব কাছে। এই সব ধর্মঘটের সঙ্গে যে-সব হিংসাত্মক এবং নাশকতামূলক কাজকর্ম ঘটল, তা' নাইটস্ গোষ্ঠীর নেতাদেব অনভিপ্রেত হলেও সে-সব ঘটনার ফলে সাধারণ মানুষেব দৃষ্টিতে ইউনিয়নেব কার্যকলাপ 'দস্যুতা'ব সমতুল বলে বিবেচিত হল। শিকাগোর শ্রমিক-আন্দোলনের এক সভায় নাইটস্ দলের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কহীন জনৈক আনার্কিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদী একটি বোমা নিক্ষেপ করায় এগার জনের মৃত্যু হয় এবং আরো অনেকগুলি মানুষ আহত হয়, এই নৃশংসতার জন্য অনেকে নাইটস্ অব লেবার গোষ্ঠীকে নিন্দা করল।

সমবায় এবং অন্যান্য সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপেব অসফল পরীক্ষার ফলেও নাইটস্ দলের শক্তি সম্পর্কে ধারণা অনেক নেমে যায়। তবে হয়ত, এর বিলুপ্তির

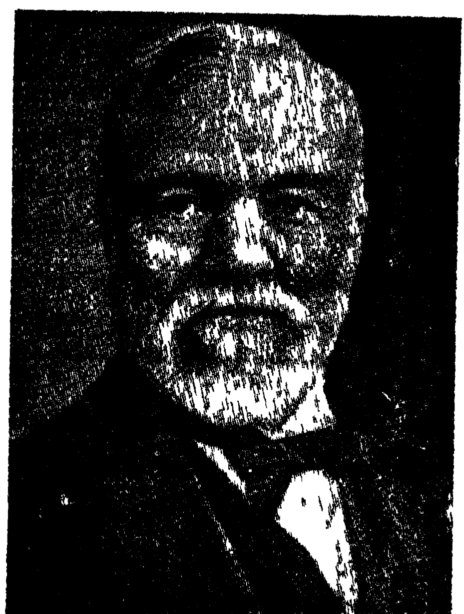
সর্বপ্রধান কারণ ছিল সদস্যদের মধ্যে একতার অভাব। ভ্রাতৃত্বের অস্পষ্ট আদর্শ বিভিন্ন শিল্পের মজুরদের একসূত্রে বেঁধে সংগ্রাম চালনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অনেক সময় কুশলী মজুর এবং অকুশলী মজুরদের মধ্যে প্রায় সুস্পষ্ট শত্রুতার ভাব দেখা যেত। কুশলী মজুররা জানত যে, ধর্মঘটে জয়লাভ করতে হলে তাদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সহজে তাদের স্থান পূরণ করা সম্ভব নয়। এর ফলে যদি কোনো ধর্মঘট সাফল্য লাভ করত, তা'হলে তার ফল অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে তারা আপত্তি করত এবং ধর্মঘট ব্যর্থ হলে তাদের মনোভাব তিক্ত হয়ে উঠত।

নাইটস্ অব লেবারের প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী ট্রেড ইউনিয়নগুলি, যা মুখ্যতঃ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মের কুশলী মজুদের নিয়ে গঠিত ছিল, পবিশেযে অধিকতব স্থায়ী ভাবে জাতীয় মজুর ইউনিয়ন গঠন সম্ভব করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করল। সামুয়েল গোমপারসের নেতৃত্বে এই সব ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে আমেরিকান ফেডবেশন অব লেবার গড়ে তুলল। গোমপারস্ উদ্ভট আদর্শবাদ থেকে সরে আসার চেষ্টা করলেন। তিনি অস্পষ্ট সংস্কাব-ব্যবস্থা কিংবা বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া পরিহার করলেন। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন বা নাইটস্ অব লেবার-এর পক্ষে এগুলি অভিশাপস্বরূপ হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে 'ইউনিয়নের কার্যকলাপ কঠোর ভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে ইউনিয়নেব সদস্যদেব জন্য উচ্চতব বেতন আদায় করা, কাজের সময় কমিয়ে আনা এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা ইত্যাদির মধ্যে। দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে দর-কষাকষি করা এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট করাকে তিনি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিলেন।

বহুবিধ শ্রমিক-আন্দোলন দ্বারা অনেক অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশের ১ কোটি ৬০ লক্ষ বেতনজীবি মজুরের মধ্যে ৫ লক্ষ জনেব বেশী ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত হয়নি। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কুশলী মজুর এবং আমেরিকান ফেডরেশন অব লেবারের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ। অকুশলী শ্রমিকদের বিংশ শতাব্দীর সংস্কারমূলক আইনবিধির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে, তার আগে তারা দর-কষাকষির আলোচনার টেবিলে বসবার সুযোগ পাননি।



জে. পিয়ারপণ্ট মর্গান



এন্ড্রু কার্নেগী



জন ডি. রকফেলার

বৃহৎ-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ

পশ্চিম ইউরোপের অত্যন্ত উন্নত ধরনের অর্থনীতির তুলনায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যুক্তরাষ্ট্রকে এক অনুন্নত দেশ বলা যায়। জাতি তখনও ভাবী শিল্পাদি গড়ে তোলা'র এবং দেশের শ্রমিকদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত।

যদিও অত্যন্ত আশ্চর্যজনক দ্রুত তালে এই সব সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল, তবু একটি নতুন মহাদেশের অতিদ্রুত শিল্পায়ন করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র নতুন ধরনের কলাকৌশলের ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে, তা' মাঝে মাঝে অকৃতকার্য হয়েছে, আবার মাঝে মাঝে অবাঞ্ছনীয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এর রূপায়নে 'আমেরিকান স্বপ্নে'র কেন্দ্রবিন্দু—সকলের জন্য সমান সুযোগ—তা' অতি রূঢ় আঘাত পেয়েছে। এ ছাড়া, জাতির অর্থনীতি ব্যক্তির নিজের স্বার্থ উন্নয়নের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ধারণাও একেবারে পাল্টে গেল।

নতুন সমাজে নতুন ধরনের ক্ষমতার আবির্ভাবে এই সব আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। দেশের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শিল্প ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান-

সমূহের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল। একটা নতুন ধরনের সামাজিক এবং আর্থনীতিক নায়কত্ব গড়ে উঠল, সাফল্যমণ্ডিত উদ্যোক্তা এবং যৌথ কারবারের অধ্যক্ষবৃন্দ ধীরে ধীরে চিরাচরিত ভাবে যে-সব জমিদার এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এতদিন প্রভুত্ব করছিলেন তাঁদের অপসারিত করল। গৃহযুদ্ধের অবসানে উভয় রাজনৈতিক দলেই এই সব নতুন শক্তিশালী মানুষের প্রভাব ক্রমবর্ধমান ভাবে অনুভূত হল।

দেশ যতই শিল্পোন্নতির পথে এগোতে থাকে, ততই দেশের শিল্পসমূহ, বড় বড় শিল্প-সংস্থা ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি রেলপথ ব্যতীত অধিকাংশ কারবার ব্যক্তি বা অংশীদারী মালিকানা ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একটি তালিকানুসারে অন্যূন ৫,৩০০টি ব্যবসা সংহত হয়ে ৩১৮টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। এই সব ব্যবসার মূলধন ছিল সাতশ' কোটি ডলারেরও বেশী। এই সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জাতির উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা চল্লিশ ভাগেরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করতেন। ৯২টি বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৮টি যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সংস্থার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

গৃহযুদ্ধের পর বৃহদায়তন ব্যবসা প্রতিটি দশকে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করতে লাগল। ১৮৭০-এর দশকে উৎপাদক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যায়, কিন্তু এই সব ব্যবসার লগ্নীকৃত মূলধন শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য শতকরা ৫৮ ভাগ বর্ধিত হয়। ১৮৫০ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎপাদক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর গড়পড়তা সংখ্যা প্রায় তিন গুণে পৌছোয়, আর সেই সঙ্গে উৎপাদক ব্যবসাগুলিতে লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ সতের গুণ বর্ধিত হয়।

বিশেষ বিশেষ শিল্পে উন্নয়নের ধারা সাধারণ সম্প্রসারণের পথ অনুসরণ করেই চলেছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী দুই দশকে লোহ এবং ইস্পাত কারখানার সংখ্যা ৮০৮ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭১৯-এ পৌছোল এবং প্রতিটি লোহ এবং ইস্পাত ব্যবসায়ে গড়পড়তা লগ্নীকৃত মূলধন ১৪৯,০০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৫,৮৫০ ডলারে পৌছোয়। এই একই কালে যে-সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত, তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানপ্রতি লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ গড়ে চোদ্দ গুণেরও বেশী বর্ধিত হল।

কারিগরি যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবনী বৃহত্তর আর্থনীতিক সংস্থার অভ্যুদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। যদিও যন্ত্রীকরণের অর্থ ছিল অধিক খরচ, তবু যৌথ-মূলধনী কারবার গড়ে তুলে এবং শেয়ার বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মূলধন আকৃষ্ট করা সম্ভব হল। একবার স্থাপিত হওয়ার পর যন্ত্র, শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা প্রচণ্ড ভাবে বাড়িয়ে দিল এবং একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করল। এই ভাবে যন্ত্র দেশের শিল্প-সম্পদ বহু গুণ বৃদ্ধি করল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তাবৃন্দ তাঁদের প্রতিযোগীদের হয় কিনে নিতে নয় ত' তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ায় জন্য উন্মুখ হলেন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায়। কারণ তাঁরা দেখলেন, শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় কমে আসে।

বাজার এই বছরগুলিতে মাঝে মাঝে প্রসারিত হয়েছে ধারাবাহিক 'তেজী' হাওয়ার স্বযোগে। প্রতিটি নতুন 'তেজী' হাওয়া দ্রব্যাদির জন্য নতুন করে চাহিদা বৃদ্ধি করায়, ব্যবসায়ীরা খরিদ্দার আকৃষ্ট করার জন্য কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে, অবাধ বাণিজ্য-প্রচেষ্টা জনসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গতিতে সম্প্রসাবিত হওয়ায়, বাজার মাঝে মাঝে ভারসাম্য হাবিয়েছে। এই ভাবে আধুনিক ব্যবসা-চক্রের উদ্ভব হয়েছে। সমৃদ্ধির কালগুলিকে অনুসবণ করেছে আর্থনীতিক মন্দার যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই জাতীয় চারটি সংকটকাল দেখা দিয়েছে: ১৮৫৭ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং সবশেষে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

এই সব সংকটের কালে, যন্ত্রীকরণের ফলে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থির ব্যয় (fixed cost) অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে, তাদের মধ্যে তিক্ত এবং অনমনীয় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অন্যবিধ অনেক কারণ গভীর এবং আত্ম-হননকারী মূল্য প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে তুলল। জাতীয় রেলপথ-সংস্থার প্রসার আঞ্চলিক একচেটিয়া কারবার চূর্ণ করে দিল। যে বিশ্বব্যাপী পণ্যমূল্য হ্রাস ১৮৬০-এর দশকের মধ্যভাগে এবং ১৮৯০-এর দশকের শেষ ভাগে দেখা দিয়েছিল, তা' অর্থ সরবরাহের সংকোচনে সহায়তা করল। পরিশেষে জাতীয় অর্থের অসচ্ছল সরবরাহ ব্যবসা-চক্রের পাশবিক বাস্তবতাকে অনেক বেশী প্রকট করে তুলল।

প্রতিযোগিতার এই জঙ্গলে অক্ষম এবং অর্থসম্পদে দুর্বল বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা অতি দ্রুত পথের ধারে পড়ে রইল। যারা শেষ পর্যন্ত মাথা তুলে রইল তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্থায়িত্বের কৌশল সন্ধান করতে লাগল। মূলতঃ আত্মরক্ষার একটা তাড়নায় তারা বাজার নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জনে তৎপর হয়ে উঠল। তারা বিভিন্ন ধরনের সংযুক্তির মধ্যে এই শক্তির সন্ধান পেল। এই পন্থাকে জন ডি. রকফেলার "সম্পূর্ণ আধুনিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত" বলে বর্ণনা করেছেন।

এই সব সংযুক্তি বা "কম্বিনেশন" সূচনায়, 'ভদ্রলোকের চুক্তি', 'উৎপাদক সঙ্ঘ' প্রভৃতির মত কতকগুলি সাধারণ চুক্তিমাত্র ছিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে রেলপথগুলি বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল। অনেক রেলপথ "প্রতিযোগীদের" সঙ্গে একযোগে ভাড়ার হার প্রস্তুত করেন এবং প্রতিটি রেলপথ স্থির করেন যে এই ভাবে নির্দিষ্ট হারকে হ্রাস করা হবে না। সংশ্লিষ্ট পরিবহন কোম্পানীগুলির আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কতকগুলি রেলপথ তাদের আয় একটি যৌথ তহবিলে জমা রাখতে শুরু করে। কাজেই পরিবহন কোম্পানীগুলি তাদের যৌথ সঙ্ঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাড়ার হার অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রেরণা পায়।

জাহাজের দড়াদড়ি প্রস্তুতকারকরাই রেলপথ চুক্তির বহির্ভূত প্রথম গোষ্ঠী যাঁরা শিল্পকে স্থায়িত্ব দান করার জন্য চুক্তি করেন। এই জোট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসার অংশ ভাগ করে দেয়। বাড়তি বিক্রয়কে জরিমানা করা হয় এবং সেই জরিমানার অর্থ, যাঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কম বিক্রয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। 'মিসিগান সল্ট পুল' বা মিসিগান লবণ জোট ছিল অঞ্চলব্যাপী এক বৃহৎ উৎপাদক সমিতি যারা উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মাংস চালানকারী, ঢালাই এবং লোহার নল (কাষ্ট্-আয়রন পাইপ) এবং তারের পেরেক (ওয়ার নেইলস্) নির্মাতারা নিজেদের মধ্যে বিক্রয় অঞ্চল নির্ধারণ করে বণ্টন করলেন।

কিন্তু যখন চাহিদা হ্রাস পেল তখন আর এই সব মৌখিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা গেল না। তাই অধিকতর শক্তিশালী এবং বাধ্যতামূলক সংযুক্তি পদ্ধতির সন্ধান করা হল। এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল যখন আমেরিকার ইতিহাসের প্রথমতম সত্যিকারের 'ট্রাষ্ট' বা অছি-ব্যবস্থা গড়ে উঠল। জন ডি. রকফেলারের অধিনায়কত্বে 'দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী' অনেকগুলি তৈল-উৎপাদকের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নায়কত্ব করেছেন গৃহযুদ্ধের

পরবর্তীকালীন বেশ কয়েক বছর। রকফেলারের চতুর নির্দেশনায়, এই যৌথ প্রতিষ্ঠান ভাড়ার হার বহুল পরিমাণে হ্রাস করে ফেলতে পেরেছিলেন। তা'ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান নিজেদের পিপা-প্রস্তুতকারী কারখানা নির্মাণ করে এবং পাইপলাইন মারফৎ তৈল-সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রচুর টাকা লগ্নী করতে শুরু করে। কোনো না কোনো ভাবে যাঁরা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিলেন তাঁরা হয় নিষ্পেষিত নয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলের শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল প্রকৃতপক্ষে অবিলম্বে পাইপলাইন মারফৎ তৈল সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থাই এবং সমগ্র দেশের পরিশোধন ক্ষমতার ৯০ ভাগেরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি 'ট্রাষ্ট' বা অছি হিসাবে সংগঠিত হল—আর এই প্রতিষ্ঠানের যে ন'জন অছির হাতে সংস্থাগুলির অধিকসংখ্যক শেয়ার সংহত ছিল, সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণভার ছিল তাঁদের হাতে। পরবর্তী বছরের মধ্যে 'ট্রাষ্ট' কথাটির অর্থ দাঁড়াল, কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে কোন বিশেষ শিল্পের নিয়ন্ত্রণভার অনেকটা জমা হওয়া।

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ট্রাষ্টে'র এই সাফল্য তুলাবীজ তৈল উৎপাদক, চিনি-পরিশোধক এবং অন্যান্য ব্যবসা-সংস্থাকে অনুরূপ যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠনে অনুপ্রেরণা দান করেছে। এই সব ট্রাষ্টের অধিকাংশ এমনই বিশাল শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন যা আগেকার প্রাচীন গলা-কাটা প্রতিযোগিতার কালে কোনো একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নিউ ইয়র্কের একজন জজ 'সুগার ট্রাষ্ট' সম্পর্কে লিখেছিলেন : "এরা প্রতিটি পরিশোধনাগার স্বেচ্ছায় বন্ধ করতে পারে…অন্যদিকে খুলতেও পারে, কাঁচা মাল ক্রয় সীমিত করতে পারে, পরিশ্রুত চিনির উৎপাদন কৃত্রিম পন্থায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, সাধারণের অর্থে সহযোগী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে, এবং কোনো মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করে নিঃস্ব করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে পণ্যমূল্য হ্রাস করতে পারে।"

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরনের ব্যবসা-প্রচেষ্টার সমালোচকের সংখ্যা বিপুল হারে বর্ধিত হতে লাগল। কিন্তু নতুন ভাবধারা এবং সেই সঙ্গে নতুন শক্তির উৎস আমেরিকান সমাজকে প্রভাবিত করতে লাগল।

জড়বাদ ও ভাববাদের সংমিশ্রণ এবং তার সঙ্গে "বৈজ্ঞানিক নিয়তিবাদ" (scientific determinism) স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে অধিকাংশ ব্যবসায়ীকে আশ্বস্ত

করল যে, 'আত্ম-স্বার্থ' এবং 'জনস্বার্থে'র মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তাঁরা অনুভব করলেন যে, সরকারের laissez faire বা অবাধ ব্যবসা-নীতি শুধু যে 'ন্যায়সঙ্গত' তা' নয় বরং সভ্যতা ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়।

দুঃখবাদী ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ্‌দের মতবাদ এবং ডারউইন প্রকল্পিত "স্বাভাবিক নির্বাচন" (natural selection) এবং "যোগ্যতমের জয়ে"র (survival of the fittest) নীতি প্রভৃতি থেকে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া গেল। সামাজিক ডারউইনবাদীগণ ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে আরোপ করতে কালবিলম্ব করলেন না। একজন সমালোচক যখন শিল্পায়নের সামাজিক ব্যয়ের কথা উল্লেখ করলেন, তখন তাঁকে জবাবে বলা হল, "আমরা বিবর্তনের জন্য শুধু অপেক্ষা করতে পারি। ৪০০০ কিংবা ৫০০০ বছরের মধ্যে বিবর্তন হয়ত মানুষকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে।"

শতাব্দীর শেষ পাদে, আর্থনীতিক ক্রমবিকাশের একটা নতুন ধারা হল, শিল্পগত ধনতান্ত্রিকতা থেকে অর্থগত ধনতন্ত্রের দিকে ধীরে ধীরে পট পরিবর্তন; তখন ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কার মহাজনবৃন্দ সাধারণ ব্যবসাগত কর্মকাণ্ডে বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। লগ্নীকারক ব্যাঙ্কার, লগ্নীকারক এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক মুখ্য সংযোগসেতু হয়ে দাঁড়াল। শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যয় যত আকাশচুম্বী হতে লাগল এবং যন্ত্রীকরণের যত অগ্রগতি হল শিল্পপতিগণ ততই গভীর ভাবে লগ্নীকারক ব্যাঙ্কারের উপর অধিক পরিমাণে মূলধনের জন্য নির্ভরশীল হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু এই মূলধন ততক্ষণ হাতে আসত না যতক্ষণ না ব্যাঙ্কার স্বয়ং আশ্বস্ত হতে পারতেন যে, তাঁর মক্কেলের হাতে মূলধন নিরাপদ হবে। এই ভাবে তিনি কোনো কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠিত করতে পারতেন এবং প্রায় তার নিয়ন্ত্রণভারও গ্রহণ করতেন।

১৮৯০-এর দশকের মন্দার কালে এবং তার পরে যন্ত্রশিল্পে লগ্নীর হার কমে আসে এবং লগ্নীকারক মহাজন "অব্যবহৃত" (idle) মূলধনের উৎস থেকে তাদের পাওনা মিটিয়ে নিতে লাগলেন। "বিলয়ন" (merger) আন্দোলনের এক নতুন প্রেরণা পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে, এই পুনর্গঠন প্রচুর পরিমাণে "সংস্থাপকের মুনাফা" (promoter's profit) আদায়ের একটা পন্থা হয়ে দাঁড়াল।

অনেক সময় অবশ্য লগ্নীকারক ব্যাঙ্কার কোনো বিশেষ শিল্পে "স্থিরতা" (stability) আনার চেষ্টা করেছেন। আমেরিকান টোটেম দণ্ডে (টোটেম —পূর্বপুরুষগণের স্মরণচিহ্নস্বরূপ জন্তু বা বৃক্ষাদি, অনেকটা বাংলাদেশে প্রচলিত বৃষকাষ্ঠের মত) একদা যেমন শিল্পপতিরা চাষীদের স্থানচ্যুত করে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছিলেন, তেমনই পুঁজিপতি (financier), শিল্পপতিকে তাঁর নিজের বাহুল্য থেকে ত্রাণ করতে গিয়ে অস্থায়ীভাবে শিল্প-উদ্যোক্তাকে (industrial intrepreneur) স্থানচ্যুত করল।

এই নব পুঁজিগত ধনতান্ত্রিকতার অনন্য প্রতীক ছিলেন জন পীয়েরপণ্ট মর্গান। বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের মুখ্য রেলপথ-সংস্থাসমূহকে তিনি দৃঢ়তর পুঁজিগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে স্থিতিশীল করে তোলেন। তারপর তিনি ইস্পাত এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে অগ্রসর হলেন। পুঁজিজগতে তিনি এমন এক শক্তি হয়ে উঠলেন যা এই দেশ এর আগে কখনও জানেনি, এর পরেও না।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'দি হাউস অব মর্গান' বা মর্গান সম্প্রদায় ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টীল কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থা করলেন। ইউ. এস. ষ্টীল ৮০০টি বিভিন্ন ব্যবসার সমবায়ে গঠিত এক অতিকায় শিল্পগত একক সংস্থায় (combine) পরিণত হল। পেটা লোহা, কোক কয়লা এবং ইস্পাতের রেলের উৎপাদনের অর্ধেক, গৃহনির্মাণোপযোগী ইস্পাতের অর্ধেকেরও বেশী, আর প্রায় সমগ্র কাঁটা তার, তারের পেরেক, টিন প্লেট এবং ইস্পাতের টিউব এই সংস্থা উৎপন্ন করতেন। নতুন যৌথ সংস্থার (corporation) শীর্ষ পর্যায়ে আধিপত্য করেন মর্গান সম্প্রদায়। মর্গানরা যখন বিশাল ইস্পাত মহাজন এনড্রু কার্নেগীকে এই নতুন কারবারের তাঁর শেয়ারের দাম হিসাবে প্রায় ৫০ কোটি ডলার দিলেন তখন সেই হস্তান্তর শিল্পগত উদ্যোক্তার ওপর পুঁজিপতি মহাজনের বিজয় ঘোষণা করল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনার মধ্যেই শিল্প-সংস্থাসমূহের আত্মরক্ষার উপায় অনুসন্ধান সমগ্র আর্থনীতিক কাঠামোর আকৃতি পরিবর্তিত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতাভিত্তিক 'প্যাটার্ণ' এবং "খোলা বাজার"কে (free market) নতুন আকারে গড়া হল নতুন শিল্পগত এবং পুঁজিগত শক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য। যদিও এই শক্তির অপব্যয় এবং আমেরিকান আর্থনীতিক জীবনে তজ্জনিত সৃষ্ট অসাম্যের ফলে একটা

ধিক্কার ও প্রতিবাদের ঢেউ উঠল, তথাপি আমেরিকা উপভোগ করতে লাগল নতুন সম্পদ যা ছিল নতুন ব্যবস্থার স্বপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি এবং তার ফলশ্রুতি।

কিন্তু শুধুমাত্র নতুন সম্পদ গড়ে তুলছিল বলেই এই নতুন শক্তিগুলি অপ্রতিহত রইল না। এই সব শক্তি যেমন বর্ধিত হতে লাগল তেমন ধীরে ধীরে অনেক আইনও পাশ হল তাদের সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে। ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে, গণতন্ত্র যে সকলের জন্য সমান সুযোগের সংরক্ষণের জাতীয় আদর্শ সিদ্ধ করার জন্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থাবলী অবলম্বনে সক্ষম তা' প্রমাণিত হল।

সংস্কারের যুগ

আর্থনীতিক ঐতিহাসিক রস রবার্টসন লিখেছেন : "১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল 'অবাধ ব্যবসা'র অর্থনীতিতে আধিপত্যের ভয়মুক্ত হয়ে বাস করা, এই অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল অ্যাডাম স্মিথ যা কল্পনা করেছিলেন অনেকটা সেই রকম। এই অর্থনীতিতে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সরকার বাইরের শত্রু এবং ঘরের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করেন না ..." *

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে এই আশাবাদী মনোভঙ্গী কিন্তু আর গ্রহণযোগ্য রইল না। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায়, গণতন্ত্র যে 'অবাধ ব্যবসা' অর্থনীতির বাধাহীন প্রয়োগে সর্বোত্তম ভাবে রক্ষিত হয়, এই ধারণা জাতির মন থেকে মুছে যেতে লাগল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী দুই কিংবা তিন দশক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরেকজন অর্থনীতি-বিষয়ক ঐতিহাসিক মার্ক স্যলিভ্যান মার্কিন জনগণের মনোভঙ্গী নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করেন :

"সাধারণ আমেরিকান মনে করতে লাগলো যে··· তাকে এমন এক বস্তুর ওপর ফেলা হয়েছে যা সে চোখে দেখতে পায় না কিংবা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতে পারে না; কে যেন তার ওপর 'চড়ে' বসে আছে ··· অস্পষ্ট ভাবে সে অনুভব করে যে তার কর্মের স্বাধীনতা, তার যা খুসী করার সুযোগ আজ বিপর্যস্ত···এই অদৃশ্য শত্রুকে সে ব্যক্তিস্বরূপে দেখতে চায়। এই অদৃশ্য শত্রুকে সে বলে 'অদৃশ্য সরকার', 'পুঁজিপতি', 'গোল্ড বাগস্' বা সোনার ছারপোকা, 'ওয়াল ষ্ট্রীট' বা শেয়ার বাজার, 'ট্রাষ্ট' বা অছি-গোষ্ঠী। †

সংস্কার আন্দোলনের সময় ও স্থানে ১৮৭০-১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পার্থক্য ঘটেছে, আর বহু বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেছে এই আন্দোলন।

* হিস্ট্রি অব দি আমেরিকান ইকনমি : নিউ ইয়র্ক। হারকোর্ট ব্রেস, ১৯৫৫

† আওয়ার টাইমস্ : দি ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ১৯০০-১৯২৫, দ্বিতীয় খণ্ড। নিউ ইয়র্ক : চার্লস্ স্ক্রিবনার্স সন্স, ১৯২৭

গৃহযুদ্ধোত্তর কালে সামান্যসংখ্যক কিন্তু সরব আমেরিকান সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার অধিকাংশ সমালোচক কিন্তু "খোলা বাজারে"র ভঙ্গী, আর ব্যক্তিগত সম্পদ এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রধানতঃ অত্যধিক একচেটিয়া শক্তিকে সীমিত করতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন আয়বণ্টনের নীতির পরিবর্তন। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিশুদ্ধিকরণও তাঁদের কাজ ছিল।

এই সব সংস্কারকদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে কিন্তু বিরাট পার্থক্য ছিল। ১৮৮০-র দশকে কিছুসংখ্যক ধনী এবং চিন্তাশীল অভিজাত শ্রেণীর মানুষ জনজীবনের মধ্যে অসদাচার এবং জড়বাদী মনোবৃত্তিকে 'চ্যালেঞ্জ' জানানোর মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এমন কি, তারও আগে কৃষিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক জাহাজীগোষ্ঠী রেলপথের দুর্ধর্ষ ভাড়ার হার নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে একটা নিয়ন্ত্রক আইনের জন্য আন্দোলন করেছেন; যার ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ইনটারস্টেট কমার্স এ্যাক্ট বা আন্তরাজ্য বাণিজ্য আইন বিধিবদ্ধ হল। ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের এই প্রাথমিক আইনানুসারে 'রিবেট' বা ছাড, 'পুল' বা উৎপাদক সঙ্ঘ এবং কয়েকটি রেলপথের ভাড়ার হার সম্পর্কিত তারতম্য নিষিদ্ধিকরণ করা হল। এই আইনের ধারানুসারে আন্তরাজ্য ভাড়ার হার "ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য" হওয়া প্রয়োজন, যদিও এই আইন প্রয়োজনীয় নিরিখ প্রবর্তনে এবং ব্যবসা নিয়ামক সংস্থা হিসাবে আন্তরাজ্য বাণিজ্য কমিশন প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি।

ঠিক সেই সময়েই, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, চাষী এবং মজুরদের চাপে আরও কিছু একচেটিয়া কারবারবিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করা হল। কয়েকটি রাজ্য, বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পশ্চিমে, কিছু কিছু 'ট্রাষ্ট'বিরোধী আইন পাশ করিয়ে নিলেন। এই সব আইনে একচেটিয়া কারবার এবং ব্যবসার উপর বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে, 'কমন ল' বা সাধারণ আইনের আদর্শের উপর জোর দেওয়া হল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস "সেরম্যান অ্যান্টিট্রাষ্ট এ্যাক্ট" পাশ করে নিলেন। "প্রতিটি কনট্রাক্ট, ট্রাষ্ট বা অন্য যে কোনো আকারের বাণিজ্য-জোট, কিংবা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কিংবা কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা বা বাণিজ্যের সংকোচনকারী কোনো ষড়যন্ত্র এই আইন দ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হল।" প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি

প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের বিরোধিতার এই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। এই কারণে, সেরম্যান অ্যান্টিট্রাষ্ট এ্যাক্ট আমেরিকার আর্থনীতিক ইতিহাসে এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন।

গোড়ার যুগে ইণ্টারস্টেট কমার্স এ্যাক্ট কিংবা সেরম্যান অ্যান্টিট্রাষ্ট এ্যাক্ট কোনটাই খুব বেশী কার্যকর প্রমাণিত হয় নি। তার কারণ, আইনগুলি অতিশয় শিথিল ভাবে প্রণয়ন করা হয়। আর একটি কারণ, বিচার বিভাগের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী আইনগুলিকে অনেকটা নরম করে দিয়েছিল। ১৮৮৭ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে ষোলটি মামলা সুপ্রীম কোর্টে পৌছেছিল তার মধ্যে পনেরটি ক্ষেত্রে আদালত কমিশনের বিরুদ্ধে রায় দান করেন। অধিকন্তু, ১৮৯০ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে জাষ্টিস ডিপার্টমেণ্ট বা বিচার বিভাগ মাত্র আঠারোটি অ্যান্টিট্রাষ্ট মামলা রুজু করেন, তার মধ্যে বারটি হল ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

এর ওপর, সেরম্যান এ্যাক্টের কার্যকারিতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল কয়েকটি রাজ্য সরকার প্রণীত আঞ্চলিক আইনের জন্য। এই সব আইনানুসারে কর্পোরেশন বিশেষ আইনগত অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কর্পোরেশনের শেয়ারের অধিকারী হতে পারতেন। যখন কোনো কর্পোরেশন অন্য কোনো কর্পোরেশনের যথেষ্ট পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হয়ে এই শেষোক্ত কর্পোরেশনের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করত তখন এই কর্পোরেশনকে 'হোলডিং কোম্পানী' বলা হত। মর্গান কোম্পানী ছিল প্রকৃতপক্ষে এক জাতীয় অনেকগুলি হোলডিং কোম্পানীর হোলডিং কোম্পানী। এই কোম্পানী এই ধরনের একচেটিয়া শক্তির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি 'বিলয়ন' (merger) এই পন্থায় কার্যকরী হয়েছিল, বিশেষতঃ ১৮৯৩-৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মন্দার কালের পর।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আতংকে'র বছরে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যধিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠল। সেই বছর থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত অবাধ ব্যবসা-নীতি কঠোর ভাবে সমালোচিত, পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দেখা গেছে, বাণিজ্যিক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেরাই আত্ম-আরোপিত নিয়ম সৃষ্টি করে এবং নানা ধরনের সমবায় গঠন করে অবাধ বাণিজ্যের বাজার সংযত করে রাখার চেষ্টা করেছে।

পপুলিষ্ট আন্দোলন রাজনীতি এবং সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন দ্বারা যে কি পাওয়া সম্ভব তার একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতিকে উপহাস করে 'পপুলিজম' ১৮৯০ দশকের মন্দার বাজারে সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পপুলিষ্টরা ব্যবসায়ে সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। প্রশস্ততর ধনবণ্টনের নীতির দাবী জানিয়ে তাঁরা সরকার-পোষিত ঋণের জন্য আবেদন জানালেন। তা'ছাড়া, স্বচ্ছল অর্থ সরবরাহ, ক্রমিক হারে আয়কর, দিনে আট ঘণ্টা মজুরী, গোপন ব্যালট ইত্যাদির জন্য এবং রেলপথ ও অন্যান্য স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসায়কে সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসার জন্য তাঁরা দাবী জানালেন।

পপুলিজমের অন্যতম অগ্রণী প্রবক্তা ছিলেন নেব্রাস্কার অধিবাসী উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য ইনি ডেমোক্রাটিক দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। সেই বছর 'চীপ মনি' বা সস্তাদরের টাকার নীতি নিয়ে ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে বিভেদ জেগেছিল। মনোনয়ন সম্মেলনে ব্রায়ান স্বর্ণমুদ্রার পরিপূরক হিসাবে রৌপ্যমানের প্রবর্তনের স্বপক্ষে বলেন, তিনি সমগ্র বিষয়টিকে ধনী এবং দরিদ্র মজুরশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বলে চিত্রায়িত করেন। এই সম্মেলনে তিনি এক আবেগময়ী ভাষণে সকলকে মাতিয়ে দিলেন, এই ভাষণে তিনি 'স্বর্ণ' প্রতিনিধিদের উদ্দেশ করে বললেন: "আপনারা মজুরদের ওপর এই কণ্টক-মুকুট জোর করে পরিয়ে দিতে পারবেন না। মানব-সমাজকে এই সুবর্ণমণ্ডিত ক্রুশে আপনারা বিদ্ধ করতে পারবেন না।"

এই জাতীয় আবেগপূর্ণ বক্তৃতার ফলে ব্রায়ান প্রচণ্ড সমর্থন লাভ করলেন, বিশেষতঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণের ক্ষুদ্র চাষীদের কাছে। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেনি, যার ফলে তিনি প্রেসিডেণ্টের আসনে নীত হতে পারেন নি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রিপাবলিকান প্রার্থী উইলিয়াম ম্যাক্‌কিনলের কাছে ব্রায়ান পরাজিত হওয়ার পর পপুলিজম আন্দোলনের অনেকখানি শক্তি হ্রাস পেল।

সংস্কারের দাবী কিন্তু অবিচল রইল। শতাব্দীর সূচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের কাল পর্যন্ত 'প্রোগ্রেসিভ' বা প্রগতিবাদীরা এই দাবী সজীব রাখলেন। প্রোগ্রেসিভদের উৎপত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পপুলিষ্টদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। পপুলিজম কৃষি-সংক্রান্ত অসন্তোষের সমর্থন

পেয়ে হতাশা এবং বিপর্যয়ের ফলে বৃদ্ধি পায়, প্রোগ্রেসিভিজমের শিকড় ছিল প্রধানতঃ নগরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এবং আর্থনীতিক উন্নতি এবং সাধারণ সমৃদ্ধির কালে তার বিকাশ ঘটে।

প্রগতিবাদীদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের মানুষ। এই আন্দোলন উচ্চ-শিক্ষিত রক্ষণশীল, কৃষিজীবী উদারনীতিক এবং পেশাদার রাজনীতিকদের আকৃষ্ট করেছিল। প্রধানতঃ, প্রগতিবাদীরা অবশ্য ব্যবসার কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়া, আগত বাস্তুকামীদের সমাজে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি ইত্যাদির সমস্যাবলী নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে।

রাজনৈতিক প্রগতিবাদীরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পুনর্প্রতিষ্ঠার কথা এবং সরকারি শাসনক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ফিরিয়ে আনার কথা বলতেন। তাঁরা সরকারি পদের জন্য সঙ্গত প্রার্থীর প্রত্যক্ষ প্রাথমিক মনোনয়ন এবং সেই সঙ্গে গণভোট ও 'প্রত্যক্ষ' (direct) গণতন্ত্রের অন্যান্য কৌশল সমর্থন করতেন।

অন্যান্য প্রগতিবাদীরা একটা 'প্রেসার গ্রুপ' বা চাপ দেওয়ার গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিলেন, যথা ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার কমিটি, ন্যাশনাল কনসিউমার'স লীগ এবং জেনারেল ফেডরেশান অব উইমেনস্ ক্লাবস্। এই সব এবং এই জাতীয় অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান আন্দোলন শুরু করলেন এমন সব 'রাজ্য আইনে'র প্রস্তাব করে, যাদের দ্বারা নারী ও শিশুদের সংরক্ষণের, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের এবং এমন কি ন্যূনতম বেতন নির্ধারণেরও ব্যবস্থা হল। ১৯০২ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে ৪৩টি অঙ্গরাজ্য শিশু-শ্রমিক আইন গ্রহণ করলেন মুখ্যতঃ এই সব প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর দাবীতে।

অন্যান্য প্রগতিবাদীরাও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী থেকে এসেছিলেন এবং তাঁরা noblesse oblige বা সম্ভ্রান্ত জনের দায়িত্বগত ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিলেন সংবেদনশীল ব্যবসায়-নেতা। তাঁদের আশঙ্কা ছিল গুরুতর পরিবর্তনের। তাই তাঁরা মধ্যপন্থী মৃদু ধরনের পরিবর্তনের স্বপক্ষে ছিলেন। থিওডোর রুজভেল্ট ছিলেন সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভূত রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী, তিনি এই সম্প্রদায়ের মতামতকে চিন্তানুগভাবে প্রকাশ করেছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন: "বর্তমান কালের সামাজিক অবস্থা আমি মোটেই পছন্দ করি না। অতিধনী মানুষের অসার, মন্দদৃষ্টি

হঠকারিতা, তাদের লোভ এবং ঔদ্ধত্য, এবং যে পথে তারা অনায্য ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে দক্ষ ব্যবহারজীবির সাহায্যে এবং মাঝে মাঝে বিচারকের দুর্বলতা এবং দূরদৃষ্টিব অভাবেব সুযোগে, আমি তা' অপছন্দ কবি· এই সব এবং ব্যবসা এব রাজ-নীতিতে অসদাচাব জনসাধারণের মনে একটা অস্বাস্থ্যকব উত্তেজনা এবং বিবক্তিব সৃষ্টি কবেছে। এব আংশিক ফল দেখা যায় সমাজবাদী প্রচাবেব প্রচণ্ড অগ্রগতিতে।'

থিওডোর রুজভেল্টের প্রগতিবাদের অন্তরে ছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদে'র বিরুদ্ধে সরকারি নীতি প্রয়োগ।



কর্ণেল থিওডোর রুজভেল্ট

"Rough Riders দলেব নেতা হিসাবে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের স্প্যানিস্-আমেবিকান যুদ্ধের কালে রুজভেল্ট একজন জাতীয় নেতা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। স্প্যানিস আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিউবাব সংগ্রাম থেকে এই যুদ্ধেব উদ্ভব। কিউবান যুদ্ধে কর্ণেল রুজভেল্ট যে খ্যাতি অর্জন কবে-ছিলেন তার ফলে ম্যাক্‌কিনলে যখন পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হলেন তখন রুজভেল্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রিপাবলিকান মনোনয়ন লাভ করলেন। এক বছব পবে ম্যাক্‌কিনলে নিহত হওয়াব পব রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হলেন। একজন কাজের মানুষ হিসাবে রুজভেল্টের প্রচণ্ড খ্যাতি ছিল। "মৃদুভাষী কিন্তু কঠোব"—এই খ্যাতি তাঁকে সংস্কারক এবং উচ্চাশিক্ষিত ব্যবসায়ীদেব কাছে জনপ্রিয় কবে তুলেছিল। রুজভেল্ট ছিলেন একজন পাকা রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী। তিনি 'উত্তম" এবং "মন্দ' অছি বা ট্রাষ্টেব পার্থক্য" বুঝতেন, তিনি ছিলেন "নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়াগিরি"ব প্রবক্তা এবং সামাজিক ন্যায় প্রবর্তনের জন্য সক্রিয়। সেই কালের প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্রে তাকে একটা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে বৃহৎ ব্যবসাব অন্যায়েব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অবস্থায়, অছি বা ট্রাষ্ট নিধনকাবী হিসাবে দেখানো হত।

থিওডোর রুজভেল্টের শাসনকালে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেই যুগের আইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি এবং অনিয়ন্ত্রিত আত্ম-স্বার্থের অন্বেষণে জনগণের সুবিধালাভ ঘটে —এই ধারণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জ্ঞাপন করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়। আন্তরাজ্য বাণিজ্য আইন বা ইনটারস্টেট কমার্স এ্যাক্ট কয়েকবার সংশোধিত হয়।

উইলসনের 'নয়া স্বাধীনতা' নীতির দ্বারা প্রতিযোগিতা সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা পরিদর্শকের নয়, মধ্যস্থের—এই স্থির হয়।



উড্রো উইলসন

রুজভেল্টের সংস্কারের প্রতি আগ্রহ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর যেন আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে। রুজভেল্টের মনোনীত উত্তরাধিকারী উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফ্‌টের রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হওয়ায় ১৯১২-র জুন মাসে একটি প্রগতিবাদী প্রোগেসিভ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই দল রুজভেল্টকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন দান করেন।

এর ফলে, টাফ্‌ট এবং রুজভেল্টের মধ্যে রিপাবলিকান ভোট ভাগাভাগি হয় এবং ডেমোক্রাটিক প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁদের প্রার্থী ছিলেন উড্রো উইলসন, তিনিও সংস্কারমূলক কর্মসূচীর স্বপক্ষে ছিলেন। উইলসন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে স্বদেশবাসীকে বলেন: "আমরা আমাদের শিল্পগত সাফল্যের জন্য গর্বিত। কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত এই সাফল্যের মানবিক মূল্য কতখানি দিয়েছি তার সুচিন্তিত হিসাব-নিকাশ করিনি।" এই বিবৃতিতে তিনি 'নয়া স্বাধীনতা' কর্মসূচীর কথা বলেন, এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা রদ করা এবং "নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা"র একটি পদ্ধতি গঠন করে তোলা।

পরে, তাঁর কর্মকালে প্রেসিডেণ্ট উইলসন কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতার কথা বলেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "সরকারকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আর বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রের (body politic) প্রথমতম ন্যায়নীতি যে সর্বসাধারণের জন্য সমান ব্যবস্থা, তা' সম্ভব হবে না, যদি না শিল্পগত এবং সমাজগত বিরাট পরিবর্তনের ফলাফলের হাত থেকে নর-নারী ও শিশুদের জীবনকে বর্মাবৃত করা যায়···কেননা এই অবস্থাকে পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করার বা তার সঙ্গে তাল রেখে চলার ক্ষমতা তাদের নেই।"

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের প্রথম শাসনপর্বের কাহিনী হল ধারাবাহিক সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের কাহিনী। সেরম্যান অ্যাণ্টিট্রাষ্ট এ্যাক্টের কিছু পরিমাণ অসঙ্গতি দূর করার জন্য প্রবর্তিত হয় 'ক্লেটন এ্যাক্ট', যা বিশেষ ভাবে শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কৃষিমূলক সমবায়কে এর আওতা থেকে রেহাই দান করে। ১৯১৩-র ফেডরেল রিজার্ভ এ্যাক্ট একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির কাঠামো স্থাপন, বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষমতা হ্রাস এবং অর্থ সরবরাহের ওপর সরকারি নিযন্ত্রণকে দৃঢ়তর করে। 'আনডারউড ট্যারিফ' নামক আমদানি শুল্ক-ব্যবস্থা ছিল গৃহযুদ্ধোত্তর কালের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নিম্নগামী হার। অধিকন্তু, এডামসন এ্যাক্ট রেলকর্মীদের জন্য দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত করে, আর ফেডরেল ফার্ম লোন এ্যাক্ট কৃষকদের সস্তা হারে ঋণগ্রহণের সুযোগ দান করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফেডরেল ট্রেড কমিশন যার দ্বারা সরকারি নিযন্ত্রণ নীতিকে (public regulation) উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কমিশনের কর্তব্য ছিল একচেটিয়া কারবারের প্রসার রোধ এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার নিরোধ করা।

পরিশেষে, দু'টি সাংবিধানিক সংশোধন গৃহীত হয়, প্রথমটির দ্বারা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল আয়কর নির্ধারণে ক্ষমতা দান করা এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা পূর্বে রাজ্য বিধান সভা কর্তৃক নির্বাচিত সেনেটরদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নীতি গৃহীত হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে উড্রো উইলসনের প্রথম পর্বের কার্যকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে এটা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ আমেরিকান জনগণের স্বাধীনতা সংরক্ষণে এবং অধিকতর সুযোগ দানের ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছে। উইলসনের দ্বিতীয় পর্বের কার্যকালে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে আভ্যন্তরীণ সমস্যার মধ্যে অধিকতর বিজড়িত না থেকে বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে একটা দায়িত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করল।

বিশ্ব প্রাঙ্গণে যুক্তরাষ্ট্র

১৮৭০ থেকে ১৯১৪, এই সাড়ে চার দশকের মধ্যে পৃথিবীর শক্তিব ভারসাম্যের নাটকীয় পট-পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক উপনিবেশের অভ্যুদয়ে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাব ফলে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—কাঁচা মালের উৎস হিসাবে এবং সস্তা কারখানাজাত জিনিষপত্রের তৈরী বাজার রূপে। এই সব দ্রব্যাদির প্রয়োজনে এবং বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা ক্রমশঃই কঠোরতর হয়ে ওঠে এবং উদীয়মান শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনের প্রাধান্যকে 'চ্যালেঞ্জ' জানায়। যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই সব শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিগুলির অন্যতম। অবশ্যম্ভাবী কারণে যুক্তরাষ্ট্র এই বিশ্ব সংঘাতের একটা অংশীদার হয়ে উঠল।

গৃহযুদ্ধের আগে, যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতি মুখ্যতঃ কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ের দ্বারা এবং 'কন্টিনেন্টালিজম' বা আভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিক সম্প্রসারণের প্রয়োজনেব দ্বারা প্রভাবিত হত। শিল্পায়ন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে একটা নতুন দিকে অর্থাৎ বৈদেশিক সম্প্রসারণের দিকে প্রসারিত করল। এই পরিবর্তন প্রথমটায় অতিশয় মন্দগতি হলেও, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মন্দার যুগের পর এবং অতি-উৎপাদনজনিত সংকটের পর অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী দু'টি দশকে জাতির দৃষ্টি লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এবং অপেক্ষাকৃত অল্পাকারে ইউরোপের দিকে প্রসারিত হল।

বাণিজ্য এই যুগের সম্প্রসারণশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৬৯ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য বাস্তবিক ভাবে জাতীয় আয়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সকল প্রকার রপ্তানি এবং আমদানির ডলার মূল্য ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৮০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪২০ কোটি ডলারে পরিণত হল। কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত এবং শিল্প ও যানবাহন ব্যাপারে দ্রুত পরিবর্তন এই বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণের দাবীর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রূপে কাজ করেছিল।

শিল্পোন্নয়নের ফলে আমদানী ও রপ্তানি উভয়েরই ধরন-ধারন পাল্‌টে যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পজাত পণ্যাদি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানির মাত্র ২০ ভাগ। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির অর্ধেক এই শ্রেণীর অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায়। এই একই কালে শিল্পজাত পণ্যের আমদানী আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইতিমধ্যে, শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচা মালের আমদানি, বিশেষতঃ উন্নতিশীল যন্ত্রাদির জন্য যে-সব বস্তুর প্রয়োজন, যথা রবার, উষ্ণ দেশজাত আঁশজাতীয় বস্তু, নিকেল, টিন এবং অন্যান্য ধাতু ক্রমশঃই গুরুত্ব লাভ করেছে।

গৃহযুদ্ধের পর, ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য ক্রমশঃই কমতে থাকে, যদিও তখনও যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যাদির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল ইউরোপীয় দেশসমূহ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৭৭ ভাগ রপ্তানি চালান যেত ইউরোপে; ১৯১৪-র মধ্যে সেই অঙ্ক হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬৩ ভাগে দাঁড়ায়।

লাতিন আমেরিকা, কানাডা এবং দূরপ্রাচ্য, আমেরিকান দ্রব্যাদির বাজার এবং প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎস উভয় রূপেই এই ফাঁকটা গ্রহণ করল। এই লাতিন আমেরিকায় এবং দূরপ্রাচ্যে অবশ্য ইংলণ্ড, জার্মানী এবং অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল সবচেয়ে তীব্র। এর ফলে, আমেরিকান রপ্তানিকার সম্প্রদায় এমন এক বৈদেশিক নীতির দাবী জানাল যার দ্বারা এই সব অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি করা যায়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মন্দার সময়ে যখন কয়েকটি শিল্পজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ কমে এল, তখন এই চাপ আরও প্রবল হয়ে উঠল। রপ্তানিকারকগণ তাদের দাবী প্রবলতর করলেন যে, সরকার যেন বাণিজ্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, আমেরিকান পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধাচারণ রোধ করেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-দূত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। জাহাজ-মালিকরা এই ঐকতানে যোগ দিলেন। তাঁরা পণ্যবাহী জাহাজের জন্য সরকারি সাহায্য দাবী করে আন্দোলন করলেন।

লগ্নীকারকরা হয়ে উঠলেন আর এক দাবীদার গোষ্ঠী। তাঁরাও বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর আমেরিকান মূলধনের বিদেশে লগ্নীকরণ ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূণ হয়ে উঠল। ১৯০০ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্যানাডা, মেক্‌সিকো, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বিশেষতঃ কাঁচামাল সম্পদ ও যানবাহন-ব্যবস্থায় এই জাতীয় লগ্নীর পরিমাণ ৪৪ কোটি ৫ লক্ষ ডলার থেকে ১০০ কোটি ৭০ লক্ষ

ডলারে বেড়ে যায়। পরবর্তী দু' বছরে এই অঙ্ক ২০০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে ফেঁপে ওঠে।

'ম্যানিফেষ্ট ডেষ্টিনি' বা প্রকট ভবিতব্যতার একটা নতুন মনোভঙ্গী আত্ম-প্রকাশ করল—আর্থনীতিক উদ্দেশ্য, মানবপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের এ এক বিচিত্র সমন্বয়। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে উদ্ভূত এ একটা নতুন মনোভঙ্গী মাত্র নয়। প্রায় শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাভিমুখী সম্প্রসারণে এই মনোভাবকে এই বলে সমর্থন করা হয়েছে যে—"আমাদের প্রকট ভবিতব্য হচ্ছে···ঈশ্বর-প্রদত্ত এই মহাদেশের সর্বত্র আমরা আমাদের ক্রমবর্ধমান অগণিত জনসাধারণের কল্যাণার্থে ছড়িয়ে পড়ি।"

এই পশ্চিমাভিমুখী অভিযান সম্বন্ধে বহু সীমান্তবাসীর মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল টোকেভিল বর্ণিত "প্রভিডেন্সিয়াল সলেমনিটি" বা "দৈবিক পুণ্যানুষ্ঠান" বিষয়ে।

মহাদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র অধ্যুষিত হয়ে ওঠার পর এবং উন্মুক্ত জমি নিঃশেষিত হওয়ার পর, আমেরিকানরা বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা অবশ্য কোনোমতেই জাতীয় উন্মাদনায় পরিণত হয়নি। গৃহযুদ্ধের কাল থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকায় আমেরিকার জনসাধারণের মনে বহির্বিশ্ব থেকে একটা বিচ্ছিন্নতার মনোভাব গড়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে, যে কূটনৈতিক চালের দ্বারা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা আলাস্কা অঞ্চল, এই যুগে অধিকার করা হল, তা' কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে এক নির্বোধ কর্ম বলে নিন্দিত হয়েছিল।

কিন্তু শতাব্দীর শেষ ভাগে, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এবং ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ভঙ্গী এবং অপর মানুষের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রগত ভাবধারার বিকাশে সহায়তা করা আমেরিকার বিধি-নির্দিষ্ট কর্তব্য—এই মনোভাবের পুনরুজ্জীবনের ফলে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব রূপান্তরিত হয়েছে সম্প্রসারণের প্রচণ্ড উৎসাহে।

এই সব চাপের ফলে যুক্তরাষ্ট্র দুই মহাসমুদ্রের অনেক ভূমি অধিকার করে এবং সংরক্ষিত অঞ্চল তৈরী করে। তা'ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান স্বার্থ সংরক্ষণে একটা দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের একটি বন্দর এবং

নৌঘাঁটি প্যাগো প্যাগো অধিকার করা হল; ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে-সব অঞ্চল এখন আমেরিকান স্যামোয়া নামে পরিচিত, সেই সব স্যামোয়া দ্বীপপুঞ্জ সংযুক্ত করা হল। বিচ্ছিন্নতার সমর্থক এবং সম্প্রসারণবাদীদের মধ্যে একটা তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী বাদানুবাদের পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব যখন সোজাসুজি 'মনরো ডক্‌ট্রিনে'র কথা গ্রেট ব্রিটেনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন ব্রিটিশ সরকার ভেনেজুয়েলার বিতর্কিত অঞ্চল সম্পর্কে তার দাবী-দাওয়া ত্যাগ করলেন। আন্তঃ-আমেরিকান সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে গঠিত প্যান-আমেরিকান ইউনিয়নের অন্যতম ফল হল যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। স্প্যানিস-আমেরিকান যুদ্ধের ফলে কিউবা স্বাধীনতা অর্জন করে এবং পুয়েরটো রিকো একটি আমেরিকা-অধিকৃত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে নতুন জগৎ থেকে স্পেনীয় উপনিবেশবাদের শেষতম চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধের ফলে আমেরিকা মধ্য-প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপ গুয়াম অধিকার করে এবং ২ কোটি ডলারের বিনিময়ে সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ত্যাগ করার জন্য স্পেনকে বাধ্য করে।

এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে সাম্রাজ্যবিরোধী একটা কট্টর গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক মনোভাব সম্পর্কে ভদ্র ভাবে প্রশ্ন করতে থাকে। তাঁরা স্পেনের সঙ্গে কিউবার সংঘর্ষে এবং হাওয়াই-এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন। ফিলিপাইন সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, কারণ তাঁদের মতে স্প্যানিস অধিকারে ফিলিপিনোরা যেমন অখুসী ছিল, আমেরিকান অধিকারেও তাদের সেই অখুসী মনোভাব থাকবে।

এদিকে সম্প্রসারণবাদীরা যখন এই রাজ্যবিস্তারকে একটি 'বৃহৎ, কঠিন এবং মহৎ কর্ম' বলে অভিহিত করছিলেন, তখন স্বতন্ত্রবাদীরা সবিস্ময়ে চিন্তা করছিলেন কি ভাবে একটা বিদেশী জাতিকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করা সম্ভব, মার্কিন স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির সঙ্গে কি করে এই কাজকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব। তবে এই কালে স্বতন্ত্রবাদীরা কিন্তু কালের গতির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, আঞ্চলিক সম্প্রসারণের দাবীর কল-কোলাহলে তাদের কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছিল।

নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভিক বছরগুলিতে থিওডোর রুজভেল্ট একটি সুদৃঢ় বৈদেশিক নীতির একজন স্পষ্টবাদী প্রবক্তা হয়ে উঠলেন। তাঁর কার্যকালের

প্রথম পর্বে রুজভেল্টের প্রিয় পরিকল্পনা ছিল পানামা যোজকের ওপর একটি খালের অধিকার গ্রহণ করা, সেকালে এটি কলম্বিয়ার একটি প্রদেশ ছিল।

১৯০৩-এর মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করল। এর ফলে ছ'-মাইল প্রশস্ত একটি খাল অঞ্চল ৩৩ কোটি ডলার নগদ মূল্য এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার বার্ষিক করের বিনিময়ে কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করল। কলম্বিয়া সেনেট কিন্তু এই দেয় অর্থের পরিমাণ আরও বাড়া উচিত বলে মনে করলেন এবং চুক্তিপত্রটির বৈধীকরণে অস্বীকৃত হলেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে পানামার অধিবাসীরা কলম্বিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। যদিও অধিকসংখ্যক পানামাবাসী কলম্বিয়ার শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলেন, তবু এই বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে দমন করা যেত, যদি না মার্কিন নৌবাহিনী যোজকের ওপর দিয়ে কলম্বিয়ার সৈন্য চলাচলের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত। অতঃপর পানামা কলম্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং অতি শীঘ্র যে চুক্তি কলম্বিয়ার সেনেট এর আগে বাতিল করেছিল, স্বাক্ষরদানে সেটাকে বৈধ করে।

খাল নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে রুজভেল্ট অনুভব করলেন যে, ক্যারিবিয়ানের সঙ্গে আমেরিকান সম্পর্ক সুদৃঢ়তর করা প্রয়োজন। মনরো নীতির পুনঃপ্রয়োগ করে তিনি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, মধ্য আমেরিকার কোনো ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না। তবে যেখানেই প্রয়োজন, ক্যারিবিয়ানের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিল।

'ইয়াঙ্কি ইমপিরিয়ালিজম'-এর বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকায় বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তার ফলে দুই আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট টাফ্‌ট এবং উইলসনের কার্যকালেও এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব হ্রাস পায়নি। লাতিন আমেরিকার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক 'ডলার ডিপ্লোম্যাসি' নামে চিহ্নিত ছিল—এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ মধ্য-আমেরিকান সাধারণতন্ত্রগুলিতে আমেরিকান ব্যাঙ্কসমূহের প্রদত্ত ঋণের সংরক্ষণের ভার নিয়েছিল। এর ফলে, যখন এই সব দেশসমূহের কোনটার আর্থনীতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হত, যুক্তরাষ্ট্র-সরকার তখন সেখানে পদক্ষেপ করতে বাধ্য হতেন তার স্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাতে। মনরো নীতির এই একতরফা প্রয়োগ বাতিল করে অন্য

একজন রুজভেল্টের লাতিন আমেরিকার প্রতি সু-প্রতিবেশী (good neigh-bour) নীতি গ্রহণ করার কাল পর্যন্ত, যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি।

লাতিন আমেরিকায় যখন এই সব ঘটছিল, যুক্তরাষ্ট্র তখন পূর্ব এশিয়ায় তার প্রভাব প্রসারিত করতে চেষ্টা করছিল। এই দূরপ্রাচ্য নীতি চীনের বাজার এবং বিশেষ করে সম্পদ-সমৃদ্ধ মাঞ্চুরিয়ার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের দশকের শেষ ভাগে চীন সাম্রাজ্যে রাশিয়া, জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন এবং সেই সঙ্গে জাপানের অবৈধ অধিকার শুরু হল। চীনের টলটলায়মান রাজনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে চীনের বাজার উন্মুক্ত রাখাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার প্রয়াসে, পররাষ্ট্র সচিব জন হে চীনের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত 'ওপেন ডোর নোটস' পাঠালেন, এই নোটের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এই সব শক্তির প্রভাবাধীন অঞ্চলে বাণিজ্য করার সমানাধিকারের দাবী জানাল। এক বছর পরে, চীনের উন্মত্ত বিদেশী-বিরোধী 'বক্সার বিদ্রোহ' সত্ত্বেও চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'ওপেন ডোর' বা মুক্তদ্বার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আরও এক ধাপ অগ্রসর হল এবং চীনে ভবিষ্যতে বিদেশী হস্তক্ষেপ নিরুৎসাহিত করল।

মুক্তদ্বার নীতির সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল প্রতিযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের মধ্যে একটা প্রকৃত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমেরিকার সামর্থ্যের উপর। উত্তর চীনে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে থিওডোর রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের জন্য একটা নিশ্চিত মুক্তদ্বার পাওয়ার আশা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তার ভার একটি দিকেই বেশী করে চাপিয়েছিল, ফলে এই অঞ্চলে জাপানীরা প্রতিপত্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়।

প্রেসিডেন্ট টাফ্ট তখন আর এক কৌশল গ্রহণের পক্ষপাতী হলেন—চীন ও মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ এবং ব্যাঙ্কগুলিতে বেসরকারি আমেরিকান অর্থ লগ্নী করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু আবার সরকার ব্যর্থ হলেন। শক্তিশালী ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ এবং জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তা' থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বারবার পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণে অবস্থা চরমে না পৌছোন পর্যন্ত, এই অবস্থাই সমানে চলেছে।

১৮৭০ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার বহির্জাগতিক সম্প্রসারণের সম্পর্কে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক না কেন, একটি জিনিষ কিন্তু সুস্পষ্ট হল। আমেরিকা বিশ্বশক্তির অন্যতম হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমেরিকার রপ্তানি আমদানীকে ছাড়িয়ে গেছে, আর মূলধন এবং পণ্যদ্রব্য—দুই-ই সে রপ্তানি শুরু করেছে। রাজনৈতিক দিক থেকেও আধুনিক নৌবাহিনী এবং সুদূরবিস্তারী সমুদ্রপারস্থ অধিকৃত ভূমি এবং সংরক্ষিত অঞ্চলের (protectorates) অধিকারী যুক্তরাষ্ট্র এক দুদমনীয় শক্তি ছিল। এক নতুন মহাদেশে যে দুর্বল এবং টলটলায়মান রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছিল, আশেপাশের গুরুতর সংকটের মধ্যে যার পক্ষে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল, সে এখন পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে একটা দানবীয় বিরাটত্ব লাভ করেছে।

তৃতীয় ভাগ

শক্তি
ও
দায়িত্ব

শক্তি ও দায়িত্ব

॥ বিশ্ব সংঘর্ষের প্রতিঘাত ॥

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র আবস্মিক বিস্ময়ে মগ্ন হয়েছে। সমুদ্রপারের বিবিধ প্রচেষ্টা আমেরিকার জনগণের মধ্যে বৈদেশিক ব্যাপারে নতুন আগ্রহের সঞ্চার করেছিল সত্য, কিন্তু ইউরোপের যে জটিল মৈত্রীবন্ধন এবং আঁতাত (entente) বা মাখামাখি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শক্তিপরীক্ষার উদ্ভব ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোনো রকম নজর তারা দেয়নি।

মিত্রপক্ষের স্বপক্ষে আর্থনীতিক দিক থেকে বিস্তৃত ভাবে আমেরিকা বিজড়িত থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট উইলসন যুদ্ধের প্রথম বছরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কিন্তু উইলসনের পক্ষে এই নিরপেক্ষ ভঙ্গী বজায় রাখা ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠল। নিরপেক্ষ বেলজিয়ামের উপর জার্মান আক্রমণ এবং রণকেন্দ্রে অস্ত্রহীন যুক্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ও যাত্রী-জাহাজে জার্মান সাবমেরিনের নিরন্তর আক্রমণ আমেরিকার জনগণকে উত্তেজিত করে তুলল। ১১৪ জন আমেরিকান সহ ১১৫৩ জন যাত্রী-বোঝাই ব্রিটিশ যাত্রী-জাহাজ লুসিটানিয়া ডুবিয়ে দেওয়ার পর একটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠল। এই কোলাহলের মধ্যে, উইলসনের পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, যিনি নিজে একজন উগ্র রকমের স্বতন্ত্রবাদী ছিলেন এবং যিনি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে কোনো রকম ভাবে বিজড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই আপত্তি করে আসছিলেন, তিনি পদত্যাগ করলেন।

এই সময় থেকে উইলসন মার্কিন জাহাজসমূহে জার্মান আক্রমণের জন্য জার্মানীকে "কঠোর ভাবে দায়ী করা হবে" বলে হুঁসিয়ারী দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁকে যে পথ অনুসরণ করতে হল তার ফলে তিনি কংগ্রেসকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুরোধ করলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, উইলসন একরকম মরিয়া হয়ে ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের কাছে "বিজয়হীন শান্তি"র দ্বারা সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন

জানাচ্ছিলেন। এখন তাঁর সমস্ত উৎসাহ নতুন খাতে প্রবাহিত হল। "পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তোলার জন্য" তিনি সংগ্রাম শুরু করলেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সুদূরপ্রসারী আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের এবং সম্পদ বণ্টনের যুদ্ধকালীন কার্যসূচী আমেরিকান ইতিহাসে অভূতপূর্ব। গৃহযুদ্ধের কালে ইউনিয়ন এবং কনফেডারেট সরকার তাঁদের স্ব-স্ব অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন। 'প্রোগ্রেসিভ এরা' বা প্রগতির যুগে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে যে-সব অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা' রোধ করার জন্য প্রচুর আইন-বিধি আরোপ করা হয়। কিন্তু তার কোনোটাই প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ আবোপিত হয় তার মত ব্যাপক ছিল না।

বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুক্তবাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ইউরোপীয় যুদ্ধরত শক্তিবর্গের কাছে পণ্যদ্রব্যের বিক্রি এবং ঋণদান দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। জানুয়ারী ১৯১৫ থেকে এপ্রিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মিত্রগোষ্ঠী একাই প্রচুর মার্কিন অর্থঋণ গ্রহণ কবেন। তার ফলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্রয়-ক্ষমতা ৫০০ কোটি ডলাব বৃদ্ধি পায়। সেই কালেব যুক্তবাষ্ট্রেব জাতীয় আয়ের এটা কিন্তু একটা বিরাট শতাংশ।

ইউরোপে সংঘর্ষ শুরু হতেই মিত্রশক্তিবর্গ প্রভূত পবিমাণে যুক্তরাষ্ট্রেব সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যাদির জন্য তাঁদের চাহিদাব ফলে আমেরিকায় একটা 'তেজী' বাজাব উদ্ভূত হল এবং তার ফলে একটা বিভ্রান্তির সংকট উপস্থিত হল। আমেরিকান ফ্যাক্টরিগুলিতে কাঁচা মালের বিশেষ অভাব ঘটল। প্রচুর পরিমাণে সববরাহের নির্দেশ জমে উঠতে লাগল। শ্রমিকের ঘাটতি এবং ধর্মঘটেব সংখ্যা বেড়ে গেল। ইউবোপে চালানের জন্য জমে-ওঠা পণ্যদ্রব্য পূর্ব-সমুদ্রোপকূলে বয়ে-নিয়ে-যাওয়া রেলপথ-সমূহের ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। যুদ্ধ যতই এগোতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে মিত্রশক্তিবর্গের সঞ্চিত অর্থ ততই দ্রুত তালে হ্রাস পেতে থাকে; ফলে মোটা ক্রয়ের মূল্য দেওয়ার সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপ অব্যাহত থাকায় দ্রব্যমূল্য তীব্র ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে একটা সুপরিকল্পিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই সব আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এর

ফলে, কংগ্রেস একটা প্রস্তুতি কর্মসূচী পরিচালনার জন্য 'কাউন্সিল অব ন্যাশনাল ডিফেন্স' প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র যখন যুদ্ধে নামলেন তার আগেই এই কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় বহু যুক্তরাষ্ট্রীয় এজেন্সী স্থাপিত হয়ে গেছে। এরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার দ্রুত প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। বিভিন্ন প্রতিনিধি গোষ্ঠীর পুরোধা হিসাবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এক-একজন শিল্পের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, 'ডলার-এ-ইয়ার'—বছরে-এক-ডলার মানুষ এঁরা। এঁদের এই নামকরণের হেতু এই যে, তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলেন।

মহাজন এবং আর্থনীতিক বিষয়ে সরকারের একজন শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা, মহাযুদ্ধের কালে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সম্পদ সমাহৃত করার গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়।



বার্নার্ড এম. বারুচ

ওয়ার ইনডাস্ট্রিজ বোর্ডের ওপর ভার পড়ল শিল্প-সম্প্রদায় এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার, এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মহাজন বার্নার্ড বারুচ। এই বোর্ড যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তব্য সকল প্রকার সমরকৌশলোপযোগী এবং দুষ্প্রাপ্য কাঁচা মালের একটা তালিকা প্রস্তুত করলেন। পৃথিবীর চতুর্দিকে ক্রেতা-প্রতিনিধি পাঠিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মাল কেনার বন্দোবস্ত করা হল। চাহিদার খতিয়ান করে সর্বাগ্রগণ্য প্রয়োজন ব্যবস্থা নির্ধারণ করে স্থির করা হল, যেখানে সর্বাধিক প্রয়োজন সেখানেই কাঁচা মাল পাঠানো হবে। যে দরে এই সব দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হবে বোর্ড তার মূল্য বেঁধে দিলেন এবং উৎপন্ন মালের বিতরণ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করে দিলেন। অধিকন্তু, এই বোর্ড উৎপাদকদের, তাদের উৎপন্ন পণ্যের ডিজাইন ও স্টাইলের সংখ্যা কমিয়ে আনতে উৎসাহ দিলেন। উৎপাদন

বৃদ্ধি করা এবং বিতরণ সহজ করে তোলার জন্য, উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছোটদের গাড়ী থেকে রান্নাঘরের নালী পর্যন্ত সবকিছু একটা বাঁধা ধবনে নির্মিত হতে লাগল।

মাল চলাচলের সুবিধার জন্য জাতির রেলপথগুলি অধিকার করে নিয়ে রেলরোড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হ'ল, এই সংস্থা বিভিন্ন রেলপথ গোষ্ঠীগুলিকে একটিমাত্র জাতীয় রেল-ব্যবস্থায় পরিণত করতে অগ্রসর হলেন। এর দ্বারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে হ্রস্বতর পথে মাল পাঠানো সম্ভব হল, গাড়ী এবং ইঞ্জিন যেখানে বেশী প্রয়োজন সেখানে পাঠানো গেল, এবং সব রেলকেই একই টার্মিনাল স্টেশন ব্যবহারে বাধ্য করা গেল। এই ব্যবস্থাপনার দ্বারা গড়পড়তা গাড়ীপিছু মাল-বোঝাই ব্যবস্থা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪·৯৬ টন থেকে বেড়ে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৯·২৮ টনে দাঁড়ায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকের মালগাড়ীর স্বল্পতা সেই বছরের শেষের দিকে ৩ লক্ষ গাড়ীর উদ্বৃত্ত অঙ্কে দাঁড়ায়।

হার্বার্ট হুভারের খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণ নিয়ামক সংস্থা বা ফুড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের এবং বিতরণের কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল। কয়েকটি দ্রব্যের সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেওয়া হল। খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পরিবর্তে হুভার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত "গমহীন" ও "মাংসহীন" দিন পালনে উৎসাহিত করে জনসাধারণকে দুষ্প্রাপ্য আহারের বিকল্প খাদ্য ক্রয়ে অনুরোধ করলেন। কয়েকটি বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন, বিশেষতঃ মদ্য এবং শর্করাজাতীয় দ্রব্য, নিয়ন্ত্রণ করা হল।

এই প্রথম সরকার-পরিচালিত যৌথ-ব্যবসায়িক সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হল. যুদ্ধকালীন এই উদ্ভাবনী কিন্তু গভীর ভাবে অর্থসূচক হয়ে উঠল। এই ধরনের সংস্থার দু'টি প্রধানতম দৃষ্টান্ত হল ইউনাইটেড স্টেটস্ গ্রেণ কর্পোরেশন এবং ইমারজেন্সী ফ্লীট কর্পোরেশন। এই দু'টি এজেন্সী বা প্রতিষ্ঠান যে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভঙ্গীতেই সংগঠিত এবং পরিচালিত হত, পার্থক্য শুধু এই যে তাদের মূলধন সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত এবং পরিচালকবৃন্দ স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। তাদের সাফল্য এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, যা 'গ্রেট ডিপ্রেশন' বা মন্দার যুগে কাজে লাগে।

প্রথম মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মোট খরচের পরিমাণ আনুমানিক ২৪শ' কোটি ডলার। অধিকন্তু, ৯০০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মিত্র দেশগুলিকে ঋণ

দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের সময়। সরকারের "স্বাভাবিক খরচে"র পরিমাণ ছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৩০০ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলারের মত। এ-কথা অর্থসূচক যে, জাতীয় ঋণের পরিমাণের প্রাক্-যুদ্ধকালীন অঙ্ক ছিল ১০০ কোটি ডলার। যুদ্ধে তা' বৃদ্ধি পেয়ে ২৬শ' কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌছোয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অগাষ্ট।

যুদ্ধে চাহিদা ভীষণ ভাবে বেড়ে যাবে—এই আশংকায় কংগ্রেস ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রেভিনিউ এ্যাক্ট পাশ করেন। এই নতুন আইন স্বাভাবিক আয়করের হার শতকরা ২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৪ ভাগে দ্বিগুণিত করেন, এবং তীক্ষ্ণ ভাবে ক্রমবর্ধমান আয়করের হার বেঁধে দেওয়ার ফলে যাঁরা আয়ের একেবারে সর্বোচ্চ ধাপে ছিলেন তাঁদের আয়কর হল শতকরা ৬৮ ভাগ। আবগারি কর এবং অতিরিক্ত লাভ কর (excise এবং excess profit tax) নির্মম ভাবে বৃদ্ধি করা হল। করের নতুন হার এবং সেই সঙ্গে বর্জিত আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপে, সরকারি কোষাগারে যা স্বাভাবিক ভাবে আসা সম্ভব ছিল তার চেয়ে ১০শ' কোটি ৭০ লক্ষ ডলার বেশী জমা পড়ল। লিবার্টি বণ্ড বিক্রির মাধ্যমে আরো ২১শ' কোটি ডলার পাওয়া গেল।

উচ্চ হারের কর-ব্যবস্থা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও, সাধারণ দ্রব্যমূল্যের হার সমগ্র যুদ্ধকালের ভেতর বেড়েই চলেছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের মোট পাইকারী দর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের দরের অনুপাতে শতকরা ৯৪.৩ ভাগ বেশী ছিল। সেই একই কালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০৮ ভাগ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৯৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

কৃষি এবং উৎপাদন-শিল্প উভয়ই বর্ধিত মূল্যের ফলে লাভবান হয়। খামার-মালিক কিংবা কৃষি-মজুরের আয় (কর দেওয়ার পরেও) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনকারকগণ, বিশেষতঃ যাঁরা সমরোপকরণ প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরাও লাভবান হলেন।

যুদ্ধের শেষে গড়পড়তা বার্ষিক বেতনজনিত আয়ের পরিমাণ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যা ছিল তার চেয়ে শতকরা ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তবে, এর দ্বারা এ বোঝায় না যে ক্রয়-ক্ষমতাও এই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পকর্মে নিযুক্ত মজুরদের ক্রয়-ক্ষমতা শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। সরকারি কর্মীরাও বেশ ক্লেশ ভোগ করেছেন, কারণ তাঁদের বেতনের হার আইনগত ভাবে বাঁধা ছিল এবং খুব অল্প কয়েক বারই তাদের বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করা

হয়েছিল। অনেক কর্মচারীর আয় আর করমুক্ত রইল না। ফলে আরো অসুবিধার সৃষ্টি হল।

হয়ত, সবচেয়ে নাটকীয় যুদ্ধকালীন আর্থনীতিক পরিবর্তন হয়েছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় রপ্তানির মোট মূল্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬০০ কোটি ২০ লক্ষ ডলারে বৃদ্ধি পায়। আর অন্যদিকে আমদানি বৃদ্ধি পায় ১০০ কোটি ডলারের সামান্য বেশী—অর্থাৎ ১০০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার থেকে ২০০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গ যুক্তরাষ্ট্রে ৮১ কোটি ডলার মূল্যের সোনা স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে, বহির্বিশ্বে আমেরিকান লগ্নীর পরিমাণ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬০০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারে পৌছোয়। এই একই কালে যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষিত বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৭০০ কোটি ২০ লক্ষ ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৩০০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারে পৌছোয়। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণদানকারী মহাজনী জাতিতে পরিণত হল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যুদ্ধের সমাপ্তির পর আমেরিকান জনগণের মনোভঙ্গীর এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। প্রাক্-যুদ্ধকালীন সম্প্রসারণবাদী উন্মাদনা এবং যে দেশপ্রেমমূলক মনোভাব মিত্রপক্ষের "স্বাধীনতা, মুক্তি এবং শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর" জন্য সংগ্রামকে সমর্থন করেছে, তা' এই বিরাট সংঘর্ষে নিঃশেষিত হয়ে যায়। যুদ্ধাবসানে জনগণ 'স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা'র জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তারা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা আবার সেই স্বাতন্ত্র্য-নীতির (যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে) নিরাপদ আড়ালে পশ্চাদপসরণ করাকে সর্বাপেক্ষা পছন্দ করল।

জনগণের ক্লেশভোগ ও ত্যাগস্বীকারের কথা ভুলে যাওয়ার এবং যুদ্ধোত্তর কালের অব্যবহিত পরবর্তী নতুন সমৃদ্ধি উপভোগের স্বাভাবিক প্রবণতা পশ্চাদপসরণের এই বাসনার আংশিক কারণ ছিল। আর একটি কারণ, নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তির মোহভঙ্গকারী চেহারা। শান্তি সম্মেলন অনেকটা মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হল। উইলসন পরিকল্পিত শান্তি-প্রচেষ্টায় মিত্র-শক্তিপুঞ্জের উৎসাহ ছিল অতি সামান্যই। কারণ, এই পরিকল্পনায় পরাজিত

শত্রুকে শাস্তি দানের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এই ভাবে সবপ্রথম আমেরিকার একটা আধুনিক যুদ্ধ এবং বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার মধ্যে নৈতিক দিক থেকে ব্যাপক ভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে যে বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল, গণতন্ত্রের পক্ষে তা' খুব মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে না। আমেরিকান জনগণ শীঘ্রই তিক্ত হয়ে উঠল এবং ইউরোপের সমস্যাবলীর প্রতি পিছন ফিরে দাঁড়াল।

প্রেসিডেন্ট উইলসন বৃথাই আমেরিকার দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার এবং জাতি-সঙ্ঘের জন্য তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করলেন। কিন্তু উইলসনের আন্তর্জাতিক ভাববাদের প্রতি জনগণের আর আগ্রহ ছিল না। এক তীব্র বিতর্কে জনসাধারণের মনোভাব প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠার পর সেনেট জাতি-সঙ্ঘে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ অগ্রাহ্য করলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে উইলসনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হল। স্পষ্টতঃ বোঝা গেল, রিপাবলিকানরা কালের মনোভঙ্গী অনুমান করেছিলেন। 'স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন' এবং 'আগের মত যথারীতি কারবার' প্রভৃতি আবেদন দ্বারা নির্বাচনী সংগ্রামের জিগীর প্রস্তুত করা হল এবং এই ভাবে তাঁরা তাঁদের প্রার্থী ওয়ারেন হার্ডিংকে তুমুল ভোটাধিক্যে 'হোয়াইট হাউসে' প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিকতার যুগের অবসান ঘটল, সেই সঙ্গে সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান ঘটল—যা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের নব-বিধান শাসন-ব্যবস্থা বা নিউ ডিল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আগে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি।

বিংশ দশকের 'স্বাভাবিকত্ব'

যুদ্ধজনিত বিশৃঙ্খলার জন্য পৃথিবীতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে সত্যকার "স্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তন" এক অসম্ভবের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল। ক্ষণকালের জন্য অবশ্য সেই স্বপ্ন সম্ভব হওয়ার একটা প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ঘটনাস্রোতের ধারায় সে স্বপ্ন বিদূরিত হল।

বিশাল সামরিক এবং শিল্পগত যন্ত্রপাতিকে শান্তিকালের ব্যবহারোপযোগী করে তোলার কাজ অবশ্য অভূতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হল। অতিদ্রুত এবং বিভ্রান্তিকর ভঙ্গীতে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণবিধি উঠিয়ে নেওয়ার ফলে যদিও দ্রব্যমূল্যের মান অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল, তবু সামরিক বাহিনী থেকে ছাঁটাই-এর প্রথমটা বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুসম্পন্ন হল। তীব্র রকমের ফেডরেল ব্যয় সংকোচ হওয়া এবং ৪০ লক্ষ সামরিক কর্মীর আবার শ্রমিকশ্রেণীতে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ১৯১৯ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কর্মসংস্থানের কোনো অভাব ঘটল না।

মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৬ লক্ষ লোক বেকার ছিল। এই সংখ্যা প্রাক্-যুদ্ধকালীন বেকারীর সংখ্যার গড়পড়তা হারের অনেক নীচে। এই অবস্থা অবশ্য পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেকখানি ভাগ্যগতিকে সম্ভব হয়েছিল। এটা সম্ভব হওয়ার কারণ—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয়সংকোচ এবং অতিরিক্ত কৃষি-উৎপাদনেব ফলে স্বাভাবিক ভাবে যে মন্দার সৃষ্টি হয়, এক নতুন ধরনের বেসামরিক শিল্পের সমৃদ্ধিতে এবং সম্প্রসারিত ইউরোপীয় রপ্তানির ফলে তা' অপসারিত হয়।

দুঃখের বিষয়, যুদ্ধোত্তরকালীন এই প্রাথমিক সমৃদ্ধি ছিল এক মিথ্যা উষার প্রত্যাশামাত্র। কৃষির ক্ষেত্রে একথা ছিল বিশেষ ভাবে সত্য। যুদ্ধকালের সরকার পৃষ্ঠপোষিত 'তেজী' বাজার এবং যুদ্ধের অনতিকাল পরে ঘরে এবং বাইরে খাদ্যের ঘাটতি খামার-উৎপাদন বিশেষ ভাবে বর্ধিত করল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গমের চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা যে মূল্য পেয়েছে তা' বর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সমতারও বেশী সুবিধা দিয়েছে এবং ফাটকামূলক

বন্ধকী কর্মের একটা জোয়ার আনার ফলে জমির দাম বেড়ে গেছে। যন্ত্রীকরণের ফলে উৎপাদন-ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পেল—কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষকের উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক বেড়ে গেল। এই কারণে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় কৃষি-ব্যবস্থা যখন সংকট থেকে ত্রাণ পেল, কৃষকরা তখন এক অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খামারজাত দ্রব্যের মূল্য শোচনীয় ভাবে মন্দা হয়ে এল, যুদ্ধকালীন হারের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ নীচে। যদিও কৃষি-সংগঠনীসমূহের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে তাদের দলীয় সংস্থা তৈরী করে, চিরাচরিত ভাবে কৃষকদের দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করলেন, তবু তাদের আন্দোলনের ফলে মাঝে মাঝে আইন প্রণীত হলেও, কৃষকদের দুর্গতি দূরীকরণে সেগুলি সামান্যই সহায়তা করল।

পল্লী-অঞ্চলের ক্রয়-ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় এবং প্রাথমিক যুদ্ধোত্তর ঘাটতি পূরণ হওয়ায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ শ্লথ হয়ে এল। ১৯২১-এ আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ ভীষণ ভাবে নেমে এল, তার ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ কর্মী বেকার হলেন এবং কারবার উঠে যাওয়ার হার বেড়ে গেল। কিন্তু কৃষির বাইরে, ১৯২১-এর এই মন্দা ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হল, তা অবশ্য সরকারের কোনো বিশেষ সরকারি ত্রাণ-ব্যবস্থার জন্য নয়, তার কারণ ছিল অর্থনীতি মুখ্যতঃ স্বাস্থ্যকর ছিল।

উইলসনের উদারনীতিক নেতৃত্বের অপসারণ এবং হার্ডিং-এর নেতৃত্বে রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা মেনে নেওয়াটা ছিল যুদ্ধোত্তর 'স্বাভাবিকত্বে'র নকল উষার আর এক দিক। দুঃখের বিষয়, জনগণ যার ওপর একনিষ্ঠ প্রত্যাশা রেখেছিল এবং যাকে এমন ব্যাপক ভাবে অভিনন্দিত করেছিল সেই শাসন-ব্যবস্থা কিন্তু তার ওপর আরোপিত বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি।

হার্ডিং শাসনের নয়া রক্ষণশীলরা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য জাতের মানুষ। পূর্ববর্তী যুগের সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এবং অবাধ ব্যবসা-নীতির অপপ্রয়োগ সম্পর্কে আন্তরিক ভাবে সচেতন থিওডোর রুজভেল্টের মত সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীলদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য ছিল অনেক। যুদ্ধোত্তর এই নয়া শাসনে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা ভীড় করেছিল।

হার্ডিং-এর কালের সরকারি অসদাচার গৃহযুদ্ধোত্তরকালীন পুনর্গঠন কালের দুর্নীতিকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে আলোড়নকারী কলঙ্কজনক ঘটনা যা

জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা' হল স্বরাষ্ট্র সচিবের বেসরকারি স্বার্থের হাতে সরকারি তৈলভূমি লীজ দেওয়ার সময় উৎকোচ গ্রহণের কাহিনীর প্রকাশ।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনগণের যদি কোনো রকম মোহভঙ্গ হয়ে থাকে ব্যবসায়িক মন্দা এবং সরকারি দুর্নীতি প্রকাশিত হওয়ার ফলে, তা' হয়েছিল কিন্তু অতি ক্ষণস্থায়ী। ১৯২৩-এর শেষ দিকে মন্দার কথা লোকে প্রায় ভুলে গেল এবং যুক্তরাষ্ট্র একজন নতুন প্রেসিডেন্ট বরণ করল।

হার্ডিং-এর মৃত্যুর পর, কেলভিন কুলিজ, যিনি স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছিলেন: "আমেরিকার কারবার, কারবারই," তিনিই প্রেসিডেন্ট হলেন। আবার আশা জাগলো, আগেকার নকল উষা অবশেষে নতুন দিনের উজ্জ্বলতর প্রভাত সূচিত করছে, যে দিন সমৃদ্ধি এবং প্রকৃত 'স্বাভাবিকত্ব' নিয়ে আসবে।

কিন্তু জনগণকে আবার হতাশ হতে হল। মহাযুদ্ধ তাদের জগৎকে তারা যতটুকু জানত তার চেয়ে বেশী পরিবর্তিত করেছিল। ব্যবসা, মজুর, কৃষি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে যুদ্ধ যে-সব জটিলতার সৃষ্টি করেছে সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়া সহজ ছিল না।

যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায়, জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যে-সব শিল্পের পরিচালনভার সরকার গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাফল্যের জন্য কৃষি এবং মজুরগোষ্ঠীর মধ্যে একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে, যুদ্ধের পরেও রেলপথগুলিকে সরকারের পরিচালনে রাখার দাবীতে। কিন্তু সোজাসুজি নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের পরিবর্তে রেলপথের নিয়ন্ত্রণের সরকারি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সেই সঙ্গে রেলপথ কোম্পানীগুলিকে সরকার অতিরিক্ত অর্থসাহায্য দান করে চলাচল-ব্যবস্থার ক্ষতি পূরণ করার জন্য।

রেলপথ এবং কয়েকটি শিল্প-সংস্থায় নিয়ন্ত্রণ চালু করার অর্থ এ ছিল না যে প্রাক্-যুদ্ধকালীন প্রগতির কালের 'স্বাভাবিকত্বে' প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। অবাধ ব্যবসা-নীতিতে সোজাসুজি ফিরে যাওয়া না হলেও, এবং যুদ্ধের আগে বিধিবদ্ধ 'অ্যান্টিট্রাস্ট' আইনসমূহের কাঠামো অবিকৃত থাকলেও অচিরে দেখা গেল যে অর্থনীতিতে সরকারের যুদ্ধকালীন হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং সরকারের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর করে তুলেছে। ব্যবসায় আইনগত বিধিনিষেধ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ল, কারণ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ-মূলক আইনসমূহের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ভার যে-সব সংস্থার উপর ন্যস্ত

ছিল সেই সব নিয়ন্ত্রক কমিশন, অ্যান্টিট্রাষ্ট এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন এবং আদালত প্রভৃতিতে এমন সব লোক নিয়োগ করা হল যাঁরা ছিলেন ঠিক সেই সব স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, যে-গুলি নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক অধিকতর ক্ষমতা উপভোগের ফলে মজুরদের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। মালিকশ্রেণীকে এখন আর, সাফল্যের সঙ্গে যৌথ দর-কষাকষিতে উৎসাহ দিয়েছেন এমন উৎপাদন-সচেতন যুদ্ধকালীন একটা সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল না। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্ম শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী তাঁরা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এর ফলে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগাগোড়া কয়েক হাজার তীব্র রকমের ধর্মঘট সংঘটিত হল—সেই ধর্মঘটে ৪০ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক বিজড়িত হল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মালিকগোষ্ঠীর শ্রমিকদের দাবীতে নতি স্বীকার না করে ধর্মঘট ভাঙবার শক্তি ছিল। দক্ষ শ্রমিকরা একটা সুদৃঢ় রক্ষণশীল শ্রমিক ইউনিয়নবাদ বিংশ দশকের আগাগোড়া পালন করে গেছে, কিন্তু অকুশলী শ্রমিকদের ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা এবং সংগ্রাম-ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

"কুলিজ প্রসপারিটি" বা প্রেসিডেন্ট কুলিজের আমলের সমৃদ্ধির যুগে কৃষক এবং শ্রমিকের দুর্বল অবস্থার কথা মনে হয় পরিসংখ্যান দ্বারা কাটান দেওয়া যায়। কারণ পরিসংখ্যানের অঙ্কে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ শিল্পগত এবং জাতীয় উভয়বিধ আয় বেড়েছে, আর সম্ভবতঃ শতকরা ১৩ ভাগ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিসংখ্যান তথ্যের দিকে একটু তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখলেই এই আপাত বিরোধের একটা মীমাংসা পাওয়া যায়। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে, ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মানুষের কাজের ঘণ্টা হারে উৎপাদন শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অথচ ঘণ্টা হারে বেতন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে, উৎপাদনের আধিক্যের ফলে দর না নামায়, উৎপাদকের লাভের অঙ্ক বিশের দশকে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। নিঃসন্দেহে, সম্পদ ও শক্তির একটা অসম বণ্টন আমেরিকান সমাজে বর্তমান ছিল। শ্রমিকরা এই নতুন সমৃদ্ধির সমান অংশ পায়নি।

উৎপাদক-সংস্থাগুলিতে লাভের ভাগ জমা হতে থাকার ফলে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়, যার পরিণতি হল ১৯২৯-এ শেয়ার বাজারে

নিদারুণ মন্দার আবির্ভাব। চড়া হারের লাভ যৌথ-মূলধনী কারবারের শেয়ারের দাম অত্যন্ত বাড়িয়ে দিল। এই অর্থ হয় বাজারকে পণ্যদ্রব্যে প্লাবিত করে তুলল, যা ক্রয়ের সামর্থ্য অধিকসংখ্যক লোকেরই ছিল না, নয়ত অন্যবিধ শেয়ারের ফাটকাবাজিতে নিয়োজিত হল। 'ফেডারেল রিজার্ভ পলিসি' বা সংরক্ষণী নীতি, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণদানের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিল, তার ফলে অর্থনীতিতে সহজপ্রাপ্য অর্থ এসে জমা হতে লাগল। শেয়ারের দাম এমন বেড়ে গেল যে, শেয়ার যে-সম্পত্তির প্রতিভূ তার দামের সঙ্গে শেয়ারের দামের কোনো সামঞ্জস্য রইল না। এই কাঠামোর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্পর্কে অতি অল্প লোকই মাথা ঘামিয়েছেন, কিংবা এতে বিস্ময় বোধ করেছেন। যখন উর্ধ্বমুখী শিল্পগুলির উৎপাদন নিম্নাভিমুখী হয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছোবে যেখানে সরবরাহ এবং চাহিদার পরিমাণ প্রায় সমান, তখন কি হবে সে কথা ১৯২৯ পর্যন্ত কেউই ভাবেনি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনেক জটিলতা এবং বৈপরীত্য এনেছে। যুদ্ধের মধ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র এক আন্তর্জাতিক মহাজন হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মোট সমর-ঋণের পরিমাণ ছিল ১০শ' কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রীয় লগ্নী সংগ্রহ এবং ডলার রপ্তানী করা ভিন্ন এই ঋণ শোধ করতে পারার কোন সম্ভাবনাই তাদের ছিল না। বেসরকারি লগ্নীকারকগণ অবশ্য চমৎকার সাড়া দিলেন এই আশায় যে সমর-বিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনীতিতে শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা হবে। কিন্তু এই সব দেশের অধিকাংশের সীমিত ক্রয়শক্তির ফলে তাদের উৎপন্ন পণ্যের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করতে হল।

দুঃখের বিষয়, আভ্যন্তরীণ শিল্পের সংরক্ষণে অতি চড়া হারে শুল্ক চাপানোর ফলে ইউরোপীয় রপ্তানি পণ্যের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দরজা এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। এই শুল্কহার শুধু ইউরোপীয় নয়, আমেরিকান অর্থনীতির পক্ষেও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের সঙ্গে লাভজনক ভাবে তার শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে অক্ষম ইউরোপ গম এবং তুলার জন্য অন্যান্য উৎসের সন্ধান করায়, আমেরিকান কৃষকের অবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে উঠল।

যেহেতু আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি আত্মস্থ করা সম্ভব ছিল না, খাবারজাত দ্রব্যের দাম ক্রমশঃই নামতে লাগল। কৃষককে সেই

পুরনো পেষণযন্ত্রের চাপে পড়তে হল, তাকে তার উৎপন্ন ফসল খোলা বাজারে বিক্রি করতে হল, আর যন্ত্রপাতি কিনতে হল সংরক্ষিত বাজার থেকে।

চড়া হারের যুক্তরাষ্ট্রীয় শুল্ক-ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া আরো ভয়ঙ্কর হল। দুঃস্থ ইউরোপীয় দেশসমূহের বকেয়া সমর-ঋণ শোধ করার শক্তি রইল না। ধীরে ধীরে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রকে এই ঋণের মোটা অংশ মকুব করতে হল। অধিকন্তু, চড়া আমেরিকান শুল্কহার সারা ইউরোপে চড়া শুল্কহারের ঢেউয়ের জন্য অংশতঃ দায়ী। পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের উৎস, যখন তার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, ঠিক সেই সময়েই শুকিয়ে এল।

সংক্ষেপে, বহু-বিজ্ঞাপিত "স্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তন" বহু জটিলতার এবং বৈপরীত্যের সৃষ্টি করল, আর তার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল তাকে একটা বিপর্যয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। জাষ্টিস ব্র্যাণ্ডিস তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেছেন—"ইউরোপ যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত, আর আমরা বিধ্বস্ত হয়েছি তার ফলভোগ করতে গিয়ে।"

নিম্নতন ধাপে নেমে গিয়েও আমেরিকান সমাজ ভবিষ্যতের প্রতি আশা রেখেছিল। বহুবিধ আর্থনীতিক সাফল্য যা বিশ দশকে সম্ভব হয়েছিল তা' নতুন এক উৎপাদনের স্তর সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের পণ্যদ্রব্যাদির ব্যবহারের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর্থনীতিক সুযোগ এবং সামাজিক সবলত্ব অধিকাংশ সমাজের মাপকাঠিতে উচ্চ ধাপে বাঁধা এবং নমনীয় ছিল। বহির্বিশ্বের অধিকাংশ দেশই আমেরিকানদের এই সাফল্যের প্রশংসা করল।

প্রকৃতপক্ষে, বিশের দশক ছিল 'বিচিত্র বিড়ম্বনা'র যুগ—আগের যুগের ঘরমুখো 'স্বাভাবিকত্বে'র পরিবর্তে একটা নতুন যুগের উদয় হল। আমাদের বর্তমান কালের বহুবিধ জটিল আর্থনীতিক সমস্যার সে ছিল সূচনার যুগ, এই সব সমস্যা হল—জাতীয় সমৃদ্ধির মুখে খামারের আয় পড়ে যাওয়া, নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভবে সাময়িক ভাবে কর্মসংস্থান-ব্যবস্থার বিপর্যয়, শহরতলী অঞ্চলের বৃদ্ধি এবং ফলে শহরাঞ্চলের অবস্থার অবনতি, মূল্যস্তরের ক্রমিক উর্ধ্বগমন এবং বর্ধনশীল জনসংখ্যার দেশের সম্পদরাশির সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

তাহলে এই যে যুগ, যা খুব সুদূর অতীত নয়—আজ হিসাব-নিকাশের মুখে তাকে এত অপরিচিত মনে হয় কেন? তার উত্তরে হয়ত বলা চলে, "এই আশ্চর্য রকমের ভাঁড়ামির যুগ"—আর একজন সমকালীন পর্যবেক্ষকের ভাষায়—"প্রাচীন রীতির ইণ্ডিয়ান সামার" (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শরৎকালের শেষ ভাগের সুখময় উষ্ণকালকে বলে 'ইণ্ডিয়ান সামার')।

প্রচণ্ড ভাঙন

১৯২৯-এর 'গ্রেট ক্র্যাস' বা প্রচণ্ড ভাঙন এবং ত্রিশের দশকের 'গ্রেট ডিপ্রেশন' বা প্রচণ্ড মন্দা আমেরিকান অর্থনীতিতে এমন ভাবে আঘাত দিয়েছে যে, তার অনুরণন আজও থামেনি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল হতভম্বের অবিশ্বাস। সমগ্র আমেরিকান জগতের ধারণা ছিল যে তারা এক সমৃদ্ধির সাগরে ভাসমান। সহসা তারা মন্দা ও দারিদ্র্যের কঠিন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেল। কিন্তু এই বিপর্যয়ের কারণ কি?

যে ফিটফাট কেতাদুরস্ত চেহারার অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র বিশের দশকে দেখে এসেছে তা' আজকে পিছন ফিরে দেখতে গিয়ে যতটা নির্বোধ বলে মনে হতে পারে ঠিক ততটা ছিল না। বিশের দশকের 'তেজী' বাজারে আশাবাদী হওয়াটাই সহজ ছিল। এটা অবশ্য জানা দরকার যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এক মন্দার (recession) উদ্ভব ঘটে এবং ১৯২৪-এ ও পরে ১৯২৭-এ অর্থবানের অগ্রগতি সামান্য শ্লথ হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্রাণলাভ ঘটেছে ত্বরিৎ গতিতে, এবং এই সব সাময়িক বিচ্যুতিকে প্রগতির প্রবল তরঙ্গে সামান্য ঊর্মিমালার মত মনে হয়েছে। অনেকেই, প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী তিনটি ঘূর্ণ্যমান সামঞ্জস্যবিধান (rolling readjustment) অনেকটা এমনই স্বস্তিকর ভঙ্গীতে দেখেছেন।

১৯২৯-এর মধ্যে শিল্পোৎপাদন, ফেডরেল রিজার্ভ সূচীর হিসাবে ১৯২২-এর মাপের নিরিখে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে শুধু উৎপাদন-শিল্পে নতুন যন্ত্রপাতি বাবদ খরচের পরিমাণ গড়ে বাৎসরিক ২০০ কোটি ডলারেরও বেশী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বেকারী ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং শিল্পে কর্মসপ্তাহের সাধারণ কাজের সময়ও কিছুটা হ্রাস করা হয়েছিল।

এই সব হৃদয়গ্রাহী পরিসংখ্যান সম্ভব হয়েছিল একপ্রস্থ নতুন যন্ত্রকৌশলের উদ্ভাবনের ফলে। উৎপাদন-কৌশল, বিদ্যুৎশক্তি, যানবাহন এবং বার্তা আদান-প্রদান ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতির ফলে নতুন লগ্নী এবং আর্থনীতিক

সম্প্রসারণের ঢেউ বয়ে যায়। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের ফলে আমেরিকান জগতে এবং জীবনধারায় একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে।

ক্রয় করে কিস্তিবন্দী হারে দাম দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য কেনার একটা হিড়িক পড়ে গেল। নব-অঙ্কুরিত পথ-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রচুর মেরামতি কারবার গজিয়ে উঠল, এর দ্বারা শহরাঞ্চলের সঙ্গে পল্লী-অঞ্চল এবং অবসর যাপনের স্থানগুলি দ্রুত সংযোজিত হল। শহর থেকে দলে দলে শহরতলীর দিকে মানুষ যাত্রা শুরু করল।

সম্মিলিতকরণ (assembly) কৌশল অবলম্বন এবং ব্যাপক হারে বাজারে মাল ছাড়া বহু ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেল। ইস্পাত, রবার এবং কাচ ইত্যাদি সহায়ক শিল্পগুলির বাজার প্রচণ্ড ভাবে প্রসারিত হল।

১৯২৩ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির মোট উৎপাদন দ্বিগুণিত হল। নতুন বেতার-যন্ত্র এবং অন্যবিধ জন-মাধ্যমে (mass media) প্রচারিত বিজ্ঞাপন বিশের দশকে শতকোটি-ডলার শিল্পে পরিণত হল। যন্ত্রশিল্পী, কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ধরনের আত্মনিয়োজিত ব্যবসাদারদের নিয়ে যে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল তাঁদের স্বস্তি, বৈচিত্র্য এবং অবসর বিনোদনের জন্য নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে, উৎপাদকরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাতলেন।

সামগ্রিক আর্থনীতিক চিত্র কিন্তু ঠিক সর্বতোভাবে উজ্জ্বল ছিল না। ১৯২০-এর দশকের সমৃদ্ধির কালে মন্দার বীজ অংকুরিত হচ্ছিল। কৃষকরা, একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তখনও দীর্ঘমেয়াদী মন্দা বাজারে হাল টানছে। তবু অনেকে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঋণ গ্রহণ করলেন। তাদের দুর্দশার কিছু পরিমাণে অবসান ঘটল মাঝে মাঝে প্রণীত আইনের মাধ্যমে। দক্ষিণাঞ্চল ছিল দারিদ্র্যের এক বিরাট অঞ্চল, তেমনই অবস্থা ছিল শহরাঞ্চলের শরণাগত বস্তীসমূহের। বেতনভোগীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই দশকের বৃহৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। যেহেতু বর্তমান মান অনুসারে সেই দশকে আয়বণ্টন অত্যন্ত অসম ছিল, সেহেতু গাড়ী, বাড়ি, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের মাত্রাধিক উৎপাদন জনসাধারণের একটা অতি সামান্য অংশের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল।

সহজ ঋণদান ব্যবস্থার ফলে ফাটকাবাজি উৎসাহিত হল, এবং ঋণগ্রস্ততা ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেল। যদিও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যৌথ-মূলধনী কারবার-সমূহে টাকা এসে পড়তে লাগল, সেই কারবার ছিল মূলগত ভাবে দুর্বল।

এই সব সম্প্রসারণশীল শিল্প ঠিক ততটুকুই নিরাপদ ছিল, ক্রেতাদের তাদের পণ্য ক্রয় করার আর্থিক ক্ষমতা ছিল যতটুকু। কিন্তু বেতন সাধারণ ভাবে এমন ছিল যে, ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা অনেকেরই খুব বেশী ছিল না। কিন্তু শিল্প-পরিচালকরা মজুরী কমিয়ে রাখার এবং লভ্যাংশ পুনরায় লগ্নী করার চেষ্টা সব সময়ই করতেন।

এর ফলে বিরাট ভাবে "অতিরিক্ত লগ্নী"র চাপ দেখা গেল শেয়ারে, যা প্রকৃতপক্ষে, ক্রমশঃই মূল্যহীন হয়ে পড়ছিল, কারণ শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে যে উৎপাদন হচ্ছিল বাজারে তা' বিকোচ্ছিল না। যে আর্থনীতিক কাঠামো ইতিমধ্যেই বিশ্রী ভাবে ভারসাম্য হারিয়েছে বিশ্বের ত্রুটিপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থায় এবং বিশ্বের বাজারে প্রাথমিক পণ্যদ্রব্যাদির নির্ভরতাহীন মূল্যে, তার অবস্থা আরও সঙীন হয়ে উঠল।

এই সব জটিল ঘটনাবলীর মধ্যে কিন্তু কোন একটি একক গোষ্ঠীকে শয়তান রূপে চিহ্নিত করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বিংশ দশকের ফাটকাবাজির আধিক্য সম্পর্কে অনুমোদনসূচক ভঙ্গীর জন্য ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডকে দায়ী করা হয়। অবশ্য তর্কের খাতিরে হয়ত বলা যায়, লগ্নীকারক সম্প্রদায়গুলির উপরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নৈতিক চাপ এই বোর্ড দিতে পারতেন। কিন্তু ফেডরেল রিজার্ভ আজ যে শক্তির অধিকারী হয়ে ষ্টক মার্কেটের লেনদেন (প্রান্তিক প্রয়োজন বা marginal requirements) নিয়ন্ত্রিত করে সেদিন তার সেই ক্ষমতা ছিল না। কিংবা বোর্ড তখন তার সদস্য ব্যাঙ্কগুলিকে আমানত অর্থের শতকরা ১৩ ভাগ সংরক্ষিত বা রিজার্ভ অর্থ হিসাবেও রাখতে বাধ্য করতে পারত না। (আজ ফেডরেল রিজার্ভের শক্তি আছে সদস্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আমানত অর্থের শতকরা ২৬ ভাগ পর্যন্ত সংরক্ষিত অর্থ হিসাবে রেখে দেওয়ায়)।

এখন পিছনের দিকে তাকিয়ে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৯২০-এর দশকে প্রয়োজনীয় কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর্থনীতিক সংকটের হাত থেকে জাতিকে কেন রক্ষা করেননি, সে কথা চিন্তা করে বিস্ময় বোধ করা সহজ। কিন্তু মুদ্রাহ্রাস-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি এবং সাহসের প্রয়োজন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সেই অভাবনীয় সমৃদ্ধির কালে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কে. গ্যালব্রেথের ভাষায়—একটা বুদ্বুদের পক্ষে আকস্মিক ফুটো হওয়া সম্ভব, যা সতর্ক, ক্রমানুগ মুদ্রাহ্রাস নীতির

পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা জানতেন যে, "অচির এবং স্বেচ্ছায় আয়োজিত পতন অথবা আরো পরে ঘটিতব্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংকটের মধ্যেই প্রকৃত কি গ্রহণযোগ্য তা' স্থির করতে হবে," তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে আরো একটুখানি ভেসে থাকাই তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

কিন্তু, মোটের উপর, জনগণের তাদের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বাস কিন্তু আর্থনীতিক নীতি সম্পর্কে ভয়াবহ অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ফাটকাবাজি একটা সম্ভ্রান্ত আচরণ হিসাবে গণ্য হল। কর্পোরেশন প্রেসিডেণ্ট থেকে অফিসের ছোকরা চাকর পর্যন্ত সকলেই ষ্টক মার্কেটের দর নিয়ে তেজী মন্দার হিসাব-নিকাশ করে কি ভাবে বিভিন্ন রকমের চালু কারবারের শেয়ার কেনা-বেচা করে রাতারাতি ধনী হওয়া যায় তা' অনুশীলন করত। প্রকৃতপক্ষে, তেজী বাজারের প্রথম যুগে অনেক ষ্টকের প্রকৃত মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু ষ্টক মার্কেট নিয়ে বাড়াবাড়ি যখন চরমে উঠল তখন সেই সব শেয়ার অবিশ্বাস্য দরে বিক্রি হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি (real estate) নিয়ে ফাটকাবাজিও ঐ জাতীয় কাণ্ডজ্ঞান-হীন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ১৯২০ দশকের গোড়ার দিকে ফ্লোরিডা অঞ্চলকে ভ্রমণকারীর স্বর্গরাজ্য হিসাবে জনপ্রিয় করে তোলার ফলে সেখানে জমির বাজার ভীষণ তেজী হয়ে উঠল। যদিও এই তেজী অবস্থা ১৯২৬-এ ধ্বসে পড়ল, তবু জনগণের উৎসাহে অন্যত্র অনুরূপ প্রচেষ্টায় অরুচির পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া গেল।

১৯২৬ থেকে ১৯২৯-এ শেয়ারসমূহের দাম প্রায় দ্বিগুণিত হল। তারপর ফাটকাবাজি ঋণকৃত তহবিলের ওপরই অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হল। হোল্ডিং কোম্পানীর ওপর হোল্ডিং কোম্পানী পিরামিডাকারে গড়ে ওঠায় এই সব স্টককে বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হল, কিন্তু সেই সব স্টকের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা ক্রমশঃই কঠিনতর হয়ে উঠল। এই সব ক্ষেত্রে মূল্য এবং আয়ের অনুপাত বাস্তবের সব রকম মাত্রা অতিক্রম করে গেল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে অবশ্যম্ভাবী আস্থার অভাব ব্যাপক আকারে দেখা দিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে একজন অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদ্ যখন জোর দিয়ে ঘোষণা করছিলেন যে, স্টক-মূল্য স্থায়ী ভাবে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে, তখনই স্টক মার্কেটে গড়পড়তা শেয়ারপ্রতি দশ পয়েণ্ট মূল্য হ্রাস পেল। পরের দিন অনুরূপ ঘটনাই ঘটল। পরবর্তী সপ্তাহে পূর্বকালীন আস্থার ভঙ্গীর

পুনরাবৃত্তি হল। তারপর ২৩শে অক্টোবর মার্কেটে গড়পড়তা শেয়ারপ্রতি ৫০ পয়েন্ট মূল্য হ্রাস পেল। এর পরের দিন—"ব্ল্যাক থার্সডে" বা কৃষ্ণ বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৪, ১৯২৯—স্টক এক্সচেঞ্জে সম্পূর্ণ হতাশার ভাব দেখা দিল। ১ কোটি ৩০ লক্ষ শেয়ার হস্তান্তরিত হল এবং মূল্য এমন ভাবে হ্রাস পেল যা ওয়াল ষ্ট্রীটের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। ২৯শে অক্টোবর আর্থনীতিক সংকটের অবস্থা চরমে পৌছোল, আরো ১ কোটি ৬৫ লক্ষ শেয়ার মার্কেটে এসে জমা হল। অতিরঞ্জিত প্রত্যাশার তুচ্ছ বুদ্বুদ শেষ পর্যন্ত ফাটল।

এই আর্থনীতিক পতনের জের চলল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রান্তিক ডাকের (margin call) সঞ্চিত প্রবাহে। (প্রান্তিক মূল্যে যে-সব শেয়ার বা security ক্রয় করা হয় তার মূল্য পরিশোধ করা হয় আংশিক ভাবে ঋণীকৃত তহবিল থেকে, এই তহবিল পরোক্ষ collateral বা শেয়ার খাতে প্রাপ্ত অর্থে গঠিত)। বাজার দর যখন হ্রাস পায়, তখন এই পরোক্ষ শেয়ারের মূল্যও হ্রাস পায়, তখন ঋণ লোপ করার জন্য এই সব শেয়ার বিক্রি করে ফেলতে হয়।

ধনসম্পদের মূল্য গুরুতর ভাবে হ্রাস পাওয়ায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৪,০০০ ব্যাঙ্কের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশী ব্যাঙ্ক ১৯৩২-এর মধ্যে লেনদেন বন্ধ করলেন। এই সব বিফলতার অর্ধেক ঘটেছে পল্লী-অঞ্চলের বসতিতে যেখানে জনসংখ্যার পরিমাণ এক হাজারেরও কম। এর মধ্যেই কৃষক-সম্প্রদায়ের বর্ধিত দুর্গতির সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

এই ধারণা করা ঠিক হবে না যে, এই আর্থিক বিপর্যয় পরবর্তী মন্দার জন্য দায়ী। দুর্বল অর্থনীতির একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই আর্থিক বিপর্যয়। অন্য সব লক্ষণ অপেক্ষাকৃত কম উজ্জল কিন্তু অতিশয় খাটি, আর্থনীতিক কাঠামোর এই বিস্ফোরণের আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'ব্ল্যাক থার্সডে'র এই বাজার-ভাঙনের আগেই কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদনের মাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গঠনকর্ম (construction) আর ১৯২৯-এর গ্রীষ্মকালে শিল্পগত উৎপাদন একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল। উৎপাদনের এই নিম্ন গতি সাত বছরের ব্যাপক গঠনকর্ম, যন্ত্রপাতি সঞ্চয়ন এবং উৎপাদন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পর শুরু হয়েছিল। তৎকালীন চাহিদার একটা মোটা অংশ অবশ্য পূরণ করা গেল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা চাহিদাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর থেকে অন্ততঃ ছোটখাটো পণ্যের ক্ষেত্রে একটা মন্দা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিত।

১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর ভেতর অনেক প্রকার শক্তির সম্মিলিত চাপের ফলে ব্যাপক মন্দা দেখা দেয় এবং অর্থনীতি সহজেই তার ভারসাম্য হারায়। জাতীয় আয়ের পরিমাণ অর্ধেকেরও বেশী কমে গেল; আর বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষে দাঁড়াল। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার মত লাভ করাও অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই নীট (net) লগ্নীর (প্রকৃত মূলধনের হিসাবে) পরিমাণ নঞাত্মক হয়ে উঠল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। অন্যভাবে বলা যায় যে, কয়েকশ' কোটি ডলারের উৎপাদক সম্পদের (capital goods) সরবরাহ কমেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রারম্ভিক অবনমন বিশ্বের বাণিজ্যের এবং লগ্নীর বাজারের পতনে অধিকতর কষ্টপ্রদ হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত থেকে ইউরোপ কোনো ক্রমেই সেরে উঠতে পারেনি, এবং যুক্তরাষ্ট্র যখন আমেরিকান ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হয়, তখন ইংলণ্ডও তাই করতে বাধ্য হয়। এর ফলে, জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়ার সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং কাঠামোয় ধ্বস নামে। ইউরোপীয় আর্থনীতিক মন্দার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির তীব্র অবনতি ঘটে। ভঙ্গুর যুদ্ধোত্তর ইউরোপ কিংবা চিরন্তন দৌর্বল্যের আধার প্রাথমিক উৎপাদক দেশসমূহ তাদের আমদানী-প্রবাহ চালু রাখতে পারল না এই গুরুতর ডলার ঘাটতির মুখে।

এই সব ঘটনা মোটামুটি একই সময়ে ঘটে গেল এবং এমন এক সময় ঘটল যখন আর্থনীতিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল অতিশয় ক্ষীণ এবং বলিষ্ঠ সরকারি নীতি গ্রহণের দৃঢ়তার ছিল একান্তই অভাব। বেশ কিছুসংখ্যক রোগের দ্বারা একযোগে আক্রান্ত একজন শয্যাশায়ী স্বাস্থ্যবান মানুষের মত (যিনি রোগসমূহের পৃথক পৃথক ভাবে চিকিৎসা করিয়ে কিংবা কয়েকটি রোগের একসঙ্গে চিকিৎসা করিয়ে আরোগ্য লাভ করতে পারতেন) বহু অস্বাস্থ্যকর ঘটনার সমাবেশে ১৯২৯ সালের পরবর্তী মন্দা দীর্ঘস্থায়ী ও অত্যন্ত গভীর হয়ে ওঠে।

. আশ্চর্যের বিষয়, বিশের দশকের অবসানে সর্বসাধারণের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট মতৈক্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যে, পরিস্থিতি "মূলগত ভাবে সুদৃঢ়"। সমৃদ্ধির কাল অতি শীঘ্রই ফিরে আসবে, শুধু যদি আমরা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনীতি নিয়ে বেশী ভাঙ্গাগড়া না করি। এমন কি যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অবনমনের গুরুত্ব প্রথমে যেমনটি ভাবা গিয়েছিল তার

চেয়ে অনেক বেশী তখনো কিন্তু বিশ্বাস করা হল যে, যদিও সমৃদ্ধির কাল ফিরে আসতে কিছুটা সময় লাগবে, তবু অর্থনীতি নিয়ে ভাঙ্গাগড়া করতে গেলে আরো বেশী দুর্গতিকে আহ্বান করে আনা হবে।

পিছন ফিরে দেখতে গেলে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে যে, অবনমনের ফলে যে নিশ্চিত বিপর্যয় ঘটেছে তার মুখে দাঁড়িয়ে কি ভাবে এমন অকপট আশাবাদ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০-এ, তখনও আর্থনীতিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁক ছিল। আর্থনীতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজনে যে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন তা' সম্পূর্ণ এবং যথাযথ ছিল না। অনেক পরে, জাতীয় আয় এবং উৎপাদনের হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করে আর্থনীতিক নীতি নির্ধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে।

অর্থতত্ত্ব বা সরকারি কর-নীতির ক্ষেত্রে আজ যা প্রাথমিক জ্ঞান বলে বিবেচিত হয় সেই মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিভ্রান্তি আর্থনীতিক তথ্যের অভাবের চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্টকর হয়েছিল। দু'টি রাজনৈতিক দলই ভোটদাতাদের ভারসাম্যবিশিষ্ট বাজেটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মনোহরণের চেষ্টা করেছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। উভয় দলই স্বর্ণমান-বিবর্জিত পৃথিবী সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল এবং উভয় দলেরই "ঘাটতি ব্যয়" নীতির ওপর অনাস্থা ছিল।

১৯৩০-এর এবং পরবর্তী কালের অনেক বিশেষ ধরনের সংস্কার-ব্যবস্থার মধ্যে ১৯২০-এর কালে ঠেকে-শেখা অনেক জ্ঞানের প্রতিফলন পাওয়া যায়। আজ, আমাদের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি বিষয়ে, যৌথ-সংস্থার কাঠামো, গ্রাহকের ক্রয়-ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনেকখানি স্পষ্ট ধারণা হয়েছে।

কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করে গা ঢেলে দেওয়া উচিত নয় যে, যে ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন ফাটকাবাজির উন্মত্ততা বিশের দশকের বৈশিষ্ট্য ছিল, সে রকম আর ঘটতে পারে না। কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পর্যবেক্ষক এখনও পর্যন্ত বলতে পারেন না যে, ব্যবসায়িক ওঠা-নামার সব গতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে একথা বিশ্বাস করার কিছু কারণ জন্মেছে যে, যথাযোগ্য নীতি অনুসরণ করে বিপর্যয়কে বেশ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখা যায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতিতে আমাদের আত্ম-প্রত্যয় বেড়ে যাওয়া উচিত।

অবনমনের গোড়ার যুগ

এই বিরাট অবনমনের রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক ফলাফল সম্পর্কে যদিও মতামতের পার্থক্য এখনও বর্তমান, তবু এ-কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, এই কাল আমেরিকার আর্থনীতিক ইতিহাসে একটা নতুন বাঁক গ্রহণের চিহ্ন সূচিত করে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রলম্বিত অবনমনের কালে যে-সব শক্তি আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল, সে-সব এখন আর কার্যকরী হয়নি। এই সত্যটুকুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে ধীর এবং বেদনাদায়ক পদ্ধতিতে। গৃহযুদ্ধের পর থেকে অপর কোনো আভ্যন্তরীণ সংকট আমেরিকান জীবনকে এমন গভীর ভাবে নাড়া দেয়নি।

১৯২৯-এর স্টক মার্কেটের ভাঙ্গনের কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ-কাল পর্যন্ত জাতি দীর্ঘবিলম্বিত আর্থনীতিক অচল অবস্থার মধ্যে যে দুর্গতি ভোগ করেছে ইতিহাসে তা' তুলনাহীন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে শুধুমাত্র ১৯৩৭-এ বেকারীর সংখ্যা ৮০ লক্ষের নীচে নামে। ১৯৩৩-এ প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান ছিল না; পাচ বছর পরেও শ্রমিকগোষ্ঠীর প্রতি পাঁচজনের একজন কর্মসন্ধানে রত ছিল।

অবনমনের গোড়ার যুগে আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের মন্দার বিপুলত্ব আরও অনেক ভাবে দেখা যায়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে শিল্পগত উৎপাদনের সূচী শতকরা ৪৭ ভাগ, কৃষিমূল্য শতকরা ৫৪ ভাগ, আর মোট জাতীয় উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ হ্রাস পায়। এই কয়েক বছরের মধ্যে স্থায়ী পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৭৭ ভাগ হ্রাস পায়, কারবারগুলি মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরিমাণ শতকরা ৭৯ ভাগ কমিয়ে দেয়, আর শিল্প এবং বাণিজ্যগত গঠনকর্ম শতকরা ৮২ ভাগ হ্রাস পায়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৮৫,০০০ কারবার 'ফেল' পড়ে যায়। যদিও কয়েকটি অত্যন্ত বেশী রকমের কেন্দ্রীভূত শিল্প-সংস্থা ক্ষয়িষ্ণু চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করে মূল্যমানের সমতা রক্ষা করেন, তবু সামগ্রিক ভাবে যৌথ-সংস্থাগত লাভের পরিমাণ তীব্র ভাবে নেমে যায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোট যৌথ-সংস্থাগত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াল ৩০০ কোটি ডলারে।

জাতির ব্যাঙ্কগুলিও ছিল সংকটের মুখে—তাদের শতকরা ২৫ ভাগ সম্পদ (asset) শেয়ার বন্ধকী-ঋণে আর ১০ ভাগ স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী-ঋণে আবদ্ধ ছিল। যখন উভয় বাজারই ধ্বসে পড়ল (নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের মূল্য ১৯৩১-এ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী হ্রাস পেল), তখন দেশে ব্যাঙ্কিং-এর কাঠামো টলটলায়মান হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক সংকটময় পরিস্থিতি যা সংরক্ষিত স্বর্ণের (gold reserve) বহির্মুখী প্রবাহকে জোরদার করে তুলেছিল, তা' আরো নতুন বিপদ ডেকে আনল, অন্যদিকে ব্যাঙ্কে 'ছুট' (run on a bank) শুরু হওয়ায় তিন দফা ব্যাঙ্ক 'ফেল' পড়ার হিড়িক দেখা দিয়েছিল।

লগ্নীকরণের সুযোগ-সুবিধার অতি নির্মম ভাবে অবনতি ঘটল, লগ্নী মূলধনের উৎসসমূহও তেমনি শুকিয়ে এল। ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ১৯২৯-এ ৩৬শ' কোটি ডলার থেকে নেমে ১৯৩২-এ ২২শ' কোটি ডলারেরও কমে দাঁড়াল, সুদের পরিমাণ হ্রাস করে এবং ফেডরেল রিজার্ভে জমা-রাখা অর্থের পরিমাণকে হ্রাস করে ঋণ-ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করার সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই অবস্থা ঘটল।

কৃষিজীবীদের অবস্থা চরমে উঠল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সংকোচনের মুখে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলল। তিন বছরে শস্যের গড়পড়তা মূল্য বুসেল প্রতি ৭৭ সেন্ট থেকে নেমে ১৯ সেন্টে দাঁড়াল। গড়পড়তা খামারপ্রতি আয় ১৯২৯-এর ৯৬২ ডলার থেকে নেমে ১৯৩২-এ ২৮৮ ডলারে পৌছোল। ১৯৩৩-এর প্রথম দিকে শতকরা ৫২ ভাগ খামার-ঋণ বকেয়া পড়ে রইল।

শিল্পোৎপাদন এবং কর্মসংস্থান অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে অবনতির মুখে পৌছোল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মোটর গাড়ীর ১৯২৯-এ ৪৬ লক্ষ থেকে ১৯৩২-এ ১১ লক্ষে নেমে এল। এর ফলে, শিল্পাঞ্চলগুলিতে বেকারীর সংখ্যা বিশেষ করে প্রবল আকার ধারণ করল। এক সময় ডোনোরা, পাঃ অঞ্চলে ১৩,৯০০ মজুরের মধ্যে মাত্র ২৭৭ জনের নিয়মিত কর্মসংস্থান ছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে যদিও প্রকৃত মজুরী শতকরা মাত্র ১০ থেকে ১২ ভাগ নেমেছিল, তবু যারা কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের বেতনের আপেক্ষিক নির্ভরযোগ্যতা লক্ষ লক্ষ বেকার মজুরের দুর্গতি দূরীকরণে সামান্যই কাজে লেগেছে।

সংকটের সামাজিক প্রতিক্রিয়া বাস্তবিক সমস্যার চেয়ে অনেক বেশী গুণ প্রকট হয়ে উঠেছিল, কারণ জাতির বিধি-ব্যবস্থা সংকট সামলানোর জন্য সম্পূর্ণ

ভাবে অপ্রস্তুত ছিল। আয় হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য এবং আঞ্চলিক রাজস্বের খাতে আয়ও হ্রাস পেল। এর ফলে কিঞ্চিৎ কিম্ভূতকিমাকার ফলাফল দেখা দিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিউ জার্সি রাজ্যের অ্যাটলান্টিক সিটির আদালতগুলির কথা ধরা যাক, সেখানে অনেক দেওয়ানী মামলা খারিজ করে দিতে হল, জুরীদের দেবার মত অর্থ তহবিলে না থাকায়। অনেক শহর তাঁদের কর্মীদের বেতন হিসাবে কাঁচা প্রাপ্তিপত্র (scrip) দিতে শুরু করলেন। লস এঞ্জেলস শহর সেখানকার মুন্সিপ্যাল চিড়িয়াখানাটি নিলামে চড়ালেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা আরো গভীরতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, কারণ কয়েকটি রাজ্য স্কুলের পাঠকাল হ্রাস করলেন, এবং রোড আইল্যাণ্ড ছাড়া সব ক'টি অঙ্গরাজ্য শিক্ষকদের বেতন হ্রাস করলেন।

বেকার জনগণের পরিবারবর্গদের সংকট ত্রাণের বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য কি সরকারি কি বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানই উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত ছিল না। নিউ ইয়র্ক এবং অন্য দু'একটি অঙ্গরাজ্য ভিন্ন রাজ্যগত ভাবেও অতি সামান্যই এ-বিষয়ে করা সম্ভব হয়েছে। ডেট্রয়েট সিটি মোটর গাড়ী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে সংকট ত্রাণের তালিকাভুক্তদের প্রতিজনকে যাতে দৈনিক পাঁচ সেন্ট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করলেন।। গেরী, ইনড্. অঞ্চলে বিশ হাজার পরিবার পৌর কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত জমিতে ফসল ফলাতে শুরু করলেন। ১৯৩২-এ একশ'রও বেশী শহরে দুঃস্থদের আর্থনীতিক সাহায্য করার জন্য কোনো রকম উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না।

অবনমনের প্রচণ্ডতা এবং সাধারণের ক্লেশ দূরীকরণের সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা আমেরিকান জনগণের ব্যক্তিজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করল। বিবাহের হার ১৯২৯ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে হ্রাস পেল শতকরা ৩০ ভাগ, আর জন্মহার হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল হাজারে ১৭'৪ ভাগে। রুটির লাইন আর স্যুপের রসুইখানা একটা সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হল।

অবনমনের গোড়ার দিকে খাঁটি আমেরিকান শহরে তার চাপে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার বহুপঠিত আলোচনা-গ্রন্থ "মিডলটাউন ইন ট্র্যানজিশন"-এর যুগ্ম লেখক সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট ও হেলেন লিনড লিখেছেন: "অবনমনের বিশাল ছুরিকা নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে কেটেছে সমগ্র জনগণকে, ধনী ও দরিদ্রের আশা এবং জীবনকে সমান ভাবে বিদীর্ণ করেছে। শহরের ইতিহাসে সাম্প্রতিক কালের কোনো দীর্ঘবিলম্বিত ভাবগত অভিজ্ঞতার চেয়ে এই

অভিজ্ঞতা সর্বজনীনত্বের অনেকটা কাছাকাছি পর্যায়ে পৌছেছে; এর প্রচণ্ড আঘাত মানবজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা জন্ম ও মৃত্যুকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে।

আর্থনীতিক অচল অবস্থা জনসাধারণের সরকার সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা রূপান্তর সাধন করল। সেই যুগের প্রখ্যাত রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের বিবৃতি থেকে এই রূপান্তরের আভাষ পাওয়া যাবে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সব নেতৃবৃন্দ এই অবনমন যে এক বিরাট বিপর্যয় তা' বুঝতে পারেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকা জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে, "ত্রাণলাভের মুখ্য বিধান হল সঞ্চয়, ছাঁটাই, মিতব্যয়িতা এবং অবস্থার ভালোর দিকে যাওয়ার জন্য আশাভরা প্রতীক্ষা।"

ইস্পাত শিল্প পরিচালক চার্লস সোয়াব বলেছিলেন: "শুধু দাঁত বার করে হাসো, আর কাজ করে যাও।" অর্থসচিব এনড্রু মেলন, দেউলিয়াকরণ মুদ্রা হ্রাসের একটা নির্মম চক্র সৃষ্টির উপদেশ দিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল আসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্স' বা জাতীয় উৎপাদক সঙ্ঘের সভাপতি জোর দিয়ে বললেন যে, জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দুষ্কৃতি (crime)।

কিন্তু অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনীতির 'স্বাভাবিক আইন' সম্পর্কে এই বিশ্বাস অবনমনের অবস্থার যতই অবনতি ঘটে ততই অন্তর্হিত হতে থাকে। ব্যবসায়ী ক্রমেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। সোয়াব এখন স্বীকার করলেন: "আমার আশংকা হয়, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। আমি জানি না, আমরা জানি না, আমরা আজ যা কিছুকে মূল্যবান বলে মনে করি আগামী মাসে তা' মূল্যবান থাকবে কি থাকবে না।"

অনেক ব্যবসায়ী এমন সব সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন যার অর্থ অ্যান্টিট্রাষ্ট-সমূহকে সাময়িক ভাবে রদ করা। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী (এন. জে.)র প্রেসিডেণ্ট ওয়ালটার টীগল, অনুভব করলেন যে, উৎপাদন-সূচীকে আনুমানিক চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, সীমিত সংখ্যার বাজার নিয়ে প্রতি-যোগিতা করা থেকে নিরস্ত হয়ে ব্যবসায়ীদের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। বহু প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা লগ্নীকার বার্নার্ড বারুচ জেনারেল ইলেক্ট্রিকের প্রেসিডেণ্ট গেরার্ড সোয়োপ "ব্যবসা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা"কে সমর্থন করলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট হুভার স্পষ্টাস্পষ্টি অভিযোগ করলেন যে, ব্যবসায়িক জগৎ হাত গুটিয়েছে এবং "সরকারি হস্তক্ষেপ"-এর দাবী জানিয়েছে।

অবনমনের তীব্রতা হ্রাস করার জন্য হুভারের কার্যসূচীকে এই সব ঘটনা-প্রবাহের আলোকে পরিমাপ করতে হবে। অবনমনের গোড়ার দিকের মাসগুলিতে প্রেসিডেন্টের উক্তিতে অধিকাংশ ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতার চিন্তাধারা প্রতিফলিত হল : "এই দেশের মুখ্য কারবার, উৎপাদন এবং সম্পদের বণ্টন, সুদৃঢ় এবং সমৃদ্ধির ভিত্তির উপর আজ তা' প্রতিষ্ঠিত।"

অনেক রাজনৈতিক নেতার মত প্রেসিডেন্টেরও বিশ্বাস ছিল যে, একটা উন্মুক্ত সমাজের অস্তিত্ব সরকার কর্তৃক তার আর্থনীতিক জীবনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মজুরীর হারকে তার স্বাভাবিক স্তরে নেমে আসতে দিলে বেকারীর সমাধান হবে এবং গুরুতর মুদ্রাহ্রাসের পরেও হয়ত অর্থনীতি পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

এর দ্বারা অবশ্য এ বোঝায় না যে, প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ পদ্ধতিতে সংকটকে লাঘব করার বিরোধী ছিলেন। তিনি ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডকে ঋণ ছাড়ার জন্য এবং চাষীদের পক্ষে ফেডরেল ঋণ সহজলভ্য করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তিনি ছিলেন 'রিকনষ্ট্রাকশন ফিনান্স কর্পোরেশন' গঠনের উদ্যোক্তা। দুর্গত ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্যের জন্য পরিকল্পিত এই সংস্থা তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচায়ক। ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে হুভারের সুপারিশে কংগ্রেস বোলডার বাঁধের খাতে ৮ কোটি ডলার, রাজপথ নির্মাণের জন্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার, মেরামতি ও গঠনমূলক কাজের জন্য ৫০ কোটি ডলার এবং নদী ও বন্দর ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য ১৫ কোটি ডলার বরাদ্দ করেন।

কিন্তু নীতির খাতিরে প্রেসিডেন্ট অবিচল ভঙ্গীতে আর্থনীতিক সংকটে জড়িত ব্যক্তিবিশেষকে ফেডরেল তহবিল থেকে সাহায্যদান প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বেকারীর জন্য ক্ষতিপূরণ দানে এবং শস্য উৎপাদনে সহায়তা দানেও বাধা দিলেন। তাঁর এই আপত্তির হেতু, এর দ্বারা ব্যক্তিগত উৎসাহ, যা আমেরিকান দর্শনের ভিত্তিগত নীতি, তা' ক্ষুণ্ণ হবে।

প্রেসিডেন্ট হুভারের প্রত্যয়ের আন্তরিকতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না বটে, কিন্তু সেই প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াকলাপ অনেক ক্ষেত্রে দুর্গত জনসাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণ-পশ্চিমে যখন অনাবৃষ্টির প্রকোপ হল তখন হুভার নিজের মতবাদের সঙ্গে আপোষ করে চাষীদের জন্য ফেডরেল সাহায্য অনুমোদন করলেন—সেই

সাহায্য কিন্তু গবাদি পশুদের আহার্য এবং ফসলের বীজের আকারে দেওয়া হল। চাষীরা কিন্তু নিজেরা কোনো রকম প্রত্যক্ষ সাহায্য পেল না। তীব্র অনুযোগ শুরু হল যে, প্রেসিডেন্ট এদিকে বুভুক্ষু খচ্চরদের খোরাক দিচ্ছেন অথচ বুভুক্ষু মানুষকে খেতে দেওয়াটা নৈতিক দিক থেকে তিরস্কারযোগ্য মনে করছেন।

১৯৩২-এর গ্রীষ্মকালে হুভার যখন সোজাসুজি বোনাস এক্সপিডিশনারি ফোর্সকে বরখাস্ত করলেন তখনও অনুরূপ অনুযোগ উঠেছিল। এই ফোর্স বা বাহিনী দুর্দশাগ্রস্ত কয়েকজন প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোক নিয়ে গঠিত হয়, এরা ওয়াশিংটন পর্যন্ত অভিযাত্রিক হয়ে এসেছিলেন বোনাস সার্টিফিকেটের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, আইনানুসারে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিকদের ১৯৪৫-এ এই অর্থ দেওয়ার কথা। যদিও সার্টিফিকেটের বিনিময়ে আগেভাগে টাকা দেওয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বিষয়ে জন-সাধারণের মোটামুটি সমর্থন ছিল, তথাপি প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি জনগণের যথেষ্ট সহানুভূতিও ছিল। কারণ, এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বেকার এবং দারিদ্র্য-কবলিত। তাই 'জনতা' হঠানোর জন্য হুভার যখন মিলিটারি তলব করলেন তখন জনসাধারণ বেদনাহত হল।

এই জাতীয় উদাসীন মনোভঙ্গী গ্রহণের মূলে হুভারের অন্তরে সহানুভূতির অভাব ছিল না। এ হল একটা মতবাদকে প্রাণপণে আঁকড়ে রাখার দৃঢ়তা। তিনি তখনও মনে করছেন যে, প্রত্যক্ষ সাহায্যদানে আমেরিকার চিরাচরিত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের দায়িত্ব-সংক্রান্ত নীতি ভেঙ্গে পড়বে, আর তার ফলে জনগণ একটা দূরস্থিত আমলাতন্ত্রের তাঁবেদার হয়ে উঠবে। ঋণ তাঁর সহ্য হত, কিন্তু দান নয়। তিনি মনে করতেন, প্রত্যক্ষ সাহায্য "হয়ত আমেরিকান জনগণের মনের আধ্যাত্মিক সাড়াকে ব্যাহত করবে।"

তাঁর সমালোচকদের মতে, হুভার বুঝতে পারেননি যে, স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য জনগণের কিঞ্চিৎ নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। হুভারের সমালোচকরা বলেন যে, একটা শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আর্থনীতিক স্বাধীনতা যে প্রধানতঃ একটা মায়ামাত্র তা' হুভার স্বীকার করতে চাননি। এর ফলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ব্যাপক ভাবে বাস্তব আকার দান করার দায়িত্ব যে সরকারের আছে তা'ও তিনি স্বীকার করেননি। তিনি এমন এক জগত পুনর্গঠনের চেষ্টা করছিলেন যার আর অস্তিত্ব নেই এবং যাকে আর পুনরুজ্জীবিত করা চলে না।

কিন্তু এই সব সমালোচনার সবটাই যুক্তিযুক্ত নয়। হুভারের কার্যকলাপকে তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা কর্তব্য। অবনমনের কালের প্রথম দিকে রুজভেল্ট সহ ডেমোক্রাটিক নেতৃবৃন্দ আর্থনীতিক পদ্ধতিকে এদিক-ওদিক করতে প্রেসিডেন্ট হুভারেব মতই অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ডেমোক্রাটরা হুভারকে তীব্র ভাবে ভৎর্সনা করেছেন বাজেটের ভারসাম্য বজায় না রাখার জন্য এবং অত্যধিক খরচ করার জন্য।

আজ, দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলই একমত যে, মুদ্রাহ্রাসকে আপন খেয়ালমাফিক চলতে দেওয়াই মন্দাব (recession) জবাব নয়। যদিও ধরা যায় যে, এই পন্থা হয়ত শেষ পযন্ত কার্যকরী হবে, তবু মানবিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী। অধিকন্তু, দীর্ঘবিলম্বিত মুদ্রাহ্রাস অর্থনীতির দিক থেকে অবাঞ্ছনীয় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অকাযকব। এই অভিমত কিন্তু পশ্চাৎদৃষ্টির দ্বারা লাভ করা হয়েছে। যখন অবনমনেব অন্ধকাব দিনগুলি ঘনিয়ে আসছিল তখন বাস্তব পবিপ্রেক্ষিতে অবস্থা নির্ণয় করা আরো বেশী কঠিন ছিল। সেই সময় কেউই জানতে পারেনি যে, আমেবিকান সমাজেব বিবর্তনেব আর একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে এল।

কিন্তু আমেরিকার জনগণ, ১৯৩২-এব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কাল ঘনিয়ে আসার সময়ের মধ্যে বুঝে গিয়েছিল যে, অবনমনকে দমন করার যে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি যথেষ্ট নয়। তারা একটা নতুন শাসন, একটা নতুন নীতির জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের নির্বাচনী অভিযানে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—"আমেরিকান জনগণেব জন্য একনব-বিধান" —তা' তাদের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করল। কিন্তু নব-বিধান যে কি বস্তু তা' নির্বাচনী অভিযান কালে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়নি। কিন্তু শুধু এই কথাগুলিই ছিল যথেষ্ট। রুজভেল্ট নির্বাচনে জয়ী হলেন জনগণের ভোটের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে।

এর পরবর্তী বছরগুলিতে, হুভারের নির্বাচনী অভিযানের যে বক্তব্য তখন লোকে বুঝতে পারেনি তার সত্যতা প্রমাণিত হল। "ডেমোক্রাটিকদের অর্থনীতিতে বর্ধিত হারে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রস্তাব আমেরিকান জীবনে এক সুগভীর পরিবর্তনের সূচক···এই নির্বাচন ক্ষমতাহীন দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন দলের হাতে ক্ষমতা দান মাত্র নয়। এর অর্থ আগামী এক শতাব্দী যাবৎ আমাদের জাতি কোন্ পথ ধরে চলবে তার দিক স্থির করা।"

নব-বিধান

সরকারের সকল শক্তি নিয়োগ করে অবনমনকে দমন করতে হবে—নব-বিধানের এই সংকল্প, 'ডেমোক্রাটিক ক্যাপিটালিজম' বা গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের প্রতি আমেরিকান জনগণের আস্থা ফিরিয়ে এনে এক নতুন যুগের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস এনে দিল। যাই হোক, নব-বিধান অবনমনের প্রতিক্রিয়া থেকে অর্থনীতির কয়েকটি অংশকে ত্রাণ করলেও, আমরা যদি সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান-ব্যবস্থাকে আর্থনীতিক স্বাস্থ্যের নিরিখ হিসাবে গ্রহণ করি তা'হলে বলতে হবে, ১৯৩০-এর আর্থনীতিক সংকট এই নব-বিধান দূর করতে পারেনি। ১৯৩৯-এ ৯৪ লক্ষ মানুষ তখনও কর্মহীন ছিল।

অন্ধ সমর্থক এবং কট্টর সমালোচকদের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উক্তি সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর না ছিল কোনো কার্যসূচী, না ছিল কোনো রকমের দর্শন। তাঁরা ছিলেন রাজনৈতিক প্রাগ্‌মতবাদী (pragmatist)—যখন যেমন সমস্যা উদ্ভূত হত তখন তাতে তারা সাড়া দিতেন। এই সব সমস্যার প্রতিবিধান কল্পে যে নব-বিধানের (New Deal) উদ্ভব হয় তাকে প্রকৃতপক্ষে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়: সূচনার নব-বিধান—এর গুরুত্ব ছিল সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার ওপর; আর দ্বিতীয় নব-বিধান—১৯৩৪ থেকে যার সূচনা এবং যার গুরুত্ব ছিল প্রশস্ত সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তনের ওপর।

এই সব প্রত্যয় কিন্তু সহজে বা পরিকল্পনামাফিক আসেনি। একজন ঐতিহাসিকের মতে "নব-বিধান যে কি তা' যাঁরা নব-বিধানকে কোনো একটি-মাত্র নীতির সূত্রে, একটা সুদূরপ্রসারী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা হিসাবে বুঝতে চেষ্টা করবেন তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। নব-বিধান ছিল, অনেকগুলি আকস্মিক ভাবে গৃহীত বা অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এর মধ্যে যেটুকু ঐক্য বর্তমান, তা' হল রাজনৈতিক কূটকৌশলগত, আর্থনীতিক নয়।" *

* American Political Tradition. Richard Hofstadter: New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1948.

একমাত্র 'টেনেসি ভ্যালি অথরিটি' প্রতিষ্ঠা ভিন্ন প্রথম নব-বিধান যা ১৯৩৩-এর প্রথম "একশ দিনে"র ভেতর আকৃতি লাভ করেছিল, সাধারণ ব্যবসায়িক মন্দগতির ঘাটতি পূরণের জন্য তার মধ্যে সরকারি ব্যয়নীতির প্রতিফলন নেই, তেমন কোনো রকম প্রশস্ত সমাজকল্যাণ নীতিও এর মধ্যে ছিল না। এর পরিবর্তে এই কালে, সরকারি তহবিল থেকে প্রচুর ব্যয় না করেই, দুর্গত ঋণগ্রস্ত এবং বেকারদের সাহায্যের এবং অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য দেশের বিশৃঙ্খল আর্থিক কাঠামোর সংস্কার ও তাকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা সরকারি হস্তক্ষেপ মারফৎ হয়েছিল।

টলটলায়মান ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে আর্থিক দৃঢ়তা আনা হল, ইমার্জেন্সী ব্যাঙ্কিং এ্যাক্ট পাশ করে। এর দ্বারা 'ফেডরেল ডিপোজিট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার দ্বারা ৩,০০০ ডলার পর্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানতকে সংরক্ষিত করা হল। (১৯৫০-এ এই অঙ্ক ১০,০০০ ডলারে বৃদ্ধি পায়)। এই এ্যাক্টের দ্বারা বাণিজ্যিক এবং লগ্নীমূলক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পৃথকীকরণ করা হল। সিকিউরিটিজ একসচেঞ্জ এ্যাক্ট (১৯৩৪) দ্বারা একটি আধা-আদালতবিশেষ 'সিকিউরিটিজ অ্যাণ্ড একসচেঞ্জ কমিশন' সৃষ্টি করা হল। ১৯২৯-এর ওয়াল স্ট্রীটের 'ভাঙন' যে উদ্দাম ফাটকাবাজীর ফলে এবং যোগসাজসে সৃষ্টি হয়েছিল এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল তা' নিবারণ করা। এর পর ১৯৩৫-এর ব্যাঙ্কিং এ্যাক্ট প্রণীত হল এবং তার ফলে ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল।

সরকার ক্লেশজর্জর ঋণগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। 'রিকনষ্ট্রাকশন ফিনান্স কর্পোরেশন', যা আগে হুভারের শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা' বৃহত্তর ধনগত এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্য একটা বিশিষ্ট ঋণদাতা এজেন্সীতে পরিণত হল। যে-সব কৃষকরা প্রকৃতপক্ষে ক্লেশজর্জর হয়েছিল, তারা ফার্ম ক্রেডিট অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে ঋণ পেল, এবং ফ্রেজিয়ার-লেম্‌কে এ্যাক্ট অনুযায়ী তাদের বন্ধকী-ঋণের পরিশোধ ব্যাপারে একটা তিন-বছর মেয়াদী ঋণ পরিশোধ স্থগিত বিধি (moratorium) লাভ করল।

যদিও কর্মহীনদের সাহায্যের পরিমাণ আগের শাসন-ব্যবস্থার কালের চেয়ে অনেক বেশী হল, তবু প্রথম নব-বিধান আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের দ্রুত উদ্ধার প্রত্যাশায় কোনো রকম দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ পরিহার

করল। পাবলিক ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠান (পূর্ত বিভাগ) এবং স্বল্পজীবী সিভিল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠান ছাড়া, মুখ্য ত্রাণ-ব্যবস্থা কিন্তু হুভার প্রবর্তিত রাজ্যসমূহ এবং নগর-সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত অপ্রত্যক্ষ সাহায্য-ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করেছিল।

পি. ডব্লু. এ-র (পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বরাদ্দ ছিল অতিকায় ৩'৩শ' কোটি ডলার, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে ফেডরেল বা রাজ্য সরকার বা বেসরকারি ঠিকাদার দ্বারা পরিচালিত পাবলিক ওয়ার্কস প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করে বেকারী নিরোধ করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত ছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে পি. ডব্লু. এ বিরাট রাজপথ এবং জলপথ শ্রেণী, জলনিকাশী নালী এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্যাস ও ইলেকট্রিকের কারখানা, বিদ্যালয় ও আদালত ভবন, হাসপাতাল ও কারাগার, সেচ এবং বন্যা-নিরোধ পরিকল্পনা, সেতু, ডক এবং টানেল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য দায়ী ছিল।

কিন্তু পি. ডব্লু. এ. কর্তৃক কর্মসংস্থান-ব্যবস্থা করার আগে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হত। কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী থাকায়, আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে 'সিভিল ওয়ার্কস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৪-এ সি. ডব্লু. এ যখন তার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল তখন প্রায় ৪০০,০০০ রকমের প্রকল্পে এই প্রতিষ্ঠান ৭১ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করেছে। দুঃখের বিষয়, বিস্তারিত পরিকল্পনার সময় না থাকায় কয়েকটি প্রকল্প ছিল যেন তেন প্রকারেণ 'কাজ করে যাও' জাতীয়।

প্রথম নব-বিধান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেরণা দানের চেষ্টাও করেছিল—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি নীতি নিয়োগ করে মুদ্রাহ্রাস, বেকারী এবং অবনমনের পাপচক্রকে ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। ধারাবাহিক ভাবে ডলারের মুদ্রামান হ্রাস করার নীতি অধিকাংশ ঋণগ্রস্তই সানন্দে গ্রহণ করল এবং পশ্চিম প্রান্তের রৌপ্যখনিবিশিষ্ট রাজ্যগুলিও তা' দৃঢ় ভাবে সমর্থন করল। এই সব প্রচেষ্টার শেষ পরিণতি এল ১৯৩৪-এর জানুয়ারী মাসে, তখন সরকার ডলারের মূল্য তার প্রাক্তন সরকারি স্বর্ণমূল্যের ৫৯'৬ শতাংশে বেঁধে দিল। এরপর শাসকবর্গ আর বেশী পরিমাণে মুদ্রামান হ্রাস করার নীতি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

শিল্পগত এবং কৃষিজাত উৎপাদন সম্পর্কে একটা "পরিকল্পিত অভাব" সৃষ্টি করে নব-বিধানের মূল্যমান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাও সুগভীর অর্থপূর্ণ। এই ভাবধারাকে কাজে পরিণত করার জন্য কংগ্রেস ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকভারি এ্যাক্ট এবং এগ্রিকালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করলেন।

এ. এ. এ. সরকারি অর্থ কৃষকদের সোজাসুজি দান করতেন তারা যে ফসল উৎপাদন করত না, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে। এর মধ্যে ফার্ম ব্যুরো ফেডরেশন এবং ন্যাশনাল গ্রেঞ্জের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীদের সফল চাপ প্রতিফলিত হয়। এই আইন-বিধি দেশ জুড়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় তুললো এই বিধির অন্তর্নিহিত যুক্তিযুক্ততা ও কার্যকরিতা সম্পর্কে।

ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট এন. আই. আর. এ-কে যদিও "আমেরিকান কংগ্রেস কর্তৃক এ পর্যন্ত গৃহীত সকল বিধির মধ্যে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী এবং গুরুত্বপূর্ণ আইন-বিধি" বলে অভিহিত করেছিলেন, তথাপি এন. আই. আর. এ. বিষয়ে উত্তেজিত বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এন. আই. আর. এ. সরকার-সমর্থিত 'কার্টেল' (জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাতাদের জোট) জাতীয় সংস্থা যা বাণিজ্যিক সঙ্ঘসমূহের আশেপাশে আবর্তিত হয়েছে। এই সংস্থা 'গলা-কাটা প্রতিযোগিতা' নিবারণের চেষ্টা করেছে এবং উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদনকে 'প্রকৃত প্রয়োজনের' পর্যায়ে সীমিত রেখেছে। এ-ছাড়া, এন. আই. আর এ প্রবর্তিত আচরণবিধি যারা গ্রহণ করেছিলেন সেই সব বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীদের ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা করেছিল এই প্রতিষ্ঠান। এই আইনের ৭ এ ধারা যা সর্বপ্রথম শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার এবং সম্মিলিত ভাবে দর-কষাকষির সুযোগ দান করেছে, তা এন আই. আর এ-র প্রতি শ্রমিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে রচিত হয়।

অর্থনীতির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে—এই অনুমানে ব্যবসায়ীবৃন্দ তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধি করায়, কারখানার কর্মসংস্থান অতি দ্রুত বেড়ে গেল। কারখানার কর্মীনিয়োগ-সূচী ১৯৩৩ এর জুন মাসে ৭১ ৬ থেকে সেপ্টেম্বরে ৮৫ ০-তে পৌঁছোয় (১৯২৩-২৫=১০০)। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অবশ্য ন্যাশনাল ইনডাস্ট্রিয়াল রিকভারি এ্যাক্ট অর্থনীতির মধ্যে প্রচুর ক্রয়-ক্ষমতা সঞ্চারিত করতে বিফল হল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই এ্যাক্টটিকে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-বিরোধী বলে সাব্যস্ত করলেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্টের ভাষণাদিতে একটা মূল বক্তব্য লক্ষ্য করা গেল। রুজভেল্ট বলতে লাগলেন যে, সরকার হলেন মধ্যস্থ, তাঁরা একটা সমতা স্থাপন করবেন, সকল মুখ্য স্বার্থগুলিকে একতাবদ্ধ করবেন, আর তিনি নিজে একজন "পাকা দালাল" যিনি একটা মহান এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতির বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যস্থতা করবেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে নব-বিধানের প্রবণতা 'অভাব সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ত্রাণ লাভ'—এই নীতি থেকে এবং 'দালাল রাষ্ট্র'-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে গিয়ে ব্যাপক কল্যাণধর্মী প্রকৃতিবিশিষ্ট ফেডরেল সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের দিকে ঝুঁকল। ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের নির্বাচনে বিরাট ডেমোক্রাটিক বিজয় কিংবা আর্থনীতিক সংকট ত্রাণে এন. আই. আর. এ. বা এ. এ. এ-র বিফলতা এই নীতি পরিবর্তনের উপযুক্ত ব্যাখ্যা নয়। অন্যান্য বহু জরুরী ঘটনার চাপে দ্বিতীয় পর্যায়ের নব-বিধানের অভ্যুদয় ঘটে।

নব-বিধানের সংকটপূর্ণ প্রথম মাসগুলিতে শিল্প-সংস্থা, শ্রমিক, কৃষক এবং সরকার সবাই মিলে একটা ঘরোয়া মৈত্রী স্থাপন করেন। কিন্তু এই মৈত্রীতে অচিরেই ফাটল দেখা গেল, আর পাঁচ বছরের অবনমনের শেষ পর্যায়ে তা' একেবারে ভেঙে পড়ল। লগ্নীকারক এবং শিল্পপতি সম্প্রদায়ের শক্তিশালী অংশ, এমন কি সংবাদপত্রসমূহও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত তীব্র রকমের নব-বিধানবিরোধী 'আমেরিকান লিবার্টি লীগ'কে সমর্থন করতে শুরু করল।

নিদারুণ আর্থনীতিক ক্লেশের ফলে সংস্কারক এবং গণ-আন্দোলনকারীদের পক্ষে প্রচারের একটা উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি হল। হুএ লং পবিকল্পিত "দেশের সম্পদে সকলকে অংশ দানের" উদ্ভট পরিকল্পনা, ফ্রান্সিস টাউনসেণ্ডের অকার্যকর পেন্সন পরিকল্পনা এবং ফাদার চার্লস কাউলিনের কুসংস্কারের প্রতি আবেদন অসংখ্য অনুগামীদের আকর্ষণ করল। এই সব এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর আক্রমণ রুজভেল্টের শাসন-ব্যবস্থার নব-বিধান শাসকগোষ্ঠীর দেহে কাঁটার মত বিঁধল।

ফুটন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শীতল করার উদ্দেশ্যে রুজভেল্ট একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে প্রয়াসী হলেন। ১৯৩৪-এর শেষ ভাগে এবং ১৯৩৫-এ যে কার্যসূচীর সূত্রপাত করা হল তা' স্পষ্টতঃ অধিকসংখ্যক জনগণকে নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার মান দানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

রুজভেল্ট তাঁর নতুন কার্যসূচী স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন ১৯৩৫-এর কংগ্রেসে প্রেরিত তাঁর বার্ষিক বাণীতে। তিনি ঘোষণা করলেন: "আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জনগণ প্রাচীন অসাম্যের অসুবিধা ভোগ করছেন, অতীতের এলোমেলো প্রতিষেধক ব্যবস্থায় তার অতি অল্প পরিবর্তনই ঘটেছে। আমাদের প্রচেষ্টা এবং আমাদের আলোচনা সত্ত্বেও আমবা যারা অতিমাত্রায় সুবিধাভোগী তাঁদের নিঙড়ে ফেলতে পারিনি, আর যারা অতি সামান্য সুবিধার অংশভাগী তাদেরও অবস্থার উন্নতি সাধন কবতে পারিনি।"

সরকারি নীতি পরিবর্তনের চিহ্ন ১৯৩৫-এ বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠল। আমেরিকার ইতিহাসের আর্থনীতিক ও সামাজিক কার্যসূচী-সংক্রান্ত আইনকানুনের মধ্যে এই বিধি ছিল সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সরকারের পরিবর্তিত ভূমিকা লক্ষ্য করা গেল এই সব মুখ্য সংস্কারমূলক আইন-বিধি, যথা—ওয়াগনার লেবর রিলেসনস্ এ্যাক্ট ও সোশ্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্টের প্রণয়নে। ওয়াগনার এ্যাক্ট শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার এবং মালিকদেব সঙ্গে নিজেদের নির্বাচিত ইউনিয়নের মাধ্যমে সম্মিলিত ভাবে দর-কষাকষির সুযোগ দান করল। সোশ্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ছিল একটা ব্যাপক বিধি অনেক প্রত্যাশা নিয়ে একটা ন্যূনতম আর্থনীতিক মান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত। এব দ্বারা বৃদ্ধ বয়সের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হল সরকারের নিয়ন্ত্রণে, তাব জন্য অর্থ-ব্যবস্থা হল 'পেরোল ট্যাকসে'র সূত্রে, এই অর্থের ভার নিয়োগকর্তা মালিক এবং কর্মী-শ্রমিক উভয়কেই সমান অংশে নিতে হয়। এব দ্বারা আবাব অঙ্গরাজ্যগুলিব মাধ্যমে পবিচালিত একটা বেকাবী ক্ষতিপূবণের পদ্ধতি বচনা কবা হল। উপযুক্ত এই এ্যাক্টের ধাবানুসারে অভাবগ্রস্ত বৃদ্ধদের, পলগ্রহ সন্তানদের, বিধবা এবং অন্ধ মানুষদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল।

দ্বিতীয় রুজভেল্ট শাসনকালে রচিত আইন এই কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক করে তুলল। সুপ্রীম কোর্টের সংস্কার-প্রচেষ্টায় ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তা'ছাড়া, ঐ দলের মধ্যেই একটা বিরোধী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই কয়েক বছরে, অন্যান্য বহু আইনের সঙ্গে ফেয়াব লেবর ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনানুসারে আন্তরাজ্য বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য একটা ন্যূনতম বেতন নির্ধারিত করা হল। যারা সপ্তাহে ঘণ্টার বেশী কাজ করে তাদের বেতন নিয়মিত বেতনের দেড় গুণ ধার্য করা হল।

এই সব বছরগুলির সংস্কারমূলক আইনসমূহেব পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে রিচার্ড হফষ্টাডটার লিখেছেন: "১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, এ-কথা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে সংস্কারবাদের সামাজিক ভিত্তিতে কিছু সংযোগ সাধন করা হয়েছে। মহৎ এবং শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের দাবীসমূহ এবং কর্মহীনদের স্বার্থ যৌথভাবে পরবর্তীকালীন নব-বিধানকে একটা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বা সমাজবাদী গণতন্ত্রের স্পর্শ

দান করেছে, যা আগে কখনও আমেরিকান সংস্কারমূলক রাজনীতিতে উপস্থিত ছিল না।" *

রুজভেল্টের শাসন-ব্যবস্থা যখন সামাজিক সংস্কারে মগ্ন, সেই সময়ে ১৯৩৭-৩৮-এর তীব্র মন্দা রুজভেল্টের কাছে নব-বিধান অর্থনীতির নীতিসমূহের অনুপযুক্ততা প্রমাণিত করল। এই আর্থিক মন্দার জন্য অংশতঃ দায়ী সরকারের ১৯৩৬-এর সংকটত্রাণ যে সব নীতির বশে সম্ভব হয়েছিল সেগুলি থেকে পিছু হটে যাওয়া, অর্থাৎ ত্রাণ, পূর্ত কর্ম, কৃষি ঋণ এবং প্রাক্তন সৈনিকদের বোনাস বাবদ বর্ধিত সরকারি ব্যয়নীতির অবসান।

বর্ধিত হারে এই সব সরকারি খরচের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জাতীয় ঋণের পরিমাণ ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেল। যে শাসনচক্র তখনও পর্যন্ত রক্ষণশীল অর্থ-ব্যবস্থা আঁকড়ে ছিল, এখন তা' বাজেটের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। এর ফলে, ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড ঋণের নীতিকে কঠিন করে ব্যাঙ্ক রিজার্ভ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করলেন, আর সরকার ওয়ার্কস্ প্রোগ্রেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন খাতে ব্যয় অর্ধেক হ্রাস করে দিলেন।

এই নীতির ফলে মোট জাতীয় উৎপাদন খাতে সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ ৩০০ কোটি ডলারেরও বেশী হ্রাস পেল, শিল্পগত উৎপাদন-সূচী ১৯৩৭-এর অগাষ্ট মাসের ১১৯ থেকে ১৯৩৮-এর মে মাসে ৮১-তে নেমে এল (১৯৩৫-৩৯ = ১০০) এবং ৮০ লক্ষ শ্রমিক বেকার পর্যায়ভুক্ত হল।

১৯৩৭-এর আর্থিক সংকটের তীব্রতা শাসকবর্গকে তাদের গোঁড়া কর-নীতিকে পরিহার করতে বাধ্য করল এবং তাদের বাধ্য হয়ে ঘাটতি ব্যয়নীতি গ্রহণ করতে হল। সরকারি খরচপত্রের বৃদ্ধির সমর্থনে ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে সরকার ঘোষণা করলেন: 'আজকের এই ক্রয়শক্তি আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে দ্রুত গতিতে উন্নত করার পক্ষে যথেষ্ট না। সরকারের দায়িত্বভার আমাদের বাধ্য করছে স্বাভাবিক অর্থ সরবরাহের অপ্রতুলতা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে আসতে যাতে নতুন সরবরাহ পর্যাপ্ত হয় সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।" এই নীতিকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হল প্রভাবশালী গোষ্ঠীর তরফ থেকে, তারা কর-ব্যবস্থায় গোঁড়ামির নীতিকেই সমর্থন করতে লাগলেন।

---

* Age of Reform. New York Alfred A. Knopf, Inc. 1958.

অবনমনের কালে পরিপূরক সরকারি ব্যয় আমেরিকান রাজনীতিতে এখন আর একটা বিশিষ্ট প্রশ্ন হিসাবে নেই। যদিও নির্দিষ্ট কর্মসূচীর খুঁটি-নাটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, এবং ব্যয়ের কাল এবং মাত্রা নিয়ে আজও মতবিভেদ দেখা যায়, কিন্তু উভয় মুখ্য রাজনৈতিক দলই এখন স্বীকার করেন যে বর্ধিত সরকারি ব্যয়, মুদ্রাসংকোচ-বিরোধী নীতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ।

'দি পলিটিকস্ অব ইনডাষ্ট্রি' গ্রন্থে ওয়ালটন হ্যামিলটন নব-বিধানের সারাংশ এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন: "এর নীতি তাৎক্ষণিক জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য উদ্ভাবিত উপায়। যে-সব যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়েছে তারা ছিল এজেন্সি, কমিশন, বোর্ড, অথরিটি প্রভৃতির যেন এক বর্ণমালা,—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ছিল অস্থায়ী। যে সব বিধি-ব্যবস্থার একত্রিত ভাবে নব-বিধান নামকরণ হয়েছে, তারা কতক পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। এই সঙ্গতিহীনতার কারণ—তাদের পিছনকার দর্শন ছিল সদা পরিবর্তনশীল এবং প্রকৃতিতে তারা এমনই পাঁচমিশেলী ছিল যে তাদের একত্রিত করে একটা সংহত রূপদান করা ছিল অসম্ভব। ...সব কয়টিই ছিল রাজনৈতিক শৈলীর উদ্ভাবিত কলাকৌশলে পূর্ণ। রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির মধ্যকার প্রকাণ্ড ব্যবধান ভেঙে পড়েছিল।" *

---

* New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1957.

মুখ্য নব-বিধান

এগ্রিকালচারাল এ্যাডজাষ্টমেণ্ট এ্যাক্ট (১৯৩৩) : দ্বারা উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে খামারজাত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হল, কৃষকরা কয়েকটি বিশেষ ধরনের ফসলের উৎপাদন হ্রাস করলেন এবং সরকার উৎপাদন না করার জন্য তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিলেন। যদিও ১৯৩৬-এ এই আইন সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষিত হয়, কিন্তু এর মুখ্য নীতিগুলি ১৯৩৮-এর দ্বিতীয় এ. এ. এ-তে সংযুক্ত করা হল, এবং সুপ্রীম কোর্ট তা' অনুমোদন করলেন।

টেনেসী ভ্যালী অথরিটি (১৯৩৩) : কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা যৌথ সংস্থা (corporation), টেনেসী নদী উপত্যকার সম্পদ উন্নয়ন করা এর উদ্দেশ্য। টি. ভি. এ-কে টেনেসী এবং তার শাখাসমূহে বাঁধ নির্মাণের অধিকার দান করা হল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য, নাব্যতার উন্নতি সাধন, প্লাবন নিয়ন্ত্রণ, মৃত্তিকার ক্ষয় নিরোধ এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন।

ন্যাশনাল ইনডাষ্ট্রীয়াল রিকভারি এ্যাক্ট (১৯৩৩) : গোড়ার দিকের এই নব-বিধান নীতি অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত। এর দ্বারা কয়েকটি 'বিধি' (codes) রচনা করে যে-সব শিল্প-সংস্থা বেতন এবং দ্রব্যমূল্য স্থির করেন তাদের মধ্যে একটা নায্য প্রতিযোগিতার ধারা প্রবর্তন করা হয়। এর দ্বারা কর্মীদের সম্মিলিত ভাবে মালিকগোষ্ঠীর সঙ্গে দর-কষাকষির সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন শাসনতন্ত্রবিরোধী বলে ঘোষিত হয়।

ব্যাঙ্কিং এ্যাক্ট (১৯৩৩) : এই এ্যাক্ট 'গ্ল্যাস-ষ্টীগাল এ্যাক্ট' নামেও পরিচিত। এর দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির লগ্নীমূলক ব্যাঙ্কিং নিষিদ্ধ করা হয়। ব্যাঙ্কের আমানত বীমাকরণের জন্য এর দ্বারা 'ফেডরেল ডিপোজিট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন' গঠিত হয়।

আইনকানুন

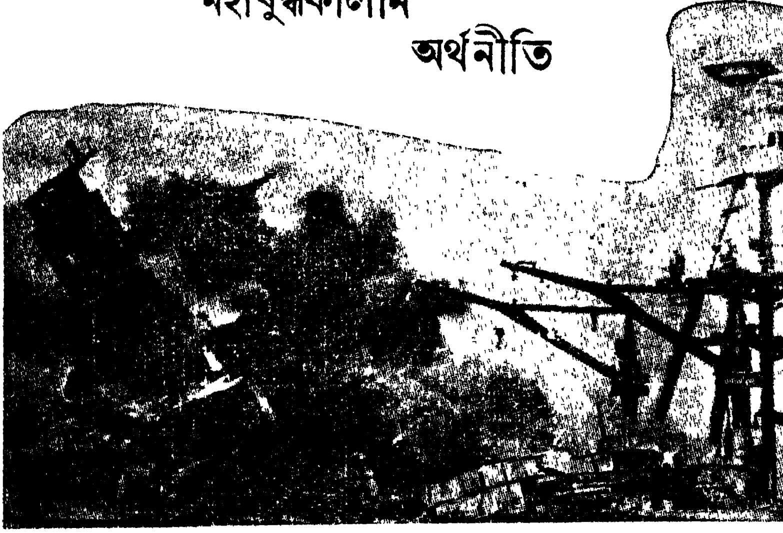
সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ এ্যাক্ট (১৯৩৪) : দ্বারা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠিত হয় স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণের এবং জাল শেয়ার বাজারে চালু করার হাত থেকে লগ্নীকারককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এই আইন ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডকে স্টক ক্রয় (প্রান্তিক প্রয়োজনসমূহ) ব্যাপারে ব্যবহৃত ঋণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দান করে।

সোশ্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (১৯৩৫) : বার্ধক্য এবং মৃত্যুর পরে নির্ভর ব্যক্তিদের জন্য একটা বীমা পদ্ধতি স্থাপন করে। এর প্রয়োজনীয় অর্থ কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীরা তুল্যাংশে দেয়। এই বিধি অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির পরিচালনায় একটা বেকারী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও ছিল। উপরন্তু, অভাবগ্রস্ত বৃদ্ধ, নির্ভরশীল শিশু-সন্তান এবং অন্ধদের সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল।

ন্যাশনাল লেবার রিলেসনস এ্যাক্ট (১৯৩৫) : এর জনপ্রিয় নাম ওয়াগনার এ্যাক্ট, এন. আই. আর. এ. বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর এটা বিধিবদ্ধ করা হয়। এর দ্বারা শ্রমিকগণ সম্মিলিত ভাবে মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষির অধিকার লাভ করে এবং আইনটি পরিচালনার জন্য 'ন্যাশনাল লেবার রিলেসনস বোর্ড' গঠিত হয়।

ফেয়ার লেবার ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এ্যাক্ট (১৯৩৮) : আন্তরাজ্য বাণিজ্যিক কর্মে নিযুক্ত অধিকাংশ কর্মীর জন্য ঘণ্টাপ্রতি ৩০ সেণ্ট ন্যূনতম বেতন বরাদ্দ করা হয়, এরপর বহুবার এই হার বাড়ানো হয়েছে। এর দ্বারা সপ্তাহে যারা ৪০ ঘণ্টার বেশী কাজ করে, তাদের ৪০ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য নিয়মিত বেতনের দেড়গুণ বেতন ধার্য করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অর্থনীতি



পার্ল হারবার, ডিসেম্বর, ১৯৪১ : আরিজোনা' নামক যুদ্ধ-জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত-মহাসাগরীয় নৌবাহিনীর ওপর আকস্মিক আক্রমণ করায় প্রজ্জ্বলিত ও পরে নিমজ্জিত। ১১ই ডিসেম্বর জার্মাণী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্র ১০,০০০ মাইল দূরস্থ সমরবাহিনীর সম্মুখীন হয়।

এতরকম আশাজনক পদ্ধতি সত্ত্বেও নব-বিধান কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আমেরিকান ধনতন্ত্রের শক্তিতে যথেষ্ট আস্থার সৃষ্টি করতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্র যে বিস্ময়কর আর্থনীতিক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, বক্রী সংশয় কিন্তু তার ফলে অদৃশ্য হয়ে গেল!

১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ১৯৩৯-এর শরৎকালে ইউরোপ এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল, আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যবাদী (isolationist) মনোভঙ্গী যদিও তখন পর্যন্ত কোনো কোনো অঞ্চলে রীতিমত প্রবল, তথাপি নাৎসী সন্ত্রাস সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ক্রমশঃই একটা সচেতন ভাব জাগ্রত হয়ে উঠছিল। 'ক্যাস্ অ্যাণ্ড ক্যারী' (টাকা দাও, মাল নাও) নীতি অনুসারে বাইরের দিক থেকে নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্র

সরকার সমরোপকরণ মিত্রপক্ষকে সরবরাহ করতে আরম্ভ করলেন যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই একই নিরপেক্ষ সরকার উৎপাদকদের কাছে বিমান প্রত্যর্পণ করলেন যাতে সেগুলি মিত্রপক্ষের কাছে তারা 'পুনর্বিক্রয়' (resale) করতে পারেন। এ ছাড়া ৫০টি 'পুরানো' (overage) ডেষ্ট্রয়ার ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং বারমুডায় নৌঘাঁটি স্থাপনের অধিকারের বিনিময়ে ১৯৪০-এর শরৎকালে ব্রিটেনে পাঠান হল। এর ওপর, সর্বপ্রথম, শান্তিকালীন সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বাধ্যতাকরণমূলক বিধি প্রবর্তিত হল এবং ১৮শ' কোটি ডলার মূল্যের 'টু-ওসেন রিআর্মামেন্ট' বা সামুদ্রিক পুনঃ-সশস্ত্রীকরণ কার্যসূচী গৃহীত হল। বহুবিধ সমর-সাংগঠনিক সংস্থাও সংগঠন করা হল।

১৯৪১-এ বিরাট আকারের বন্ধকী-ঋণ (Lend-Lease) প্রকল্প শুরু হল। সেই আর্থিক বছরে প্রকৃত সামরিক ব্যয় ৭শ' কোটি ডলারে পৌছোল। এই অর্থ প্রাক্-যুদ্ধকালীন যে-কোনো বছরের ফেডরেল বাজেটের সামগ্রিক বরাদ্দের সমতুল। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সামরিক যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয়ের হার মাসিক ২০০শ' কোটি ডলারের মত দাঁড়াল। ১৯৩০-এর পর বেকারীর পরিমাণ নিম্নতম স্তরে পৌছোল, তখনও অবশ্য ৫৫ লক্ষ কর্মপ্রার্থী কর্মহীন ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ভাবে যুদ্ধে প্রবেশ করার পর পণ্যাদি সংগ্রহ এবং উৎপাদনের সংযোগ সাধনের ভার অর্পণ করা হল সদ্য-সংগঠিত 'ওয়ার প্রোডাকশনস্ বোর্ডে'র ওপর। এই বোর্ডের হাতে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দান করা হল। সামরিক এবং অধিকাংশ বেসামরিক কর্মীর পরিচালনভার অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন 'ওয়ার ম্যানপাওয়ার কমিশনে'র ওপর ন্যস্ত করা হল। দ্রব্যমূল্যের হার দৃঢ় রাখার জন্য 'অফিস অব প্রাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' গঠিত হল, এর উদ্দেশ্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি রোধ করা।

সামরিক, বেসামরিক এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে যুদ্ধের নিত্যপরিবর্তনশীল চাহিদাটাই ছিল সর্বপ্রকার আর্থনীতিক পরিকল্পনার ভিত্তি। সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য সম্পদকে এই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ ভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া হত। শিল্প-সংক্রান্ত বহুবিধ নিয়ন্ত্রণ-বিধিকে সংস্কার করা হল কিংবা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর ফলাফল লক্ষ্য করে সেগুলি পরিহার

করা হল ; কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য প্রয়োগ দ্বারা তাকে কার্যকরী করে তোলা হল। যে রকম পদ্ধতিই অবলম্বিত হোক না কেন, খোলা বাজারের কলাকৌশল যেখানেই ধীরগতি, অক্ষম বা জরুরী প্রয়োজন সাধনে অসমর্থ মনে হয়েছে, সেখানেই আর্থনীতিক পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

দেশের উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করার জন্য গৃহীত একটা নীতি ছিল বেসরকারি শিল্প-সংস্থাসমূহকে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি বা উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য প্রেরণা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে সরকার ঋণ ও দাদন করলেন বা ব্যাঙ্ক ঋণের গ্যারাণ্টি প্রদান করলেন। সরকার দুষ্প্রাপ্য কাঁচা মালের অধঃপ্রান্তিক উৎপাদকদের কয়েকশ' কোটি ডলার পরিমাণ যন্ত্রপাতির বর্ধিত ক্ষয়ক্ষতিমূলক কর ও সরকারি সাহায্যের সুযোগ দিলেন।

এই সব প্রেরণা সত্ত্বেও উৎপাদকরা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারণ করতে পারেননি। তাদের এই কাজ করার অনীহার এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক বিশেষ ধরনের কলকারখানার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাজারে তাদের কার্যকরিতা ছিল অনিশ্চিত।

সরকার তখন সরাসরি সমরকালীন কলকারখানা নির্মাণে লাগলেন, এই প্রচেষ্টায় প্রায় ১৬শ' কোটি ডলার ব্যয় করা হল, অর্থাৎ নতুন যুদ্ধকালীন কলকারখানার প্রায় পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ সরকার নিজে তৈরী করলেন।

সিনথেটিক (রাসায়নিক সংমিশ্রণে গঠিত) রবার, ম্যাগনেসিয়ম, উড়োজাহাজ এবং জাহাজের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৯০ ভাগের মালিকানা ছিল সরকারের ; অ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ ; আর জাতির ছোট-খাটো যন্ত্রপাতির অর্ধাংশ, এবং দু'টি মুখ্য তৈলবাহী পাইপলাইনের মালিকানা ছিল সরকারের হাতে। এই সমস্ত কলকারখানায় বেশীর ভাগই অবশ্য 'লিজে'র ভিত্তিতে পরিচালিত হত, তবে স্বয়ং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণেরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে।

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, এমন কি বেসামরিক ব্যবহারের মোটর গাড়ীর উৎপাদনও সীমিত করেছিল। অতি-জরুরী দ্রব্যাদির জন্য অগ্রসরবরাহ (priority) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হল। অন্যান্য পণ্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজন তালিকা, উৎপাদন নির্ঘণ্ট এবং বণ্টন নির্দেশ এই ব্যবস্থার পরিপূরক হল। বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যথা—ইস্পাত,

তামা এবং এলুমিনিয়ম—প্রত্যক্ষ ভাবে 'কণ্ট্রোলড মেটিরিয়্যালস প্ল্যান' দ্বারা বণ্টন করা হল। এই পরিকল্পনার কার্যকরি পরিচালনা অবশ্য অবশ্যম্ভাবী শাসনতান্ত্রিক জটিলতার দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছিল।

সম্পদ বণ্টনে নৈপুণ্যের অভাব সামরিক উৎপাদনে রত শিল্পসমূহকেও নিরন্তর ব্যাহত করেছে। পণ্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে সব সময়ই দেওয়া হয়েছে। ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষ বাজেটের অর্থকৃচ্ছ্রতা সম্বন্ধে সচেতনতা হারিয়েছে। এর ফলে সমরোপকরণের সঠিক পরিমাপ উৎপাদকদের হাতে দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-মূল্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যতদূর সম্ভব কম সময়ে যত বেশী পাওয়া যায় তা' নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে।

সামরিক প্রচেষ্টার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগত কারণও আবার সমর ঠিকাদারদের ব্যয় হ্রাস করার উৎসাহ হ্রাস করেছে। রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত লাভ কর, যা নিয়মিত ব্যবসায়িক আয়করের ওপর চাপান হয়, তা' খরচের হিসাব নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। তা' ছাড়া, সরকারি 'কষ্ট-প্লাস' কণ্ট্রাক্টগুলির পরিপূরণে প্রচুর অপচয় ঘটেছে, যুদ্ধকালীন উৎপাদনের যা হল শতকরা ৩০ ভাগ অংশ। এই সব কণ্ট্রাক্ট অনুসারে উৎপাদকের খরচের ওপর একটা নির্দিষ্ট লাভের হার বাঁধা ছিল, সুতরাং সেগুলি দক্ষতাকে উৎসাহিত করেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালের চেয়ে বেসামরিক অংশের পরিচালনা অনেক সাফল্যজনক হয়েছিল, বিশেষতঃ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। আগেকার ঘটনাকালে (১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) জীবনযাত্রা নির্বাহের সূচী প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৪১-৪৫-এ (একই নিরিখের ভিত্তিতে) এই সূচী শতকরা মাত্র ২২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতিকে এই ভাবে দাবিয়ে রাখার জন্য দায়ী ছিল অফিস অব প্রাইস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন কর্তৃক মূল্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন। এই সব মূল্য-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ও ক্রেতার চাহিদার পরিমাণের মধ্যকার ফাঁকের দ্বারা সৃষ্ট যে-কোনো রকম মুদ্রাস্ফীতিমূলক ঊর্ধগতিকে নরম করে রেখেছিল। এই অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি অবশ্য অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পণ্য এবং সেবামূলক কার্যাদির উৎকর্ষ অত্যন্ত নিম্ন স্তরে নেমে

যায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে কালো বাজারের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু, ও. পি. এ.-কে সর্বপ্রকার অপরাধ, ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য আক্রমণ করা হয়।

এই সব মানবিক আইন ও প্রতিষ্ঠানগত বিচ্যুতি সত্ত্বেও তার প্রচণ্ড মানবিক ও শিল্পগত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের সর্বমোট সমরোপকরণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ একাই সরবরাহ করে।

১৯৪০-৪৫-এর মধ্যে শিল্পগত উৎপাদন শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (স্থির ডলারের সংখ্যায়) ঐ একই কালের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে অবশ্য 'সামগ্রিক যুদ্ধ' বিবেচনা করা চলে না। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার কালে মোট ৬ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমিকবাহিনীর মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিক সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত ছিল। জাতীয় নিরাপত্তা খাতে ব্যয় ১৯৪৪-এর মোট জাতীয় উৎপাদন ২১১শ' কোটি ডলারের শতকরা ৪৪ ভাগেরও কম ছিল এবং তার পরে তা' তীব্র ভাবে নেমে যায়, যদিও সংঘর্ষ তখনও চলছে। যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় যথেষ্ট সমর-প্রচেষ্টা চলেছে তখন যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক ভোগের পরিমাণ প্রকৃত ভাবে ২০ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। ভোগ্যপণ্যের যথেষ্ট 'রেশনিং' ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমেরিকান বেসামরিকদের যেটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রয়োজনে, তা' ছিল অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ। স্বদেশে আমেরিকানদের লাইনে দাঁড়িয়ে কিছু পরিমাণে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাঁরা চিনি, কফি, মাংস এবং চর্বির কিছু অভাব বোধ করেছেন। তাঁদের মোটর গাড়ীর ব্যবহার কমাতে হয়েছে, কয়েকটি যন্ত্রপাতি (সাংসারিক) কেনা স্থগিত রাখতে হয়েছে, এবং জুতা এবং টিনে-ভর্তি খাদ্য ব্যবহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। দাস-দাসী, সেলসম্যান, চাকর এবং নার্স প্রভৃতির অভাবের জন্য তাঁরা খুঁতখুঁত করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় অভাবের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের চেয়েও বেতন-সংক্রান্ত পার্থক্যই বেশী দায়ী ছিল। মোটের ওপর, উৎপাদন এবং ভোগ্যপণ্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও আমেরিকান নাগরিক অন্য যে-কোনো যুদ্ধরত জাতির নাগরিকদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পেয়েছে।

একটা বড় রকমের বিশ্বযুদ্ধ চিরাচরিত গোছের হলেও মানবিক নিরিখে একটা বিপর্যয়। মানবিক ব্যয়ের কথা বাদ দিলেও যুদ্ধের একটা প্রত্যক্ষ

আর্থনীতিক ব্যয়ও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। সশস্ত্র বাহিনীর ক্রিয়া-কলাপ তার ডলারগত মূল্যের নিরিখে বিচার করা কঠিন। কিন্তু ১৯৪০-এর জুলাই মাস থেকে ১৯৪৫-এর জুলাই পর্যন্ত সমরোপকরণের সামগ্রিক উৎপাদনের মূল্য ওয়ার প্রডাকশন বোর্ডের মূল্যায়নে চলতি মুদ্রামানের নিরিখে প্রায় ১৮৬শ' কোটি ডলার। এর মধ্যে সম্পূর্ণ 'ইজারা' (Lend-Lease) সাহায্যের পরিমাণ মোটামুটি হিসাবে ৩৬শ' কোটি ডলার। উত্তর-নববিধান কালের শান্তিকালীন হিসাবের ৪২শ' কোটি ডলার থেকে মোট জাতীয় ঋণের পরিমাণ যুদ্ধের অবসানে ২৫৮শ' কোটি ডলারে পৌঁছোয়।

যদিও প্রেসিডেন্ট বেতনবাবদ ২৫,০০০ ডলারের একটা সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব করেন, সমরকালীন ধননীতিকে সুস্পষ্ট ভাবে আয় পুনর্বণ্টনের তালে এগিয়ে নেওয়া যায়নি। অন্যদিকে, আশা করা গিয়েছিল যে, উচ্চতর করহার এবং প্রশস্ততর কর-ভিত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধকালীন আইনকানুন এবং নিয়ন্ত্রণ-বিধি হয়ত মুনাফাবাজী এবং ক্লেশভোগ উভয়বিধ অবস্থা নিবারণে সমর্থ হবে।

প্রকৃত সমরব্যয় বহুল পরিমাণে মুখোসে ঢাকা পড়েছে এই কারণে যে প্রায় সকলেই বৃহত্তর আর্থনীতিক 'পরমান্ন' (pie) যতটুকু সুলভ ছিল তা' গ্রহণ করেছেন। লাভের পরিসংখ্যান যৌথ সংস্থাসমূহের যে সামঞ্জস্যবিহীন লাভ হয়েছে সেই বিষয়ের সাধারণ প্রবণতা প্রকাশ করে দিতে সমর্থ হয়নি। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪-এর মধ্যে ট্যাক্স প্রদানের পূর্ববর্তী কর্পোরেশনের লাভের অঙ্ক ৩½ গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অধিকতর গ্রহণযোগ্য ট্যাক্স-উত্তরকালীন লাভের পরিমাণ মাত্র দ্বিগুণের মত বেশী হয়েছিল। অন্যদিকে, ডলারের চলতি মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ২⅓ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অবশ্য, এই ব্যাপক পরিসংখ্যান চিত্রের গণ্ডীতে কয়েকটি ব্যবসা প্রবল ভাবে উন্নতি লাভ করেছে; যথা—একটি সরকারি রিপোর্ট উল্লেখ করেছে যে, নির্মাণকার্যের উপযুক্ত ধাতুজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে করদান করার পরেও লাভের মাত্রা ষোল গুণ বেড়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট কারবারগুলিতে অধিক লাভের চিহ্ন দেখা গেছে, তার কারণ তারা হয়ত সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ-মূলক আইনগুলিকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল।

ধর্মঘটবিরোধী প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ সমিতিভুক্ত শ্রমিকেরা পরিমাণের সঙ্গে তাল রেখে মজুরী বৃদ্ধির জন্য সরকারের উপর নির্ভর করেছিল। ১৯৪২-এর জুলাই মাসের 'লিটল ষ্টীল ফরমুলা' দ্বারা সাধারণ ভাবে সেই তারিখের জীবনযাত্রার সূচীর সঙ্গে তাল রেখে শতকরা ১৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হল। এর ওপর, শ্রমিকবাহিনীর আর্থনীতিক পরিস্থিতি অনেক উন্নত হল যখন কোম্পানীগুলি তাঁদের কর্মচারীদের আরো অনেক 'প্রান্তিক সুবিধা' (fringe benefits), যথা—পেনস্ন পরিকল্পনা, চিকিৎসা-ব্যবস্থা ইত্যাদি দিলেন। পরিপূরক পারিবারিক আয় আরো কিছু বৃদ্ধি পেল যখন নারী এবং যুবকবৃন্দ অধিক সংখ্যায় শ্রমিকবাহিনীতে এসে যোগ দিল। বণ্ডের জন্য বেতন থেকে কিছু কেটে নেওয়া হত, তার সঙ্গে পণ্যাদির অভাব হেতু স্বেচ্ছা-সঞ্চয়ন যুক্ত হওয়ার ফলে দেশে সম্ভাব্য নগদ অর্থ অনেক বেড়ে গেল।

যুদ্ধের কালে কৃষকরা ভালোই চালিয়েছে, কারণ সরকার শুধুমাত্র উৎপাদনকেই যে উৎসাহিত করেছেন তা' নয়, বরং উদ্বৃত্ত কৃষিজাত উৎপন্নকে কিনে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেছেন। উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে ফসল বেড়েছে, যদিও ৫০ লক্ষ মানুষ কৃষিকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল যুদ্ধের কালে। এই ভাবে, বাৎসরিক খামারগত আয়, যদিও তখন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত মানের অনেক নীচে, ১৯৩৯-এ মাথাপিছু ২৪৯ ডলার থেকে যুদ্ধের শেষে মাথাপিছু ৭০০ ডলারে পৌছোয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে অভিজ্ঞতা এবং পরিবর্তন ঘটেছে, অবশ্যম্ভাবী গতিতে তা' যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর নীতিকে প্রভাবিত করেছে। যুদ্ধের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে কর্মী নিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান সম্ভব হওয়ায় এই ধারণার উৎপত্তি হল যে, শান্তিকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণে সরকারি হস্তক্ষেপ একটা গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল। ফেডরেল বাজেট যুদ্ধের পরে কখনও মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশের নীচে নামেনি, আর সামরিক খাতের খরচপত্র বাজেটের অন্ততঃ অর্ধেক অংশ জুড়ে আছে।

যুদ্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব সংসারে অনেক রকম অসমাপ্ত কাজের সম্মুখীন হল। জনস্বার্থ-সংক্রান্ত কাজকর্ম বিশ্রী ভাবে বাকী পড়েছিল, কারণ সরকারের সকল স্তরে সবাই মুখ্যতঃ সমর-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে শ্রমিকবাহিনীকে বেশী রকম টান দেওয়ার ফলে বহু সামাজিক

অসুবিধারও সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন—অপ্রচুর গৃহনির্মাণ ব্যবস্থা, বাধাপ্রাপ্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা, এবং কিশোর-সমাজের দুষ্কৃতি ইত্যাদি বেড়ে যায়।

যদিও ঘরোয়া সমস্যাগুলি ছিল জরুরী, যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আবার তার স্বাতন্ত্র্যবাদে (isolationism) ফিরে যেতে পারল না। যুদ্ধের শেষে স্পষ্টই দেখা গেল যে, পশ্চিম ইউরোপের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়েছে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা মৃতকল্প, এবং উজ্জ্বলতর জীবনের জন্য পৃথিবীর সর্বাংশে জনগণের অভীপ্সা ভবিষ্যতে প্রবল হয়ে উঠবে। বিধ্বস্ত পৃথিবী ক্রমেই পশ্চিমের প্রধান আর্থনীতিক দুর্গপ্রাকারের দিকে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করল পুনর্বিধান এবং প্রেরণা লাভের জন্য।

১৯৪৫-এর জানুয়ারী মাসে চতুর্থ উদ্বোধনী ভাষণ দান কালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আন্তর্জাতিক দায়িত্বের বিষয়ে আমেরিকার সচেতনতার কথা ধ্বনিত করলেন: "আমরা জেনেছি যে আমরা একা শান্তিতে বাস করতে পারি না—আমাদের কল্যাণ নির্ভর করে অনেক দূরের মানুষদের কল্যাণের ওপর। আমরা বিশ্বজগতের নাগরিক হতে শিক্ষা লাভ করেছি, আমরা এক বিরাট মানবসমাজের অংশ হয়ে পড়েছি।"

শান্তি ও তার পরপর্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে যে-সব আর্থনীতিক ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু সেই গোড়ার দিকের ভুল-ত্রুটী থেকে যে শিক্ষা লাভ হয়েছিল, যদিও তা' মূল্যবান, নতুন 'চ্যালেঞ্জে'র সম্মুখীন হওয়ার পক্ষে কিন্তু তা' পর্যাপ্ত ছিল না। কয়েকটি মুখ্য ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটল এবং অনেক নতুন ভুল করা হল। তথাপি, আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা, স্থগিত-রাখা ঘরোয়া সংঘাত এবং দ্রুত-পরিবর্তনশীল জটিল ঘটনাবলী সত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভাবে উত্তম সামঞ্জস্য সাধন এই দ্বিতীয় পর্যায়ে করতে পেরেছে।

শান্তিকালীন অর্থনীতি বিষয়ে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়। সেই ১৯৪৪-এর জুন মাসে ওয়ার প্রোডাকসন বোর্ড 'রিকনভারসন প্রোগ্রাম' বা রূপান্তরকরণ কার্যস্চী নিয়ে প্রস্তুত ছিল। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে কারখানাকে সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধের কাজে লাগানোর কাযস্চী ক্রমশঃ শিথিল করা হচ্ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে উদার করা হল। যুদ্ধ-প্রস্তুতি শিথিল করার দাবী এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, ১৯৪৫-এর মে মাসে ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অকালে 'কনট্রোল' বা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হল, কিন্তু পুনরায় আংশিক ভাবে তা' প্রবর্তিত করে অগাস্ট মাসে জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় পযন্ত চালু রাখতে হল।

১৯৪৫-এর গ্রীষ্মকালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুমানের একটা আদেশে ঘোষণা করা হল যে—"যুদ্ধের সময় মূল্য, মজুরী, পণ্যদ্রব্য ও উপযোগাদির উপর যে-সব নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল সেগুলি নিয়মিত ভাবে ক্রমশঃ রদবদল করা হবে আর এই সব রদবদলের লক্ষ্য হবে জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা দৃঢ় ভাবে বজায় রাখা।"

কয়েক মাসের মধ্যে শ্রমশক্তির (manpower) এবং বাণিজ্যিক যানবাহনের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হল, চিনি ব্যতীত সকল ভোগ্য-পণ্যের 'রেশনিং' তুলে দেওয়া হল, এবং অনেক ক্ষেত্রে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ রদ করা হল। এর ওপর এক্সেস প্রফিটস্ ট্যাক্স বা বাড়তি লাভের জন্য ধার্য কর

রদ করা হল। আর 'ট্যাক্স-লস' বা করজনিত ক্ষতিপূরণের সাহায্য দান করা হল যাতে ব্যবসাসমূহ যুদ্ধ থেকে শান্তিকালীন লক্ষ্যে ফিরে আসতে পারে। গৃহ নির্মাণ, রপ্তানি ও কাঁচা মালের ওপর কয়েকটি পূর্বপর্যায় (priority) এবং বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ চাপানো রইল। যুদ্ধকালীন কয়েকটি এই জাতীয় আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ আজও প্রচলিত আছে।

সাধারণ ভাবে এই সব ক্রিয়াকলাপের ফলে সম্পদরাশির শান্তিকালীন ব্যবহারে রূপান্তর সম্ভব হল। কিন্তু এই পদ্ধতি মূল্য-নিয়ন্ত্রণ চালু রাখার জন্য সংঘর্ষের ফলে বিঘ্নিত হল। যাঁরা অফিস অব দি প্রাইস অ্যাডমিনি-স্ট্রেশনের অবসান চেয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসাকে উৎসাহ দানের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেন। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, অর্থনীতিকে শান্তিকালীন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গেলে এবং ভোগ্যপণ্যের বকেয়া চাহিদা মেটাতে গেলে বাজার-ব্যবস্থাকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিতে হবে। অপর পক্ষে ছিলেন অনতিবিলম্বে পণ্যাদির জন্য উপযুক্ত বাজার লাভের বিষয়ে যাঁরা সংশয়াকুল ছিলেন তাঁরা। তাঁদের যুক্তি ছিল জনগণের ক্রয়-ক্ষমতাকে বজায় রাখতে হবে এবং শাসনযন্ত্র কর্তৃক দ্রব্যমূল্য বেঁধে রেখে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে হবে।

যাই হোক, জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণের চাপে অস্থির হয়ে উঠেছিল, এবং এর সঙ্গে যে কি প্রকৃত সমস্যা জড়িয়ে আছে সে বিষয়ে তাদের ধারণা ছিল অতি অল্প। শ্রমিক ইউনিয়ন বেতন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিরক্ত আর ব্যবসাদারেরা মূল্য এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতিতে অসন্তুষ্ট ছিল। ক্রমবর্ধমান গণ-বিরোধিতার ফলে দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করা হল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬-এর শরৎকালে তা' সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেওয়া হল।

সঙ্গে সঙ্গেই বেতন এবং মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠল। পাইকারী মূল্যসূচী যা সমগ্র যুদ্ধকালে মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ বেড়েছিল, ১৯৪৬-এর শেষ ন' মাসে তা' শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ বেড়ে গেল। সেই সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে খুচরা দর শতকরা ১৭ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেল। সৌভাগ্যক্রমে, যুদ্ধকালীন সঞ্চিত চাহিদার ফলে উদ্ভূত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতির পর মুদ্রাস্ফীতি-জনিত ঊর্ধ্বচক্র অনেক মৃদু হয়ে এল। এরপর কোরিয়া যুদ্ধের সূচনার আগে পর্যন্ত অর্থনীতিতে "সরীসৃপ গতিতে মুদ্রাস্ফীতি" দেখা দিতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা ছাড়াও, তাৎক্ষণিক যুদ্ধোত্তর কালের প্রধান 'চ্যালেঞ্জ' ছিল সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই চ্যালেঞ্জকে

স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল ১৯৪৬-এর এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্টে, এই আইনে বলা হল যে, ফেডরেল সরকারের নীতি হল "যে অবস্থার ফলে যারা সক্ষম, ইচ্ছুক এবং কর্মসন্ধানে রত তারা কার্যকরী কর্মসংস্থানের, এমন কি আত্ম-কর্মসংস্থানের পর্যন্ত সুযোগ পাবে, সেই অবস্থাকে বর্ধন এবং সমর্থন করা এবং সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান-ব্যবস্থা, উৎপাদন এবং ক্রয়-ক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা করা।"

এই এ্যাক্ট অনুসারে আরো ব্যবস্থা হল যে: (১) প্রেসিডেণ্ট একটি বাৎসরিক আর্থনীতিক রিপোর্ট দান করবেন, (২) একটি 'কাউন্সিল অব ইকনমিক অ্যাডভাইসার্স' তাঁকে সাহায্য করবেন, (৩) একটি 'জয়েণ্ট কংগ্রেশনাল কমিটি' এই সব রিপোর্ট বিশ্লেষণ করবেন। এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট—এটি সংক্ষেপে যে-সব নীতির দ্বারা সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান করা হবে সেই বিষয়ে সরকারের নৈতিক আশ্বাস—দু'টি মুখ্য রাজনৈতিক দলেরই সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত হয়। রক্ষণশীল এবং উদারনীতিক উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে, আর কখনও যে ১৯৩০-এর ক্লেশের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না—আমেরিকার জনগণকে এই আশ্বাস দানের দায়িত্ব সরকারের।

অদৃষ্টের পরিহাস, পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি বহু গোষ্ঠীর পক্ষে খোলা নিমন্ত্রণের সামিল হয়ে দাঁড়াল, তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এগিয়ে এলেন এই ধারণায় যে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের শাস্তি লাভের আশংকা খুব বেশী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃহৎ যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তির বশে, উচ্চতর মজুরীর দাবীকে বাধা না দিয়ে বরং এই দাবী মেনে নিয়েছে এবং সেই অনুপাতে পণ্যের মূল্য বাড়িয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও মজুরদের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বশে, দাবী জানিয়ে অবিচল ভাবে মজুরী বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এই জাতীয় 'কষ্ট-পুস' (ব্যয়বৃদ্ধিজনিত) মুদ্রাস্ফীতিতে বাঁধা আয়ের মানুষরা, যেমন—অবসরপ্রাপ্ত পেনসনভোগী এবং বণ্ড ও মর্টগেজ লগ্নীকারক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ভাবে ক্লেশ ভোগ করেছে।

'রিসেশান' বা আর্থিক মন্দাকে রোধ করার জন্য যে-সব করনীতিগত এবং মুদ্রানীতিগত পন্থা পূর্বে গৃহীত হয়েছিল, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সেইগুলিকে সমান সহজ ভাবে বাতিল করা গেল না। ক্ষতিপূরক রাজস্বনীতির অঙ্গ হিসাবে করবৃদ্ধি শান্তিকালে রাজনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব মনে হল। ফেডরেল ব্যয় বহু ক্ষেত্রে সংহত করে রাখা হল, বিশেষতঃ কল্যাণমূলক

ব্যবস্থা এবং পূর্ত বিভাগের ক্ষেত্রে; কিন্তু এই ভাবে যে অর্থ বাঁচান হল তা' নতুন চাপ এবং জরুরী অবস্থার ফলে অকার্যকর হল, এবং মোটের উপর বাজেটের সর্বমোট পরিমাণ সমানই রয়ে গেল। মুদ্রানীতিকেও সংকুচিত করে রাখা হল, কারণ 'ট্রেজারি'র (রাজকোষের) অভিপ্রায় ছিল সুদের হার নামিয়ে রাখা এবং বকেয়া সরকারি বণ্ডের মূল্য দৃঢ় ভিত্তিতে রাখা। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল, তা' হল বাজেট-উদ্বৃত্ত যতখানি অনুমোদন করে ততদূর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া এবং কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা (credit control)।

চল্লিশের দশকের যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ বেশি জড়িয়ে যাওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ প্রথম দিকেই একটা গ্রহণযোগ্য যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অর্থনীতির পরিকল্পনা ও আলাপ-আলোচনা সরকার আরম্ভ করেন। যুদ্ধোত্তর খাদ্য এবং কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে ১৯৪৩-এর প্রথম দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটা সম্মেলন বসে। জাতিপুঞ্জের একটা ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (UNRRA) সেই বছরের শেষের দিকে কার্যকরী হয়। ১৯৪৪-এ ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারী ফাণ্ড (IMF) বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গঠিত হয় এবং যে প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় নাম 'ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক', সেই ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভলপমেণ্ট (IBRD) প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধ থেকে শান্তিতে তাৎক্ষণিক রূপান্তর সাধনের কাজ আশ্চর্য রকম সহজ ভাবে ঘটায়, অনেক পর্যবেক্ষক বিবেচনা করলেন যে, এই জ্ঞানগর্ভ দূরদৃষ্টি আন্তর্জাতিক সংকট ত্রাণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। এক বছরের সামান্য বেশী সময়ের মধ্যেই ইউরোপীয় দেশসমূহের বিভিন্ন ধারার শিল্পগত উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধকালীন মানে পৌঁছোল। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনুরূপ ভাবে উঠে দাঁড়াতে ছ' বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর পরবর্তী দ্রুত ধাবমান ঘটনাপ্রবাহ, শীঘ্র স্বাভাবিকত্বে প্রত্যাবর্তনের সকল আশা নির্মূল করল। সেই কাল থেকে 'স্বাভাবিকত্ব' পৌনঃপুনিক আন্তর্জাতিক সংকটের সমষ্টিতে পরিণত হল।

এই সব সংকট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘরোয়া সমস্যার ব্যক্তিগত জগতে পিছু হেঁটে পালিয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হল না। নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কোন দিক থেকেই স্বাতন্ত্র্যবাদ আর যুক্তিযুক্ত নয়।

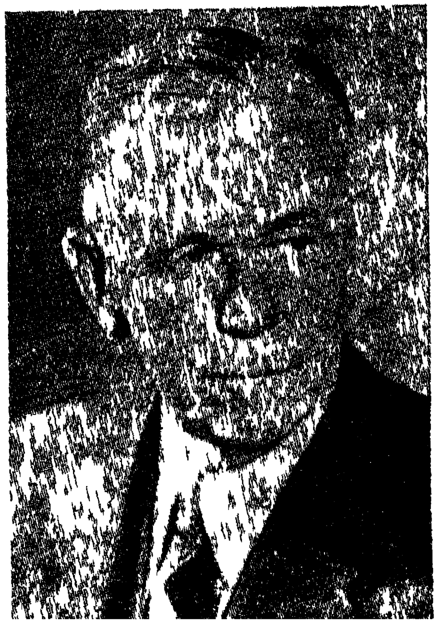
যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ২/৩ অংশ লগ্নীকৃত মূলধন এবং ১/২ অংশ শিল্পসম্ভার নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আবার সেই সঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ১/১৬ অংশ। নিঃসন্দেহে, এই ধরনের একপেশে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, বিশেষতঃ পৃথিবীর সমগ্র অনুন্নত দেশসমূহে যখন "উদ্‌গত প্রত্যাশার বিপ্লব" শুরু হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে অন্ততঃ প্রাক্‌-যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রার মানে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল খুবই বেশী, অন্ততঃ যদি রাজনৈতিক বিপর্যয়কে পরিহার করতে হত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকের যুদ্ধোত্তরকালীন বৈদেশিক আর্থনীতিক নীতি সাধারণ ভাবে দায়িত্বপূর্ণ এবং যথোপযুক্ত ছিল। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহকে অনতিবিলম্বে সাহায্য প্রদান ও আর্থিক ঋণ দানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিল তা' ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বভিত্তিক অর্থনীতির দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মাধ্যমে করা হয়েছিল। মধ্যবর্তীকালীন সময়ের জন্য আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপাদির পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা কিন্তু অবহেলিত থেকে গিয়েছিল এবং এই অবস্থাটাই শেষ পর্যন্ত সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যাঞ্চলরূপে পশ্চিম ইউরোপ ছিল তাই বিশ্বভিত্তিক উৎপাদন ও বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চাবি। ১৯৪৬-এ তার উৎসাহজনক পুনরুজ্জীবন শেষ পর্যন্ত নকল উষায় পরিণত হল। এই কর্মে পশ্চিম ইউরোপের অবশিষ্ট অর্থ ও সম্পদ নিঃশেষিত হয়। এখন বৃহত্তর জনসংখ্যা সকলের জন্য কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি আর দীর্ঘবিলম্বিত কল্যাণমূলক কার্যাদির দাবী জানাল। এই সব দাবী মেটানোর চেষ্টায় সরকারের ব্যয়নীতিকে কঠোরতর করতে হয়েছে এবং যুদ্ধজাত মুদ্রাস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং লাতিন আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইউরোপীয় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতির দাম বেড়েছে। যে সমস্ত জাহাজ যুদ্ধে ধ্বংস হয়নি, তাদের অবস্থা ছিল অতি জীর্ণ। অধিকন্তু, বহির্বিশ্বের লগ্নী এবং উপনিবেশগুলি থেকে আয় ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছিল।

স্নায়ু-যুদ্ধের প্রারম্ভিক হুঙ্কার এই পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলল। ব্রিটিশকে তার ব্যাপক এবং ব্যয়বহুল বহির্বিশ্বের সামরিক দায়িত্ব থেকে সরে আসতে হল। ওরা গ্রীস এবং তুরস্ক থেকে সরে আসার ফলে যে আর্থনীতিক শক্তিশূন্যতার সৃষ্টি হল, যুক্তরাষ্ট্রকে সেই স্থান নিতে হল। ইরাণকে সোভিয়েত

রাশিয়ার আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক চাপের হাত থেকে রক্ষা করাতে খুঁকেয়া একরকম বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৭-এ দু'টি ব্যাপক বৈদেশিক সাহায্য-নীতি গ্রহ করা হয়—ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) গ্রীস এবং তুরস্কের জন্য সামরিক ও আর্থনীতিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে, এবং অধিকতর ব্যাপক মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনায় ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব কার্যসূচীর দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র মধ্যবর্তী সময়ের জন্য খোলাখুলি ভাবেই আর্থনীতিক সাহায্যকে বৈদেশিক নীতির একটা হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করলেন। সব জড়িয়ে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২—এই চার বছরের মধ্যে ১২শ' কোটি ডলার সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন।



জর্জ ক্যাটলেট মার্শাল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবিভাগের 'চীফ অফ স্টাফ', ১৯৪৭-এ 'সেক্রেটারী অফ স্টেট' (স্বরাষ্ট্র-সচিব)। ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য প্রখ্যাত মার্শাল প্ল্যান" প্রণয়ন করেন।

ইতিহাসে এই জাতীয় নীতি এই সর্বপ্রথম গৃহীত হল এবং তার সাফল্য হয়ে উঠল অসাধারণ। ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য স্পষ্টতঃই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে একটা আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় নিবারণে এবং ইউরোপের অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত করার কাজে। প্রকৃত অগ্রগতি ছিল অত্যধিক পরিশ্রমসাধ্য। তার জন্য ১৯৪৮-৪৯-এর মন্দার কালে মুদ্রামান হ্রাস করতে হয়েছে এবং অন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। আবার সেই একই সঙ্গে নিরন্তর মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়েছে। কিন্তু তা'

সত্বেও, অর্থনীতির পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের আভাস দেখা গেল। দুঃখের বিষয়, স্নায়ুযুদ্ধজনিত সন্দেহের বশে সোভিয়েত তাঁবেদার পূর্ব-ইউরোপীয় জাতিসমূহ মার্শাল পরিকল্পনার কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে রাজী হলেন না। এর ফলে, মহাদেশীয় ইউরোপের বাণিজ্য এবং উন্নয়ন কল্পনীয় ভবিষ্যতের জন্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রইল।

মার্শাল পরিকল্পনা পশ্চিম ইউরোপের সব কয়টি দেশের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তার জন্য কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ছিল অত্যাবশ্যকীয়। যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ ছিল যে, প্রয়োজনের আনুমানিক ফর্দকে সম্মিলিত ভাবে স্থির করে নিতে হবে, তার ফলে 'অর্গানিজেসন ফর ইউরোপীয়ান ইকনমিক কো-অপারেশন' (OEEC) মারফৎ কিছু পরিমাণ সংযুক্ত কর্মপ্রকল্প প্রস্তুত করা হল। আঞ্চলিক সংহতি সাধনের এই প্রচেষ্টাকে অধিকতর প্রেরণা দেওয়া হল 'ইউরোপীয়ান কোল অ্যাণ্ড ষ্টীল কম্যুনিটি' এবং 'বেনেল্যুক্স কাষ্টমস্ ইউনিয়ন' নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 'নর্থ অ্যাটলাণ্টিক ট্রিটি অর্গানিজেসন' বা উত্তর-অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার আওতায় সামরিক সহযোগিতার ফলে পারস্পরিক প্রাচীন সন্দেহ হ্রাস পেল এবং জাতিসমূহের মধ্যে দৃঢ়তর আর্থনীতিক সংযোগ স্থাপিত হল। আমেরিকান অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাজারের বীর্যবান গতি এবং বর্ধনশীল উৎপাদনের ফলে, ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের চিরাচরিত উৎপাদক-জোট ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল।

এই কালে, অনুন্নত দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক সাহায্য অপেক্ষাকৃত কম অনুপাতে পেয়েছে। কিংবা পুনরুজ্জীবনশীল ব্যক্তিগত লগ্নী-প্রবাহও সে-সব দেশে আকৃষ্ট হয়নি। শুধু যে অঞ্চলে তৈল বা সমর-প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য কোনো সম্পদ ছিল সেইখানে ব্যতিক্রম ঘটেছে। দারিদ্র্যের, অজ্ঞতার এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ নতুন নীতি গৃহীত হওয়ার আশা জাগল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ১৯৪৯-এর উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষিত বিখ্যাত 'পয়েণ্ট ফোর' বা চার দফা নীতিতে। সরকারি বরাদ্দ অবশ্য এল অনেক মন্দ গতিতে, এবং এই কার্যসূচীতে জোর দেওয়া হল যান্ত্রিক সহায়তা দানের উপর, প্রচুর পরিমাণে উন্নয়নমূলক মূলধন সরবরাহের ওপর নয়। অবশ্য প্রচুর পরিমাণে মূলধন সরবরাহ করলেই যে বহু অনুন্নত দেশে তা' উৎপাদনের কাজে লাগতে পারত কিনা সন্দেহ। যাই হোক, সেই দিকের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা ১৯৫০-এ

কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা পুনরস্ত্রীকরণের বর্ধনশীল ভারের জন্য স্থগিত হয়ে গেল।

অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কালের জন্য আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণের ফলে আমেরিকার ঘরোয়া অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হল। জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হল। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তাঁদের বাজেটের বরাদ্দ হ্রাস করতে পারলেন না, কিংবা মুদ্রাস্ফীতি-জনিত চাপও হ্রাস করতে পারলেন না।

অপর দিকে, বর্ধনশীল জনসংখ্যার প্রয়োজনের দাবী এমন দ্রুত তালে জমে উঠছিল যে, সরকারের পক্ষে তা' সামলে ওঠা যাচ্ছিল না। এই সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী কার্যসূচী গ্রহণ করা হল জি.আই. বিল অব রাইটসের মাধ্যমে। যুদ্ধের শেষাশেষি এই বিল পাশ করা হয়। এই আইনবলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের সরকারি ব্যয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাদের গৃহ নির্মাণ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সরকারি ঋণ দেওয়ার সুবিধা দান করা হল।

পূর্ত-কর্মের ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু বিশ্রী ভাবে পিছিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সামগ্রিক পূর্ত-কর্মের (ফেডরেল, রাজ্য এবং স্থানীয়) খাতে বাৎসরিক ডলার ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪০-এর সংখ্যাকে সামান্য অতিক্রম করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নির্মাণকার্যের ব্যয় গগনচুম্বী হয়ে পড়েছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নির্মাণকার্যের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পেয়েছিল।

আর্থনীতিক জীবন আরো বেশী রকম ভাবে প্রতিষ্ঠানধর্মী হয়ে পড়ল। কারণ, ধারাবাহিক সমৃদ্ধির অংশ একটু বেশী পরিমাণে বৃহত্তর আর্থনীতিক সংস্থাসমূহে যেতে লাগল। যে-সব যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের হাতে অবণ্টিত লাভের অর্থ প্রচুর পরিমাণে জমেছিল তাঁরা তাঁদের নিজস্ব কল্যাণধর্মী কার্যসূচী প্রসারিত করলেন এবং নিজেদের অর্থে নিজেদের ব্যবসার আকারগত প্রসার বৃদ্ধি করলেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও এক-একটা বৃহৎ প্রচেষ্টায় পরিণত হল। তাদের পেনসন এবং কল্যাণধর্মী কর্মের তহবিলে শত শত কোটি ডলার জমে উঠল। এই সব তহবিল, লগ্নী-মূলধনের একটা প্রধান উৎস হয়ে উঠল, এবং চিরাচরিত লগ্নী-সংস্থাসমূহের, যেমন—বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক এবং লগ্নীকারক ট্রাস্ট প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

চিরাচরিত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবনতিতে অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে ছোটখাটো কারবার ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন হয়ে উঠল। বড় বড় বাণিজ্য-সংস্থার সঙ্গে বড় বড় শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল, আর বৃহত্তর সরকার উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে আরম্ভ করল। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গোষ্ঠীসমূহ তাদের স্ব-স্ব স্বার্থ সম্প্রসারণের জন্য স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, কৃষকরা সরকারি সাহায্যের কার্যসূচীতেই আস্থা রেখেছিল। ক্রেতাসাধারণ এবং ক্ষুদ্র কারবারগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাসমূহেব আশ্রয় নিল।

জনস্বার্থ সংরক্ষণে বৃহৎ আর্থনীতিক চাপদানকারী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মধ্যস্থতা করার সমস্যা যুদ্ধোত্তরকালের একটা অত্যন্ত বিরক্তিকর আর্থনীতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই ব্যাপারে এবং এই জাতীয় অন্যবিধ আর্থনীতিক সমস্যায় সরকারি ব্যস্ততা এবং জনসাধারণের উদ্বেগ সহসা থেমে গেল ১৯৫০-এর জুন মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় কম্যুনিষ্ট আক্রমণের ফলে। বর্ধিত হারে আমেরিকান অর্থনীতি প্রতিষ্ঠানগত হয়ে পড়া জনসাধারণের আবার উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠল আইজেনহাওয়ারের প্রথম শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়ে।

আইজেনহাওয়ারের কাল

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিউইট ডি. আইজেনহাওয়ারের জয়লাভ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক ইতিহাসে একটা নতুন পর্ব সূচিত করল। 'সোনার বিশের দশক' এবং অবনমনের গোড়ার কাল থেকে রিপাবলিকানরা যথেষ্ট পরিমাণে জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিবিহীন অবস্থায় পড়েছিল। এই বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে একটা বিরাট এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই সব নয়া বাস্তবতার প্রতি যে ভাবে সাড়া দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই আছে আইজেনহাওয়ার শাসনের দীর্ঘকালীন গুরুত্বের সূত্র।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেন মাত্র একটা যুগ নয়, একটা সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান ঘটে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক ও সামরিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। তার সঙ্গে যুক্ত হল বিশ্ব কম্যুনিজমের আদর্শগত চ্যালেঞ্জ। সেই সঙ্গে উনবিংশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের গোধূলি বেলায় নতুন নতুন সব সমস্যা ও দিগন্তের আবির্ভাব ঘটল; এশিয়া, আফ্রিকা, এমন কি লাতিন আমেরিকায় সংঘটিত আধুনিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় এবং সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা গেল।

ঘরোয়া ক্ষেত্রেও কুলীজ-হুভার কালের পর বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবনমন ও যুদ্ধ, তার সঙ্গে রুজভেল্টের নব-বিধান, ট্রুম্যানের 'ফেয়ার ডীল' বা ন্যায্য বিধান, অর্থনীতি এবং সরকারের আর্থনীতিক ভূমিকায় একটা প্রচণ্ড আকৃতিগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। রাজস্বনীতি প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারিত হল। বহু নতুন কল্যাণধর্মী কার্যসূচী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হল। ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সরকারি সংস্থাসমূহ সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেল এবং অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠল। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আইনবলে পূর্ণ কর্মসংস্থানসূচক অর্থনীতি বজায় রাখায় সরকার দায়িত্বশীল হয়ে উঠল।

ডেমোক্রাটরা অভিযোগ তুললেন যে, রিপাবলিকান বিজয়ের ফলে সরকার আবার "স্বার্থপর" গোষ্ঠীস্বার্থের হাতে গিয়ে পড়বে। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের রিপাবলিকান নির্বাচনী অভিযানের মঞ্চ থেকে, যাকে বলা হত

"জাতীয় সমাজবাদ", তার ব্যাপক পরিবর্তনের দাবী জানানো হল, এবং অভিযোগ করা হল যে, ডেমোক্রাটরা 'রাজনৈতিক কারণে শ্রেণীবিরোধের প্রশ্রয় দিচ্ছে।' রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয় হ্রাস করা ও কর-হ্রাস প্রথার প্রচলনের মাধ্যমে বেসরকারি 'লগ্নীকারকদের জন্য অধিকতর যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির আবেদন জানালেন। সাধারণভাবে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ফেডরেল সরকারের পক্ষে অনেক ক্ষুদ্রতর ভূমিকার কথা তাঁরা বলতে লাগলেন। একটি ভারসাম্যবিশিষ্ট বাজেট, ক্রমিক পর্যায়ে জাতীয় ঋণ পরিশোধ এবং মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল করে তুলবে, এমন এক মুদ্রা ও রাজস্বনীতি গ্রহণের স্বপক্ষে তাঁরা ওকালতি করলেন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর কার্যকালের প্রথম বছরে বলেছিলেন যে, "গত বিশ বছরে সরীসৃপ গতিতে সমাজবাদ যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ছে।" তিনি আরও বললেন যে, নয়া রিপাবলিকান শাসকগোষ্ঠী ফেডরেল সরকারে একটা প্রায় বিপ্লবের ধারা এনেছেন যা আমাদের কালে আর ঘটেনি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বৃহত্তর করার পরিবর্তে বরং তাকে আমরা ক্ষুদ্রতর করে তুলতে চাই এবং আমরা সেই সব কাজ খুঁজে বের করতে চাইছি, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আর করবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্মের পরিধির বৃদ্ধি আমরা ঘটাব না।"

বহুবিধ বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে আইজেনহাওয়ারের শাসন-ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত নীতির মধ্যে অবাধ ব্যবসার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়:

- কোরীয় যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য এবং বেতন-সংক্রান্ত যে-সব নিয়ন্ত্রণ-বিধি মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ কল্পে আরোপ করা হয়েছিল তা' তুলে নেওয়া হল।

- রিকনস্ট্রাকসন ফাইনান্স কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত করা হল।

- ব্যবসায়ী এবং যাঁরা ব্যবসার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁদের শাসন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হল।

- ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যে-সব কর-সংক্রান্ত সংস্কার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল তার উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি লগ্নীকে উৎসাহিত করা।

- কল্যাণমূলক ব্যয় সমান অবস্থায় রইল। শুধু অতিরিক্ত কয়েকটি গোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তার (social security) আওতায় আনা হল।

আইনের আরো সংস্কার করে মেয়েদের অবসর গ্রহণের কাল ৬২ করা হল। মাথাপিছু ১৯৫৮-এর রাজস্ব বছরে কল্যাণমূলক ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৩৮-এর রাজস্ব বছরে ব্যয়ের চেয়ে কম হল। এর কারণ অবশ্য আংশিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, অবনমনের ফলে যে-সব কল্যাণমূলক বিধির উদ্ভব হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকের সমৃদ্ধির কালে তার আর প্রয়োজন ছিল না।

● খামারজাত পণ্যের মূল্যমান স্থির রাখার জন্য দেয় সরকারি সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে আনা হল এবং মূল্যস্তর ঠিক রাখার জন্য দেয় সাহায্যকে নমনীয় করে তোলা হল।

● বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হল বিভিন্ন রকম ব্যবস্থার দ্বারা; যেমন, সমুদ্রের অল্পদূরবর্তী সংরক্ষিত তৈল-অঞ্চলগুলি অঙ্গরাজ্যসমূহকে দিয়ে দেওয়া হল, সরকারি মালিকানায় পরিচালিত বহু প্রকল্প, যেমন—"হেল'স ক্যানিয়ন" বিদ্যুৎ প্রকল্প বিক্রি করে দেওয়া হল এবং অ্যাটমিক এনার্জি এ্যাক্টের (১৯৪৬) সংশোধন করা হল, যার ফলে আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রগতির পথ খুলে দেওয়া হল।

আইজেনহাওয়ারের রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর ফলে অবশ্য ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কর্মসংস্থান আইন বাতিল করা হল না। এই আইনে সরকারকে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য দায়িত্বশীল করে তুলেছিল। আবার মন্দার আবির্ভাব ঘটলে যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বর্ধিত ব্যয়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়, সে উদ্দেশ্যে গৃহীত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি আইজেনহাওয়ারের শাসনকালে পরিত্যক্ত হয়নি।

এই কারণে, আইজেনহাওয়ার-মার্কা রক্ষণশীলতার সঙ্গে আগেকার কালের রাজস্বনীতির গোঁড়ামির ব্যবধান অনেক। যদিও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত 'ইক্‌নমিক রিপোর্ট' বা আর্থনীতিক বিবরণে জোর দিয়ে বলা হল যে, "সরকারের কাজের পরিধি সংকুচিত করতে হবে", তবু সেই একই সরকারি দলিলে বলা হল—"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এমনই জটিল হয়ে পড়েছে যে, বৃহৎ এবং ধারাবাহিক ভাবে দেশরক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করা ছাড়াও, সরকার এখন এমন সব দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন যা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে অজ্ঞাত ছিল।"

১৯৫৫-এর 'ইকনমিক রিপোর্টে' জোর দিয়ে বলা হল যে, "যথাযথ এবং সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সরকার পরবর্তী কালের অনেক গুরুতর পরিস্থিতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন।" ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে বলা হল—"অর্থনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার না করেও আর্থনীতিক ওঠানামাকে আয়ত্বে আনার ক্ষমতা সরকারের আছে।"

মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণে আইজেনহাওয়ারের শাসনকালে যে-সব বিশেষ রাজস্ব এবং মুদ্রানীতিগত কলাকৌশল গৃহীত হয়েছিল তাদের অনেক সমালোচনা সত্বেও এই সবের ব্যাপক ব্যবহারে বোঝা গেল যে, সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান বিষয়ে ডেমোক্রাটিক সরকারের আমলে প্রদত্ত জাতীয় প্রতিশ্রুতি রিপাবলিকান দল কর্তৃক গৃহীত নীতিতে দৃঢ় ভাবে সমর্থিত হয়েছে। আর্থিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির পৌনঃপুনিক সমস্যা সমাধানে, নতুন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হয়।

আইজেনহাওয়ার সরকারকে দু'টি আর্থিক মন্দার মোকাবিলা করতে হয়: ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরীয় যুদ্ধের শেষে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় সংকট সৃষ্টি হয় (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ভাগে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বায় ৫৩'২শ' কোটি ডলার থেকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ ভাগে ৪০'৫শ' কোটি ডলারে নামে)। চার বছর পরে, রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়, তা' ছাড়া প্রতিরক্ষার খাতেও কাজকর্ম হ্রাস করা হয়। এর ফলে, দেশে কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয়ের মাত্রা কমে আসে। প্রতিবারেই বেকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ভাগে শ্রমিকবাহিনীর শতকরা ৭ ভাগ ছিল কর্মবিহীন।

প্রতিটি সংকটের কালে, 'সোস্যাল সিকিউরিটি' বা সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ সাহায্য, খামারজাত পণ্যাদির মূল্য-সহায়ক ব্যবস্থা, বেকারীর ক্ষতিপূরণ এবং করভারের স্বয়ংক্রিয় হ্রাস-পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থা মন্দার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করেছে। এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা থাকার ফলে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়ের অবনতি জাতীয় আয়ের সামগ্রিক অবনতির গড়পড়তা ৪৯ ভাগের বেশী হতে পারেনি। ক্রেতাদের প্রত্যয় এমন দৃঢ় ছিল যে, ভোগ্যপণ্যের জন্য ক্রেতাসাধারণের ব্যয়ের মাত্রা মন্দার ফলে, ১৯৫৪ কিংবা ১৯৫৮-র মন্দার আগে যা ছিল তার থেকে এক-শতাংশেরও কম হ্রাস পেয়েছিল।

সেই একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর নীতি সব রকমের ব্যবসায়িক অধোগতি নিবারণে সাহায্য করেছে। ১৯৫৩-৫৪-র আর্থিক মন্দার কালে, ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডের সহজ ঋণদান-ব্যবস্থা লগ্নীর ব্যাপারে উৎসাহ বর্ধন করল। অন্যদিকে পূর্বাহ্নে পরিকল্পিত 'ট্যাক্স-কাট' বা কর-হ্রাস উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হওয়ায় তা' অর্থনীতিতে প্রচুর পরিমাণে নতুন ক্রয়-ক্ষমতা সঞ্চারিত করল।

১৯৫৭-৫৮-য় খ্রীষ্টাব্দে নতুনতর কলাকৌশল অবলম্বিত হল। শাসকগোষ্ঠী তখন আরও কর-হ্রাসের ব্যাপক দাবী প্রতিহত করলেন। কিন্তু ঋণনীতিকে আবার সহজ করে তোলা হল। স্থানীয় এবং অঙ্গরাজ্যসমূহের ঋণগ্রহণ এবং সেই সঙ্গে দেশের লগ্নীবাবদ ব্যয়কে উৎসাহিত করার প্রয়োজনে।

অধিকন্তু, অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য সরকার অন্য পন্থাও অবলম্বন করলেন। প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে যে-সব ক্রয়ের আদেশ এল, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ছ' মাসে তা' ছিল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ছ' মাসের ক্রয়ের আদেশের দ্বিগুণ। অন্যান্য ব্যয় কার্যক্রমের রূপায়নে দেশের আয়-স্রোতে নতুন অর্থরাশি সঞ্চারিত হল, ফলে চাহিদার নিম্ন গতি ঊর্ধ্বমুখী হল। ফেডরেল সরকার কর্তৃক জনগণকে দেওয়া নগদ অর্থের পরিমাণ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শেষ-হওয়া রাজস্ব বছরে ছিল ৮০শ' কোটি ডলার। ১৯৫৯-এর জুন মাসে শেষ-হওয়া রাজস্ব বছরে তার পরিমাণ দাঁড়াল ৯৭শ' কোটি ডলারে। আবার ফেডরেল ঋণের সীমাও বর্ধিত করা হল। ১৯৫৯-এর রাজস্ব বছরের বাজেট-ঘাটতি ১২'৫শ' কোটি ডলারে দাঁড়াল, জাতির ইতিহাসে এই হল বৃহত্তম শান্তিকালীন ঘাটতি।

যদিও প্রতিবারই আর্থনীতিক মন্দা থেকে স্পষ্টতঃই দ্রুত ত্রাণলাভ ঘটেছে এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কখনও প্রাক্-মন্দার সর্বোচ্চ উৎপাদন কালের শতকরা ৪ ভাগের নীচে নামেনি, কিন্তু প্রতিটি সংকটই ভীষণ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক দলের বিজয় লাভের মধ্যেই এই প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। যে-সব অঞ্চল মন্দার আঘাতে জর্জর হয়েছিল সেই সব অঞ্চলে যে পরিমাণ প্রতিবাদ ভোট পড়েছে তার দ্বারা বোঝা গিয়েছিল যে, নির্বাচকমণ্ডলী সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান-ব্যবস্থা ভিন্ন কিছুতেই খুশী হবে না।

সম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন ছিল ১৯৫০-এর দশকের আর্থনীতিক ইতিহাসের একটিমাত্র দিক। অন্য দিকে, শাসকগোষ্ঠীর

গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হল যে, সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান-ব্যবস্থায় ব্রতী হলে, সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতিকে কি ভাবে রোধ করা যাবে। ১৯৫০-এর দশকের মধ্য ভাগে এই সমস্যা থিতিয়ে এল। ১৯৫২-র মধ্য ভাগে কোরীয় যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত মুদ্রাস্ফীতির চাপে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়তে শুরু হল এবং পরবর্তী চার বছরের ভিতর দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর, ১৯৫৬-র মার্চ থেকে ১৯৫৮-র মার্চের ভেতর 'কনজিউমার প্রাইস্ ইনডেক্স' বা ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচী শতকরা ৭'৫ ভাগ বৃদ্ধি পেল।

এই মুদ্রাস্ফীতির কারণ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অনেকে অত্যধিক চাহিদার সেই চিরাচরিত কারণের কথা উল্লেখ করলেন—অর্থাৎ তাঁরা বললেন, অনেক টাকা সামান্যমাত্র দ্রব্যের পিছনে ছোটায় এই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। অন্য দল বললেন, ব্যয়বৃদ্ধির প্রভাবে এই মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। অর্থাৎ বহু শিল্পশ্রমিক-সংস্থার, দেশের মোট মজুর সরবরাহের একটা বিরাট অংশের ওপর প্রভূত আধিপত্য থাকায়, তারা বাজারের অবস্থার কথা কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা না করেই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জানাতে পারে। ঠিক এই ভাবেই অনেক কোম্পানী বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারার মত প্রভূত শক্তির অধিকারী হওয়ার ফলে তাঁরা তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য খুশীমত দর আদায় করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্যবসায়ের কর্মকর্তারা প্রায়ই যুক্তি দিয়ে বলতেন, মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে হলে দ্রব্যমূল্য না বাড়িয়ে আর উপায় নেই। যাই হোক, যখন শ্রমিক-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ব্যয় ক্রমেই কেবল বাড়িয়ে যাওয়া হতে থাকল, বাজারের চাহিদার দিকে না তাকিয়ে মূল্যস্তর তখন ঊর্ধ্বমুখী হল।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ যাই হোক না কেন, শাসকগোষ্ঠী অতি দ্রুত গতিতে তা' রোধ করার চেষ্টা করেছেন। ফেডরেল রিজার্ভ বোর্ডের নীতিকে ১৯৫৫-৫৭ সালের মধ্যে এমন কঠোর করে তোলা হল যে, ১৯১০-এর দশকের পরে এতখানি কঠোরতা আর কখনও অবলম্বিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়ের মাত্রাও হ্রাস করা হল। এই সব ব্যয়হ্রাস-ব্যবস্থা যদিও নিঃসন্দেহে অনেকখানি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করেছে, তবু মধ্য-পঞ্চাশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি দমনে রাজস্ব এবং মুদ্রানীতিগত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার কার্যকরিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছিল।

রক্ষণশীলদের কাছে কিছু বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন তাঁরা মুদ্রাস্ফীতির কঠিন সমস্যা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন সেই কালে। এ-কথা স্পষ্ট বোঝা গেল, ভারসাম্যবিশিষ্ট বাজেট অধিক পরিমাণে সরকারি সিদ্ধান্তের চেয়ে অর্থনীতির অবস্থার ওপরই নির্ভরশীল। কারণ, ফেডরেল ব্যয় হ্রাসের ব্যাপারে জগদ্দল পাথরের মত পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী।

প্রথমতঃ, মুদ্রাস্ফীতির জন্যই ফেডরেল বাজেটের আয়তন হ্রাস করা কঠিন হল। এর ওপর "ওপন-এণ্ড কমিটমেণ্টস" (মুখ-খোলা প্রতিশ্রুতি), যেমন খামারজাত পণ্যের সহায়তার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত কর্মসূচী, প্রাক্তন সৈনিকদের পেনসন, এবং ক্রয় করে 'জমিয়ে' রাখা প্রভৃতি নীতিকে ধরে রাখতেই হয়েছে। অনুরূপ ভাবে বার্ধক্য ভাতা, বেকারীর ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির জন্য সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান 'গচ্ছিত তহবিল' থেকে অর্থদান হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। সীমিত ভাবে বিমান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ, রাজপথ নির্মাণ এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতির জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু বাজেটের সবচেয়ে বৃহত্তর অংশ ছিল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সাহায্য বাবদ বরাদ্দ। যে-কালে সামরিক কলাকৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছিল, সে-কালে রিপাবলিকান শাসকগোষ্ঠী অক্ষম এবং অনিচ্ছুক হলেন মোটামুটি ভাবে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় হ্রাস করতে। তা'ছাড়া, প্রেসিডেণ্ট দৃঢ় ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর কালে সামরিক এবং আর্থনীতিক সাহায্য মিত্রপক্ষ এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিতে দিয়ে যাওয়া হবে।

১৯৬০-এর দশকে যখন আমেরিকা প্রবেশ করল তখন যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি সরকারকে দাঁড়াতে হল তা' হচ্ছে: "ওরা কি (শাসকগোষ্ঠী) এই অবস্থায় অর্থাৎ শীতল যুদ্ধ, মুখ-খোলা প্রতিশ্রুতি, একটা বিপুল জাতীয় ঋণ, একটা তরল ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি ইত্যাদির মুখোমুখি হয়ে ভীতিজনক 'বুম-বাষ্ট সাইকেল'কে (চড়া বাজারের চক্র) সামলানোর জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পথ রোধ করার জন্য কিছু করতে পারবে? যদিও ধরে নিই যে, আজকের এই বৃহৎ সংগঠিত শ্রমিকগোষ্ঠী আর বৃহৎ কারবারের যুগের মুদ্রাস্ফীতি রোধের সেই সব পুরোনো বিধি-ব্যবস্থা এখনও কার্যকর, তবু সরকার সেই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারবেন কি?" *

---

* Conservatives in Power : A Study in Frustation. Edwin L. Dale, Jr. Garden City, N. Y. : Doubleday & Co.1960,

যুদ্ধোত্তর কালের পরিপ্রেক্ষিতে



লেভিটাউন, পাঃ—গৃহনির্মাণ হিড়িকের এক বিশিষ্ট পরিচয়। এই ব্যবস্থায় খামার-বহির্ভূত শতকরা ৬০ ভাগ পরিবার তাদের নিজস্ব গৃহের মালিক হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

আজকের যুক্তরাষ্ট্র মনে হয় যে-কোনো কালের চেয়ে তার ত্রিবিধ লক্ষ্য—সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান, সর্বোচ্চ আর্থনীতিক প্রসার এবং সর্বোচ্চ দ্রব্যমূল্যের স্থিরতার পূরণ করার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে তিনটি মন্দা ও ধারাবাহিক মৃদু মুদ্রাস্ফীতি দেখে মনে হয় যে, সংকটমুক্ত অর্থনীতির লক্ষ্যে আজও পৌঁছোনো যায়নি।

যুদ্ধের কালে বহু সম্মানিত অর্থনীতিবিদ, বিশেষতঃ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এলভিন এইচ. হ্যানসেন যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি সুপরিণত বা "রুদ্ধগতি" (stagnant) অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই কঠোর কর্মসংস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর্থনীতিক প্রসারের মান অক্ষুণ্ণ রাখা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠবে। হ্যানসেন আশংকা করেছিলেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা মন্দগতি, ক্ষীয়মাণ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির নতুন করে কারবারে অর্থ লগ্নী না করে সঞ্চয়ের জন্য অধিকতর আগ্রহ, একটা বিপর্যয়মূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কিন্তু এই সব আশংকা সত্ত্বেও, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি

বিস্ময়কর ভাবে ভালো কাজ করেছে। ১৯৫৯-এর ডলারের পরিমাপে মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৪৬-এর ৩১৯.৫শ' কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০শ' কোটি ডলারের চেয়ে কিছু বেশীতে দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৫৬ ভাগেরও বেশী। ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় ঐ একই কালে শতকরা ৩৬ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কতকগুলি বিশেষ কারণে এই পরিসংখ্যান সম্ভব হয়েছিল :

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধিলাভ : ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ইকনমিক রিসার্চের ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুসারে জন-ঘণ্টা (man-hour) হিসাবে কাজের পরিমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকালে প্রতি দশ বছরে যা গড়পড়তা শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেত, যুদ্ধের পরবর্তী দশকে তা' শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এই উন্নততর উৎপাদনের অনেকখানির কারণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, কলা-কৌশলগত নয়া উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

সম্প্রসারণশীল জনসংখ্যা : ১৯৩০-এর দশকে বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যদ্-বাণী করেছিলেন যে, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকার জনসংখ্যা ১৪ কোটিতে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে, মধ্য-পঞ্চাশে জনসংখ্যা ১৭ কোটির স্তর অতিক্রম করে, এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তা' ১৮ কোটিতে ওঠে।

ঋণদান ব্যবস্থার অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ : ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যবর্তী মেয়াদী ভোগ্য-ঋণ (consumer credit), অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দী ঋণ, ৮·৪শ' কোটি ডলার থেকে উঠে ৪০শ' কোটি ডলারে পৌঁছোল। ঐ একই সময়ে খামার ব্যতীত অন্যান্য সব সম্পত্তির বন্ধকী-ঋণের মাত্রা ২৩শ' কোটি ডলার থেকে ১৩১শ' কোটি ডলারে পৌঁছোয়। মর্টগেজ (বন্ধকী) ঋণের এই সম্প্রসারণের ফলে খামার-মালিক নয় এমন সব গৃহস্থরাও ১৯৬০-এর মধ্যে নিজেরাই নিজেদের বাড়ীর মালিক হওয়ার সুবিধা পেল। এই ব্যবস্থা বিশেষ করে সম্ভবপর হয়েছিল অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদের সরকারি ঋণ পাওয়ায়। ১৯৫৯-এর প্রায় অর্ধেকেরও বেশী বন্ধকী-ঋণের দায়, হয় ফেডরেল হাউসিং অর্গানিজেশন, নয় ভেটারেনস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গ্রহণ করেছিল।

সম্প্রসারিত সরকারি ভূমিকা : চক্রবিরোধী (countercyclical) রাজস্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি সংকটের কালে আর্থনীতিক ত্রাণের ব্যাপারে 'বন্যা'র

(buoy) মত কাজ করেছে। এই নীতির পরিপূরক হিসাবে আবার কতকগুলি "মন্দাবিরোধী স্বয়ংক্রিয় স্থিতিস্থাপক" ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, যথা— বেকারী ক্ষতিপূরণ কার্যসূচী এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলি মন্দার সূচনায় অর্থনীতিতে নতুনতর আয়ের সঞ্চার করে অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করেছে। সুতরাং, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সংকোচ সত্ত্বেও ১৯৪৯, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আর্থিক মন্দার বছরের ব্যয়যোগ্য আয়ের মাত্রা খুব কমতে পারেনি।

সরকারের সম্প্রসারণশীল ভূমিকাব আর একটি দিক হল সরকারি ব্যয়ের পরিমাণগত বৃদ্ধি। স্থানীয়, রাজ্যগত এবং ফেডরেল ব্যয়ের পরিমাণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের মোট আয়ের শতকরা ১১ ভাগ থেকে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বারো বছরে ৪০০শ' কোটি ডলার পরিমাণ অর্থ শুধুমাত্র নিরাপত্তা খাতে অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয়েছে।

আমেরিকান সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনসূচক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল যুদ্ধোত্তর কালের কয়েকটি সুদূরপ্রসারী প্রবণতার মধ্যে।

এমনই একটি লক্ষণ হল একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়। ১৮৭০ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালে শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র কেরাণীশ্রেণী জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রবণতা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সবচেয়ে নাটকীয় হল উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অন্য দিকে কর্মগ্রহণের আগ্রহ। আজ যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র অর্থনীতি, যেখানে পণ্যোৎপাদন অপেক্ষা, পণ্যবণ্টন এবং অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশী। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শিল্পোৎপাদনে (অংশতঃ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে) বিশাল বিস্তৃতিলাভ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষের মত হ্রাস পেয়েছে। অন্য দিকে, শিল্পগত উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়েছে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী। উৎপাদনমূলক চাকরিতে যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা' অনুৎপাদক কর্মীদের—যেমন, আফিসকর্মী, বাজার-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধোত্তরকালে অধিকাংশ নতুন চাকরির সুযোগ-সুবিধা অর্থনীতির অনুৎপাদক কাজকর্মমূলক অংশেই ঘটেছে।

রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর আর্থনীতিক গোষ্ঠী যে ক্রমেই অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেছেন, তাকেও কাঠামোগত আর একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বলা যায়। যুদ্ধোত্তর কালে বিরাট যৌথ সংস্থাগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা শক্তির সমাবেশ ঘটেছে বিরাট জাতীয় শ্রম-সংস্থাগুলিতে। দ্রব্যমূল্য এবং মজুরী এখন আর বাজারে নির্ধারিত হচ্ছে না, এখন এই সব স্থিরীকৃত হচ্ছে ব্যবসা-সংস্থার আলোচনা-কক্ষে টেবিলের চারধারে বসে দর-কষাকষির মাধ্যমে। দীর্ঘকালীন পরিসরে দ্রব্যমূল্য অবশ্যই ক্রেতা-সাধারণের চাহিদার তারতম্যের ফলে ওঠানামা করেছে। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে মোটের ওপর দ্রব্যমূল্য স্থিরই থেকে গেছে। মোট কথা, দ্রব্যমূল্যের গতি নিম্ন হওয়ার পরিবর্তে তাতে ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতাই বেশী লক্ষ্য করা গেছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একটা সরীসৃপগতি মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

কৃষির ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়া এই হল যে সেই চিরন্তন খামার-সমস্যা আবার প্রবল হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এবং কোরীয় যুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বে কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিশেষ চাহিদা ছিল। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর উদ্বৃত্ত খামার-দ্রব্যাদির সমস্যা আবার প্রবল আকার ধারণ করল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে যদিও কৃষিগত কর্মসংস্থান শতকরা ৩১ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, কৃষিজাত মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, এই সময়ে খামারে নিযুক্ত শ্রমিকের ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণিত হয়েছে। স্পষ্টতঃই কৃষির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যান্ত্রিক কলাকৌশল অত্যন্ত দ্রুত তালে উন্নতি লাভ করেছে, কিন্তু জাতির মধ্যে খামারজাত পণ্যের চাহিদা সেই পরিমাণে বাড়েনি। আজ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে অতি সামান্যই অগ্রসর হওয়া গেছে।

যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতির ফলে আমেরিকান অর্থনীতির ক্ষেত্রে আর-একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যারও প্রসার ঘটেছে—সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের অবস্থিতি, দেশের কয়েকটি অবনত অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন স্তরের। সেখানে যান্ত্রিক কলাকৌশল কৃষি, খনি এবং উৎপাদনমূলক সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরের সংখ্যা হ্রাস করেছে। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের শহরগুলি এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্রের অসম

ধনবণ্টনের ফলে উদ্ভূত এই সব এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি ব্যাপকতর প্রচেষ্টা সাধারণ ভাবে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় তরফ থেকেই হওয়া প্রয়োজন।

অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী ধারার থেকে উদ্ভূত এই সব সমস্যা ছাড়াও যুদ্ধোত্তর-কালের কিছু কিছু নতুন সমস্যাও জাতির চিন্তার ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। হয়ত, এ-সবের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল আর্থনীতিক উন্নতির ধারা। অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতির আর্থনীতিক অগ্রগতির পরিমাণ এবং উৎকর্ষ উভয় দিক নিয়েই বিতর্ক করে চলেছেন।

বিগত চল্লিশ বছর কাল ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির ধাপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উৎকণ্ঠার বিশেষ কারণ নেই—অন্ততঃ অগ্রগতির পরিমাণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে। ১৯১৯ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতির মোট জাতীয় উৎপাদন গড়পড়তা হিসাবে বাৎসরিক শতকরা ২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রমাণ বিচারে জানা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর্থনীতিক উন্নয়নের গতি ক্রমশঃ মন্দা হয়ে এসেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপাদন মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কিন্তু মন্দার বছরগুলি ছাড়া অন্যান্য সব বছরে বৃদ্ধির গড়পড়তা হার ছিল বাৎসরিক শতকরা ৩.৫ ভাগ। বস্তুতঃ, মৃদু আর্থিক মন্দাও যে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক উন্নয়ন গুরুতর ভাবে ব্যাহত করতে পারে এটাই তার প্রমাণ।

অন্যান্য দেশের উন্নয়নের ধারার সঙ্গে তুলনা করলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্ব কিন্তু তেমন প্রভাবশালী নয়। যদিও বিভিন্ন দেশের সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের তুলনামূলক বিচার অবশ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, তবু প্রমাণদৃষ্টে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির হার অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে, যুদ্ধের পর পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক নিম্ন স্তরে পড়ে ছিল। যদি শতকরা বৃদ্ধির নিরিখ অনুসারে অগ্রগতির বিচার করা হয়, তবে যে জাতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তর থেকে উন্নয়নের কাজ শুরু করে, সে জাতির উন্নয়নের শতকরা হার অধিকতর হতে বাধ্য। যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রে জনমত বাৎসরিক উন্নতির উচ্চতর স্তর লাভের উপরই বেশী জোর দিয়েছে।

আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির মান-বিচার, ১৯৫০-এর দশকে আরেক চড়া বিতর্কের সূত্রপাত করে। বার বার সমালোচকরা যুক্তি দিয়ে তর্ক করেছে।

যে, জাতির সম্পদ উপযুক্ত ভাবে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে না। অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রম এবং মূলধন ব্যয় করা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য নির্মাণ-কর্মে, আর ভিত্তিগত কর্ম, যেমন—জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, নাগরিক পুনরুন্নয়ন ও অন্যান্য মৌল সুবিধার বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে অতি সামান্যই।

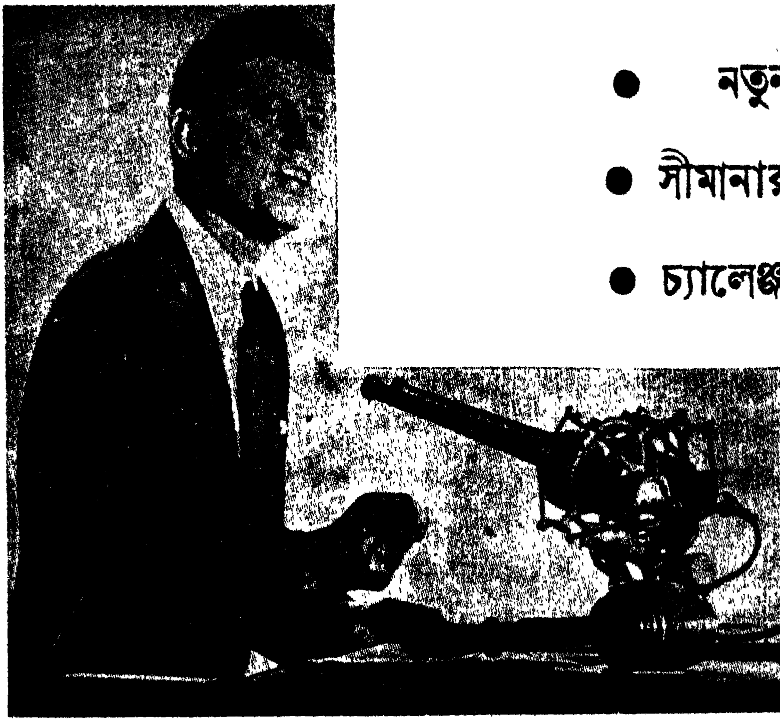
সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই, মনে হয়েছিল যে, মৌল সামাজিক হিতসাধন কর্মকে এক পাশে রাখা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দু'দিক সামলানো, নিরন্তর ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ক্রমশঃই কঠিনতর হয়ে উঠেছে। সরকারি ক্ষেত্রেই কিন্তু সমালোচকরা প্রবলতম অপকর্ষতা লক্ষ্য করেছেন। অনেক বিদ্যালয় ভীড়ে বোঝাই ছিল। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন যে, জাতির ১৩০,০০০ বিদ্যালয়-কক্ষের অভাব ছিল ১৯৫৯-এ, যদিও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৮০,০০০ নতুন বিদ্যালয়-কক্ষ তৈরী হয়েছিল। হাসপাতালে সুবিধার গুরুতর অভাব ছিল। অনেক শহরাঞ্চল এমনই ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সেই সব অঞ্চলে মোটর-চলাচল ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি এমনই জটিল আকার ধারণ করেছিল যে, মেজর জেনারেল জে. এস. ব্রাগডন, পূর্ত ও পরিকল্পনা বিভাগে প্রেসিডেন্টের জনৈক বিশেষ সহকারী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রিপোর্ট পেশ করলেন যে, "পূর্ত বিভাগের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই—হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পৌরকেন্দ্র, চিত্তবিনোদক ব্যবস্থা ইত্যাদি—অভাবটাই স্বাভাবিক, ব্যতিক্রম নয়।"

সামগ্রিক অর্থনীতির মত ক্রেতাসাধারণকেও একই ধরনের বিচ্যুতির জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ মানের সেবা ভোগ করলেও, এই ক্রেতা, কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদের মতে অতিমাত্রায় খরচ করছেন গৃহের আসবাবপত্রাদি এবং কিছু স্থায়ী ধরনের দ্রব্যাদি কিনে, কিন্তু শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের খাতে তেমন ব্যয় করছেন না।

তবুও, সমাজের সর্বপ্রকার ত্রুটী সত্ত্বেও ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র এমন এক জীবনযাত্রার মান ভোগ করেছে যা পৃথিবীর বাকী অংশ (মনে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নও এর অন্তর্গত) অনুকরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রকে যে-সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেগুলি সমৃদ্ধির বা প্রাচুর্যের (affluence) সমস্যা, অন্ততঃ একজন অনুভূতি-প্রবণ সমালোচকের তাই মত। আমেরিকানরা যদি বুঝতে শুরু করে থাকে

যে, ভোগের উচ্চ মান এবং সাধারণ ভাবে জড়জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের সুখের পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বৃদ্ধি করে না, তারা এ-কথা জোর দিয়ে যথার্থ ভাবেই বলতে পারে যে, দারিদ্র্যের সমস্যার মধ্যে বাস না করে প্রাচুর্যের সমস্যায় গা ভাসিয়ে দেওয়া অনেক উপযুক্ত কর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ জাত নিজেরাই আজ প্রাচুর্যের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

আমেরিকান অর্থনীতিকে যুদ্ধোত্তরকালীন যুগে, সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান, মূল্যমানের স্থিরতা বিধান এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে রত হতে হয়েছে। কিন্তু এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমেরিকার জনসাধারণ পঞ্চাশের দশককে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য যথাযোগ্য ভাবেই ব্যবহার করেছে। যে কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তার ভার উপযুক্ত ভাবেই ভবিষ্যতের ওপর চাপানো যায়।



- নতুন
- সীমানার
- চ্যালেঞ্জ

নতুন সীমানা সমাগত। এই সীমানার বাইরে আছে বিজ্ঞান ও মহাকাশের জরীপ-বহির্ভূত অঞ্চল, যুদ্ধ ও শান্তির সমাধানহীন সমস্যাবলী, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অনধিকৃত ঘাঁটি, দারিদ্র ও প্রাচুর্যের জবাবহীন প্রশ্নাবলী।— জন এফ. কেনেডী—জুলাই ১৫, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ডেমোক্রাটিক দলের মনোনয়ন গ্রহণকালে।

পরিশিষ্ট ঃ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নতুন যুগের বাস্তবতা ও সমস্যাকে মুঠোর মধ্যে এনেছে। এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়, কারণ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বা মতামত-গঠক, যাঁরা কালের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারেন তা' থাকা এক ব্যাপার, আর সমগ্র সমাজ মিলে তাদের অতীতের পুর্নবিবেচনা, তার বর্তমান শক্তি ও দুর্বলতার বিশ্লেষণ করা এবং তাকে যথোপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক মনোভঙ্গীতে খাপ খাইয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত দাবীর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া আর এক ব্যাপার।

অপেক্ষাকৃত একটি স্বাধীন সমাজে, যেখানে নানা মত, পছন্দ এবং এমনকি কুসংস্কার উপযুক্ত ভাবে ব্যক্ত হতে পারে এবং হচ্ছে, সেখানে কোন জিনিস জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হবে তা' স্থির করা বা তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচন যে-কালে অনুষ্ঠিত হল তখন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই এই ধারণার বাস্তব রূপায়নটাই ছিল সে-দিনকার রাজনীতির সমস্যা। জনসাধারণকে, দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে একজনকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচন করতে হল। উভয় প্রার্থীই জনসাধারণের কাছে তাঁদের স্ব-স্ব কর্মসূচী পেশ করলেন—যা তাঁদের মতে আমেরিকান সমাজকে তার স্বীকৃত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে প্রকৃষ্ট হবে।

জন এফ. কেনেডী বিজয় লাভ করলেন সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। কিন্তু তার দ্বারা আমেরিকান সমাজে নীতিগত ক্ষেত্রে কোন অন্তর্নিহিত বিভেদ সূচিত হল না। রাজপথে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হল না, নয়া শাসনের অভ্যুদয়ে সংসদীয় পঙ্গুতা দেখা দিল না। নির্বাচনী অভিযানের দলগত আবেদন যে মুহূর্তে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল সেই মুহূর্তেই জাতি একটা সুশৃঙ্খল ক্ষমতা-হস্তান্তরকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তাদের ভবিষ্যতের সমস্যা ও সুযোগের সম্মুখীন হ'তে আগ্রহশীল হয়ে উঠল। কারণ, অত্যন্ত কর্মকুণ্ঠ নাগরিকও এই কথা মর্মে অনুভব করল যে, ১৯৬০-এর দশককে একটা বিশেষ ধরণের উদ্ভাবনী, সহনশীলতা এবং সংবেদনশীলতার দরকার নতুন যুগের প্রয়োজন এবং নতুন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য। যুদ্ধোত্তরকালের অবসান ঘটেছে। এখন এক নতুন সীমানার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার যুক্তিগ্রাহ্য কাল সমুপস্থিত।

রাজনৈতিক দিক থেকে যে সমাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজের অর্থনীতির অল্প-বিস্তর নিয়মিত চক্রগত ওঠানামা একটা বিশেষত্বের চিহ্ন। আমেরিকার আর্থনীতিক ইতিহাসের অগ্রগতির ধারা এই দিক থেকে অনুসরণ করা সম্ভবপর। বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের অবসানের পর, বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় সেই শিল্প এবং বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই ওঠানামার ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কখনও তথাকথিত রক্ষণশীল কিংবা উদারনীতিকদের শাসন, কখনও অবাধ ব্যবসা নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ, আবার কোন যুগে অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা-

নিষেধাদির আরোপ, কখনও অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণ, আবার কখনও তার সংকোচন ও পুনর্বিন্যাস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ওঠানামা অবিরাম চলেছে। এই সব ওঠানামা আমেরিকান সমাজের বিশেষ সুবিধাজনক এক "অসম্পূর্ণতা"র ফলে সম্ভব হয়েছে। এই অসম্পূর্ণতা আমেরিকার সমাজে মতের বিভিন্নতাকে একটা সুযোগে পরিণত করেছে এবং তার ফলে ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের এবং বাসনার ভিত্তি থেকে একটা জাতীয় লক্ষ্য গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থা যতখানি সাফল্য অর্জন করেছে, ততখানি করা যে এর পক্ষে সম্ভব হয়েছে সেই ঘটনাটাই আমেরিকার জনসাধারণের স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতার এক উজ্জ্বল নজীরবিশেষ।

কিন্তু এক অসম্পূর্ণ সমাজ থেকে উৎপন্ন (কোন সমাজই বা সম্পূর্ণ?) আমেরিকান অর্থনীতির নিজস্ব একপ্রস্থ সমস্যা বর্তমান, যার সমাধান করা প্রয়োজন। ষাটের দশক যতই এগিয়ে যাবে ততই সেদিকে নজর দিতে হবে। এই সমস্যা হল অতিরিক্ত মাত্রায় সমুন্নত অর্থনীতির সমস্যা; এই সমস্যা জীবনের উৎকর্ষকে সমৃদ্ধ করার সমস্যা, তার প্রয়োজন মেটানোর নয়; এই সমস্যা আপেক্ষিক প্রাচুর্যের সমস্যা, অপ্রতুল পণ্যোৎপাদনের সমস্যা নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর এক দশকেরও বেশী কাল ধরে আমেরিকার জনসাধারণ বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের ফলে জীবনযাত্রার মানের যে অবনতি ঘটেছিল তার পুনরুন্নয়নে ব্যস্ত ছিল। ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার একটা উদ্দাম আগ্রহজনিত যে গতিবেগ গড়ে উঠেছে, অর্থনীতিকে তা' একটা নতুন শিখরে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকান পরিবার-সমূহের ¾ অংশ মোটর গাড়ীর মালিক হয়েছেন। টেলিভিসন সেট এবং কাপড়-ধোলাই যন্ত্র শতকরা ৯০ জনের বাড়ীতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, সকল পরিবারের রেডিও আছে, আর রেফ্রিজারেটার একটা নিত্য-ব্যবহার্য যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

স্পষ্টতঃই, দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের এই জাতীয় বিশাল তালিকা এ-কথা নির্দেশ করবে যে, আমেরিকার জনগণের একটা বিরাট অংশের শারীরিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রচুর। ১৯৭০-এর আর্থনীতিক অবস্থার পরিসংখ্যানগত প্রত্যাশা যে হতাশাব্যঞ্জক তা'ও নয়। এক দশকের মধ্যে জনসংখ্যার আনুমানিক শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি সত্বেও, ৭৯০শ' কোটি ডলার সামগ্রিক

জাতীয় উৎপাদন সম্ভাব্য বলেই মনে হয়। এর দ্বারা মাথাপিছু প্রাপ্তব্য দ্রব্যাদির এবং সেবামূলক কার্যাদির শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত। আমেরিকান অর্থনীতির "সমস্যা"র কথা যদি উল্লেখ করা যায়, তা'হলে সে-কথা অত্যন্ত বিবেচনা ও ওজন করে ব্যবহার করতে হবে।

ইদানীং আমেরিকান জনগণ যে আর্থনীতিক মান অর্জনের জন্য চেষ্টিত হয়েছে তা' নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চ। যুদ্ধোত্তরকালের অবসানে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে বিশ্বজগতের বাজারে প্রতিযোগী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু গভীরতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে আমেরিকানরা ভবিষ্যতের জন্য যে ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে চায় তার পথে অন্তরায় ঘটেছে।

আমেরিকান জনগণ যে মান সবচেয়ে প্রবল ভাবে কামনা করে তা' হল আয়ের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে নিরাপত্তা। আর্থনীতিক দিক থেকে অবনমিত অঞ্চলসমূহে, কিংবা যে-সব বিশাল উৎপাদন-কেন্দ্র উদ্দাম যুদ্ধোত্তর বৃদ্ধির হার রক্ষা করতে অসমর্থ তাদের ক্ষেত্রে, উচ্চ হারের বেকারী বেসামরিক শ্রমিকবাহিনীর শতকরা ৫ ভাগকেই কর্মহীন অবস্থায় রেখেছে। একটা বিশাল সংখ্যাগুরু বেতনভোগীদের বেতনের হার অপেক্ষাকৃত উচ্চ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যান্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তনের ফলে দ্রুতগতিতে ২,৭০০,০০০ মজুর মোটামুটি ভাবে তাদের নিয়োগযোগ্যতা হারিয়েছে। এই সব সমস্যার সঙ্গে বাণিজ্যিক চক্রে মাঝে মাঝে মন্দার আবির্ভাবে যে-সব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি যুক্ত হয়েছে। বয়স্ক লোকদের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হয়ে উঠেছে; বৃহৎ ব্যবসা এবং শ্রমিক-সংস্থার মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সাধারণ মানুষের ওপর তার চাপ পড়ে; মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধীরে অথচ অবিচল ভাবে অর্থক্ষতি সাধিত হয় এবং আগামী কয়েক দশকের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্মসমূহে যে-সব তরুণকে নিয়োগ করা হবে তাদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি সমস্যাও আমেরিকায় বর্তমান।

এই সব এবং এমনই আরো অনেক সমস্যা, আমেবিকান জনগণ তাদের সমাজের সামনে যে নতুন সীমানা জেগে উঠেছে তার পুনর্বিবেচনা সূত্রে যা চিন্তা করছে তার মৌলবস্তু। এই সব সমস্যা যদি তাদের নিজেদের

রচনা হয়, তা'হলে অধিকাংশ আমেরিকানই এই সব সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। হয়ত, যুদ্ধোত্তরকালের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিণতি হল এই যে, একটা সমবেত চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে, যে ক্রেতা, বেসরকারি ব্যবসায়ী ও সরকারের মধ্যে অংশীদারত্ব অপরিহার্য প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষ শক্তি ও সদ্‌গুণ বর্তমান, যা অপর দু' পক্ষের পরিপূরক হিসাবে সাধারণ অর্থনীতিতে প্রত্যেকের যেটুকু দেয় তা' দান করেছে।

নতুন সীমানায় প্রবেশ করা একটা দুঃসাহসিক অভিযাত্রা যাতে প্রতিটি আমেরিকান তার নিজস্ব যোগ্যতানুসারে অংশ গ্রহণ করবে। যে পৃথিবীতে, আশা করা যায়, ধীর ভাবে জড়জাগতিক অগ্রগতি সকল মানুষের জন্যই ঘটবে, হয়ত ঐতিহাসিকরা বলবেন, সেই পৃথিবীতে আমেরিকান জনগণের বিশেষ দান হল ব্যক্তিগত বিশেষাধিকারের প্রতিযোগিতার মূল্য প্রদর্শন।

চিরন্তন সীমানার সঙ্গে মোকাবিলা করার—অনেকে যাকে বলেছেন আমেরিকান পদ্ধতি—এই হচ্ছে তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

॥ শেষ ॥